সা হি ত্য অ ঙ্গ ন

(সাহিত্য আংগন // Sahitya Angan)
ISSN : 2394 4889
Vol.:V, Issue: XII, July-Dec. 2020
Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক
ড. জয়গোপাল মণ্ডল
(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল
অভিষেক টাওয়ার,
ব্লক-এ, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট নং-২
কলাকুশমা, সরাইঢেলা, ধানবাদ-৮২৮১২৭

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literacy Tri-lingual Peer-reviewed Journal
ISSN: 2394 4889
Vol. : V, Issue: XII, July-Dec. 2020

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

© ***Dr. Jaygopal Mandal***

Type Setting
Printing and Binding :
Barnana Prakashani
6/7, Bijaygarh, Kolkata-700
032
Phone : 9874357414

Price : ₹ 150.00

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ পাবলিশিং, ধ্যানবিন্দু ও পাতিরাম, কলেজস্ট্রীট

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A,
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 09570217070
E-mail :joygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com
Website : www. sahityaangan.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কবি অলোকরঞ্জন দাশগপ্ত (১৯৩৩-২০২০)

কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫-২০২০)

সূচি

সম্পাদকীয়		৭
কবি গণেশ বসু	পবিত্র সরকার	৯
গণেশ বসুর কবিতা	বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪
কবি গণেশ বসুর কবিতা-শিল্প	সুমিতা চক্রবর্তী	২৭
প্রতিভাবান কবি গণেশ বসু	পবিত্র মুখোপাধ্যায়	৪২
প্রগতি কবিতার যথার্থ উত্তরসূরি	অনন্ত দাশ	৪৯
মনন ও আবেগের সমন্বয়	গোপা দত্ত ভৌমিক	৬৩
গণেশ বসুর কবিতা	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৭
কবি গণেশ বসু	গৈরিকা ঘোষ	৮৮
সময়ের তরঙ্গে কবি গণেশ বসু	ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	১০৬
প্রেমিক-কবি গণেশ বসু:		
'আলোকিত মুগ্ধ অনুরাগী'	তরুণ মুখোপাধ্যায়	১২৮
আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই	অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩২
চলমান ছায়াছবি: গণেশ বসুর কাব্য সমীক্ষণ	অজন্তা মিত্র (বিশ্বাস)	১৩৫
আমি থেকে আমরা-র পথিক গণেশ বসু	তাপস রায়	১৪২
গণেশ বসুর কবিতা: এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার	মৃদুল দত্ত রায়	১৫৫
স্বেচ্ছাচারী আলোময় অদ্ভুত আঁধার	ঋতম্ মুখোপাধ্যায়	১৮০
অপরাহত প্রজাপতি: গণেশ বসুর অগ্রন্থিত কবিতা	জয়গোপাল মন্ডল	১৮৯
প্রেমের কবিতা: গণেশ বসু	মৌসুমী সাহা	১৯৮
জীবন-আকাঙ্ক্ষা ও		
জীবন-অপচয়ের দহনগাথা: 'নীরব সন্ত্রাস'	নবনীতা বসু	২০৫
বাঘের থাবার নীচে: নি:স্বতা থেকে আশার পথে	সোমা ভদ্র রায়	২২৩
জীবনের আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে কবি গণেশ বসু	নিখিল কুমার মাহাতো	২৩০
মুখোমুখি : কবি গণেশ বসু	নিখিল কুমার মাহাতো	২৪৭
কবি গণেশ বসুর জীবনপঞ্জি		২৬০
গণেশ বসুর গ্রন্থপঞ্জি		২৭১
পত্ররেখায় কবি গণেশ বসু ও সমকাল		২৭৩
লেখক পরিচিতি		২৮৮

Advisory Board :

Prof. (Dr.) Tapas Basu, (Retd. Prof.) Kalyani University and Guest Faculty of C.U., Kolkata

Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam

Prof.(Dr.) Bikash Roy, University of Gour Banga, Malda, W.B.

Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.

Nalini Bera (Katha Sahityik: Bankim & Ananda Awarded)

Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Ananda Awarded)

Professor, (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, Bankura University

Tapas Roy (Poet), Kasba, Kolkata

Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh)

Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)

Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Assistant Editor :

Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.

Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata

Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata

Dr. Sampa Basu, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure

Dr. Soma Bhadra Roy, Dept. of Bengali, Barasat State University.

Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.

Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata- 84

Dipankar Arosh, Dept. of Bengali, B. C. College, Asansol

Panchanan Naskar, SACT, Pathar Pratima Mahabidyalaya

Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College

সম্পাদকীয়

'যে আবেগ, যে প্রত্যয়, যে স্বপ্ন নষ্ট শশার মতো পরিত্যক্ত, সে সবই ভাষার শিল্পে কীভাবে যেন এসে যায় পাঠকের চৈতন্যে বা চৈতন্যহীনতায়। গণেশ বসু এটা প্রমাণ করেন, কবিতার আবেগ বিষয় নির্ভর নয়, ভাষার, কর্মের, উচ্চারণের নানা স্বরে ওই বিষয় পেরিয়ে যায়, নিজ বৃত্তে তারা যেন .এক নতুন বাস্তব হয়ে ওঠে, হয়তো এসব আবেগের পুনর্জাগরণ ঘটে যায়।'

— কবি গণেশ বসু বিশ শতকের ষাটের কবি। সেকালের রোমান্টিক আবেগ মেশানো স্বদেশ-প্রেম, জীবন যন্ত্রণার অমোঘ পরিণাম এবং সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা— বিপন্ন মূল্যবোধ— ভ্রষ্ট রাজনীতি— সবই আত্মসমীক্ষায় একটা বিস্তৃত ইতিহাস, প্রায় ষাট বছরের— কখনো পাওয়া না পাওয়ার বেদনায়, কখনো স্বপ্ন-রঙিন ফানুসে, কখনো স্বপ্নভঙ্গের বিষাদে কবিতার আঙিনায় স্ফূরিত। জীবনের কঠোর বাস্তবতায় পথ চলতে চলতে তিনি সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিকে দেখেছেন নিজের চোখে-নিজ বিস্ময়ে, গড়ে তুলেছেন বোধ ও বোধির জগত। এখনও সৃষ্টিশীল তিনি। তাঁর কবিতার বয়নে যেমন শব্দগ্রন্থনের অভিনবত্ব আছে, তেমনি বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় পর্যবেক্ষণ। সত্যের মুখোমুখি এক প্রজ্ঞাপ্রজাপতি। নব নব ভাবনার— নব নব উন্মেষে পাঠক এখনও সচকিত হয়। পথভ্রষ্ট নাগরিকের সামনে তাঁর কবিতা প্রকৃষ্ট অন্বেষণ। দীর্ঘ ষাট বছর যে কবি আত্মানুসন্ধানে এবং আত্মজাগরণে ইতিহাস ধরে রেখেছেন, যে সমাজ-বিবর্তনের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন কখনো পদ্যে, কখনো গদ্যে সে তো সংরক্ষণের। যে মার্ক্সবাদী বা লেনিনবাদী— অর্থাৎ সক্রিয় মানবতাবাদী চেতনায় তাঁর মনে রাতুল নিশান ওড়ে সারাক্ষণ— তার তলে বসে ক্ষমতালিপ্সুদের অবনমনও তাঁর চোখ এড়ায় না। নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মপরিক্রমার যে অমলিন বৃত্ত রচনা করেছেন— তা আগামীর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ।

পত্রিকা প্রকাশও তো সময়ের দাবিতে ঘটে। ইতিপূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে 'প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনামে সাহিত্য সরণিতে কাজ করেছি। সাহিত্য-অঙ্গনেও 'কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে' এবং কবি-সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের অকাল প্রয়াণে সাহিত্যচর্চার এক মাইলস্টোন

ছুঁতে চেয়েছি। আজ কবি গণেশ বসু আশি বছর পূর্ণ করছেন। স্বাভাবিক মননে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কাব্য-কবিতা ও গদ্যের পূর্ণ মূল্যায়ন জরুরি বলে মনে হয়েছে। যাঁকে চিনতে, জানতে চিন্তনের পটচিত্রে গড়ে ওঠা শিল্পই একমাত্র মাধ্যম। ইতিহাস সচেতনতা- রাজনীতি সচেতনতা, সমাজ-স্বদেশ তাঁর কবিতার পটভূমি। এমন পটভূমিতে নতুন ক'রে আতপ্ত আবেগে- সুতীব্র তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়াস। যিনি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং লেনিন কার্ল মার্ক্স প্রমুখ প্রতিভার চরণ-বন্দনা করেও ভালোবাসার স্বপ্ন বুকে লালন করেছেন।

কবি গণেশ বসু— এক সংগ্রামী জীবন। দেশভাগের যন্ত্রণা শিরায় শিরায়। বামপন্থী সংগঠনের তাপ-উত্তাপ তাঁর শরীরে প্রবাহিত। একপ্রকার যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে —আট বছর বয়সে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে কলকাতায়। তারপর ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে থিতু হওয়া গোলপোস্ট এখন 'বসুধারা'। স্বপ্নের দোর ধরে চলেছিলেন বলেই এক জীবনে শ্রমিক শ্রেণি থেকে অধ্যাপক—মাঝে সাংবাদিকতা সূত্রে জার্মান-বাসের অভিজ্ঞতা। সবটাই পুঞ্জীভূত মেঘের মতো আজও ভেসে বেড়ায় কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। তাঁর কবিতা বাহুল্য বর্জিত এক নতুন আকাশ— এখানে অবগাহন করলে প্রেমের বাঁশি শুনতে শুনতে স্বদেশপ্রেমে স্নাত হবেন। মানুষের জন্য ভালোবাসায় তাঁর মন ও মনন সদা সচকিত। শব্দ প্রক্ষেপণে অদ্ভুত গতিময়তা এবং মাদকতা। কখনো পদ্যে কখনো গদ্যে সে উচ্চস্রোত প্রবাহিত। এখন তো বহু কবি রাজসভাকবির নগ্ন পোশাকে তাঁবেদারিতে মগ্ন, সেখানে কবি গণেশ বসু সোজাসাপটা, আবেগ-বিহ্বল, কখনো নিজ চিন্তনে গড়ে তোলেন দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, কখনো লোকজ শব্দের আঁশটে গন্ধে উগরে দেন ক্ষোভ। তাঁর উচ্চারণ ভাঙাদেশের যন্ত্রণায় তৃষ্ণার্ত— ব্যথাতুর, অথচ ভাষায় আছে পেশল-শক্তি পৌরুষদীপ্ত ভঙ্গি। কটাক্ষ ঝরে পড়ে মুখর ঝরনার মতো। তবে তাঁর এই প্রকাশে নিশ্চিতভাবে যে চিত্তক্ষোভ প্রতিধ্বনিত তা মানবিক পৌরুষের, তাই তিনি লেখেন "সমুদ্রমহিষ"— 'মাঝে মাঝে ক্ষোপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্র মহিষ'। আজও তিনি অবিচল স্বকীয় বৈষ্ণবধর্মে— যে ধর্মে আছে মানব-সমাজের অস্তিত্বের জন্য আর্তি— 'ওদের আকাশে ভালোবাসা শুধু ভালোবাসা অভিমান/চেতনায় কাঁদি, ঘুরে ফিরে কাঁদি, কান্নায় নীরবতা'।

ইতিহাস ধরে রাখার আন্তরিক প্রয়াসে এমন কবির আশি বছরের পূর্ণতা মূর্ত প্রতিমার মতো প্রোজ্জ্বলিত হোক পাঠকের অমৃত আস্বাদে।

জয়গোপাল মণ্ডল

১ ডিসেম্বর, ২০২০

কবি গণেশ বসু

পবিত্র সরকার

১

কবি গণেশ বসু কবি হিসেবে যথেষ্ট আত্মনিবেদিত এবং স্বীকৃত ছিল, আর বামপন্থা তার কবিতায় এক বিশিষ্ট উপাদান। পুরানো 'পরিচয়' এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় আমি এক সময়ে তার বহু কবিতা পড়েছি। তবে তার কবিতার ক্ষেত্রে আমি গুণমুগ্ধ ও সপ্রশংস পাঠকমাত্র। সে সম্ভবত আমার বছর চারেক পরে এম এ পাশ করেছে, এবং তার পরেই তাকে তুমুল জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। সে পাঠভবনের মতো স্কুলে শিক্ষকতা করেছে, কলেজে পড়িয়েছে, আরও বিচিত্র কাজ করেছে, একটি নিশ্চিন্ত পরিবারনির্মাণের জন্য; সেই অমানুষিক সংগ্রামের কিছু কিছু খবর আমি রাখি। ছাত্র হিসেবেও সে ভালো ছিল, আর পড়ানোতে তার প্রচুর সুনাম ছিল তা আমি জানি, তার ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই আমার কাছে তাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করত। এই জায়গায় তার সাফল্যের একটা বড় কারণ হল তার অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। বিশেষ করে ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়ে আমি যে তার কত ফোন পেয়েছি এবং এখনও পাই, তার পরিসংখ্যান করা মুশকিল।

গণেশকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনতাম, কিন্তু সে আমার সহযোগী হল ১৯৮৯ নাগাদ, যখন (এখন প্রয়াত) সুকুমার দাস নামে এক প্রকাশক বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির থেকে আমার কাছে ধারাবাহিক ব্যাকরণ বই লেখার প্রস্তাব নিয়ে এলেন। সুকুমারবাবু ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের রাধামোহনপুরের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তখন মাধ্যমিক বোর্ডের বাংলা ব্যাকরণের নতুন সিলেবাস তৈরি হয়েছে, আগেকার সংস্কৃত-গন্ধি ব্যাকরণের প্রভাব সরিয়ে বাংলা ভাষার চরিত্র কিছু ছাত্রদের ধরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এখনও দেখি, ছাত্রদের ঘাড় থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বোঝা তত নামেনি। বাংলাটা যে একটা আলাদা ভাষা, তার নিয়মকানুন যে আলাদা, এখনও ব্যাকরণ-টুকে ব্যাকরণ লেখকদের এবং বেশ কিছু বাংলার শিক্ষকদের এই ধারণা পরিষ্কার নয়। যাই হোক, আমরা সিলেবাসে বাংলার পক্ষ নিয়ে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেম, গণেশ ছিল

আমার সোৎসাহ সঙ্গী। তার ভাষাবিজ্ঞানে আগ্রহ তখনও প্রচুর ছিল, এখনও আছে। আমরা ধ্বনি ও বর্ণের তফাত, বাংলা কারক ও বিভক্তির পুনর্বিন্যাস, পরিভাষা নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নেমেছিলাম। ইচ্ছে ছিল বাংলা ভাষার স্বরূপ বাংলা ব্যাকরণে আরও বেশি প্রতিফলিত হোক। এই কাজে গণেশ ছিল আমার সহচর ও সহায়ক।

আমি সাধারণভাবে ব্যাকরণের ব্যাকরণ অংশটা লিখতাম, গণেশ রচনা অংশটা। তবে দুজনেই দুজনের অংশে চোখ বুলিয়ে নিতাম। তার ভাষা প্রথম দিকে তখনকার দিনে পি. আচার্য ধরনের পল্লবিত ছিল। এটা তার নিজের ইচ্ছায় নয়, তখনকার দিনে পরীক্ষকেরা এই ভাষা পছন্দ করতেন, এবং কোনও নামের আগে বিশেষণের মালা না বসিয়ে সে ভাষা ছাড়ত না। যেমন 'চিরবিপ্লবের বজ্রধ্বনি, পরাধীন, শোষিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষুধাতুর মানুষের প্রজ্বলন্ত প্রতিনিধি বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম'। আমার কুসংসর্গে এসে গণেশ এই শৈলী ছাড়তে আরম্ভ করে এবং চমৎকার একটি নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলে। সে কবি, তার পক্ষে ওই ভাষা আয়ত্ত করা আর লেখা কঠিন ছিল না। জানি না, তার পাঠ্যবইয়ের গদ্যের শৈলীতে এই পরিবর্তন ঘটিয়ে আমি তার অপকার করেছিলাম কি না। সহজ ভাষায় সরলভাবে বুঝিয়ে লিখলে যে উত্তর স্বচ্ছ হয়, এবং তাতে ছাত্র মুখস্থবিদ্যাকে পরিহার করে নিজে কতটা বুঝেছে আর কতটা গুছিয়ে লিখতে পারে তারও প্রমাণ হয়, আমাদের স্কুলগুলিতে তার স্বীকৃতি ছিল না। আমাদের বইগুলি বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির (৯ কলেজ রো) থেকে 'ভাষা জিজ্ঞাসা' নামে বেরিয়েছিল, এবং খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, ক্লাস নাইন-টেনের ব্যাকরণে আমাদের সহযোগ শুরু হয়েছিল। তা ছাড়াও ওই প্রকাশকই উচ্চমাধ্যমিক বাংলার জন্য 'ভাষাসরিৎসাগর' নামে একটি সংকলন বার করেছিলেন, সেটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটিই গণেশ আর আমার যুগ্ম-প্রণয়নের শেষ চিহ্ন। পরে সরকার ব্যাকরণ বইয়ের দায়িত্ব নিয়ে নেয় বলে আমাদের বইগুলি তেমনভাবে লোকের গোচরে নেই। তবে পুনশ্চ ও গ্রন্থতীর্থ নামে প্রকাশনা তার কিছু ছাপে, তাতে আমাদের নামদুটি জুড়ে আছে।

সেই থেকে গণেশ আমার আর-এক অনুজের স্থান নিয়েছে। আমি তার পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। দেখেছি তার মেধাবী ছেলে আর মেয়েকে জীবনে প্রতিষ্ঠার সোপানে স্থাপন করার জন্য তার কী অমানুষিক পরিশ্রম। সুখের বিষয়, তাদের একজন বিজ্ঞান গবেষক আর অন্যজন ডাক্তার হয়েছে, বিদেশে সফল জীবিকা ও যাপনে উত্তীর্ণ। গণেশের প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক, এবং তার জীবনে এখন সুখের সমস্ত উপাদানই প্রস্তুত থাকার কথা ছিল।

কিন্তু যা হয়, জীবন গণিতের যোগের অঙ্ক অনুযায়ী এগোয় না। এ রকম অনেক মধ্যবিত্ত দম্পতির মতোই গণেশ আর স্ত্রী এখন একা ও নিঃসঙ্গ, সন্তানেরা কেউ কাছে নেই, এই উপমহাদেশে প্রায়ই এটা হয়। তার চেয়েও বিপন্নতার কথা এই যে, তার স্ত্রীর সেই ব্যাধি ধরেছে যা মধ্যবিত্তের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সেই ক্যান্সার। তার দেখাশোনা, চিকিৎসাব্যবস্থা ও পরিচর্যার গুরুদায়িত্ব এখন গণেশেরই উপরে প্রায় পুরোটা। মাসে একবার করে কেমোথেরাপি দেওয়ার জন্য তাকে রুবি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় গণেশকেই। আর তার নিজের শরীরও খুব ভালো নয়। এ সব কাজের জন্য তার কষ্ট হয়, কিন্তু গভীরভাবে পারিবারিক এই মানুষটি হাসিমুখে নিজের কাজ করে চলেছে। তার স্ত্রীও অপরিসীম ত্যাগ আর শ্রম দিয়ে তাদের যুগ্ম সংসারকে গড়ে তুলতে গণেশের সহযোদ্ধার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

২

আমি এখন আর কবিতার একাগ্র পাঠক নই, কোনও কিছুরই একাগ্র পাঠক নই, কাজেই গণেশের কবিতা সম্বন্ধে আমার প্রীতির কথাই শুধু বলতে পারি, বিচারের কথা নয়। আগে নানা পত্রপত্রিকায় গণেশের কবিতা ইতস্তত পড়েছি, এবং এটা ভেবে ভালো লেগেছে যে, সমর্থ কবিত্বের নির্ভুল চিহ্ন তার কবিতাগুলিতে আছে: আর সেই সঙ্গে সমাজ-মনস্ক, ইতিহাস-মনস্ক, আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, বিশেষভাবে বামপন্থী কবিতার যে ধারাটা চল্লিশের বছরগুলিতে প্রবল বিক্রমে উদ্ভূত হয়ে ষাটের বছরগুলিতে তুলনায় ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তাতে গণেশ পরে হলেও যোগ দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর সকলকে শুনতে বাধ্য করেছে। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, ১৯৬৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত তার বারোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখন দিয়া প্রকাশনী প্রকাশিত এবং ড. জয়গোপাল মণ্ডল সম্পাদিত গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ বইটি হাতে পেয়ে যেমন বিস্মিত তেমনই আনন্দিত হলাম। এটা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমার কাছে গণেশের যে পরিচয় ছিল তা ব্যক্তিগত হওয়ার জন্য বেশ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ ছিল, এবং তার বাইরে কবি হিসেবে তার একটা বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সে নির্মাণ করেছে, এবং সেটা আরও অনেক মূল্যবান আর টেকসই। তার কবিতা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নানাভাবে। এই সংকলনটি ধরে খুব নিবিষ্টভাবে এগোনো এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যেটা অবাক হয়ে দেখি, এবং সম্পাদকও প্রত্যাশিতভাবেই লক্ষ করেছেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-এর পরে গণেশের কাব্যভাবনা এবং ভাষার অভিমুখ বেশ অনেকটাই বদলে গেছে। এ বই যখন বেরোয় তখন গণেশ সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলার এম এ ক্লাসে পড়ছে, এবং আমাদের অনেকেরই মতো কোনও নারীর মুখ তার কাছে হয়তো বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। ফলে তাকে ঘিরে তার কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, এবং সনেট ও সনেটপ্রতিম একাধিক কবিতা তার কলম থেকে নির্গত হচ্ছে। নির্গত হচ্ছে এমন এক ভাষায় যার সাধুভাষার ক্রিয়াপদ প্রায়ই দেখা দিচ্ছে, যা জীবনানন্দ এবং প্রাথমিক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পরে প্রায় বিলীন হয়ে এসেছে তখন। কিন্তু এখানেই গণেশের হাতের শক্তি অনেকটাই বোঝা যায়, কারণ সে নিজের শৈলীকে একটা কঠোর বাঁধুনিতে বেঁধে শুরু করেছে। অথচ তৎসম শব্দের অন্তরালে তার আবেগের স্পন্দনও আমরা স্পষ্ট অনুভব করি।

এই বিশুদ্ধ প্রেমের অনুভবে পরের গণেশকে কদাচিৎ ফিরে আসতে দেখি। হ্যাঁ, 'নীরব সন্ত্রাস'-এ 'চন্দরা' বলে আর-একটি নারীর কথা আসে একটি কবিতায়, যাতে 'আমিও তোমার মতো একা একা ক্ষয়ে যাই সর্বনাশ নামে' বলে মোচড়-দেওয়া ছত্র আসে। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকে গণেশের কবিতার শৈলী আর বিষয় দুইই যেন অনেকটা উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রেম, নারীর কাছে আত্মনিবেদন, আর যৌবনবেদনা থেকে তার কবিতার মোড় ঘুরে যায় মানুষ আর সমাজের দিকে। তখন সে এক দায়বদ্ধ বামপন্থী কবি হয়ে ওঠে। শুধু কট্টর বামপন্থী নয়, ইতিহাসে নানা উত্থানপতনের যে সব ঘটনা ঘটে নকশাল আন্দোলন (জঙ্গল সাঁওতালকে নিয়ে একটি কবিতা আছে তার), বাংলাদেশের মহিমময় আবির্ভাব, পশ্চিম বাংলায় বামপন্থার সমস্যা, পরে শাসকদের সন্ত্রাস— সবই তার কবিতায় একে একে তরঙ্গ তৈরি করতে থাকে।

এবং আমরা ইতস্তত লক্ষ করি, কীভাবে গণেশ নিজেকে ভাঙছে, গড়ছে, বদলাচ্ছে। ছন্দের বিপুল পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে সে, যেমন করছে স্তবকবন্ধনের। এমনকি ২০০৫-এর 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' বইয়ে, 'কংক্রিট' কবিতার ধরনে এমন সাজানো ছত্রও আমরা পাচ্ছি—

ঠিকঠাক কিছুই চলছে না
না দিন
না রাত
না রাস্তা
না ফুটপাথ
না কলেজ
না স্কুল
(না)

বা ঊনষাট সংখ্যার কবিতায়—

শান্ত মুখ।
দৃপ্ত মুখ।
অঙ্গীকার।
আইন ভাঙার।
পাঁজর ফোঁসে। গাঁইতি ফোঁসে। কাস্তে ফোঁসে। লক্ষ মুখ।
আইন ভাঙার।

যত সময় এগিয়েছে তত গণেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝোঁক আরও অনর্গল হয়েছে। তাঁর শেষ বইয়ের কিছু কবিতা যেমন নিছক গদ্যে বিচরণ করে, তেমনই আবার কিছু কবিতা ('এবং মেয়েরা', 'সংবিধান', 'ভালোবাসা', 'বুদ্ধিজীবী' ইত্যাদি) ভাষাকে প্রায় বর্জন করে নানা প্রতীকচিহ্নে চিত্রল হয়ে ওঠে, তাকে অনেকটাই ছুটি দেয়।

আমি গণেশের এই আত্মবিস্তার দেখি আর মুগ্ধ হই। আশা করি সে আবার ভাষায় ফিরবে, কারণ প্রতীকচিহ্ন কবিতাকে পুরো মুক্তি দেয় বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অগ্রজ হিসেবে আমি গণেশের, সপরিবার সংকটহীন দীর্ঘজীবন কামনা করি। তার কবিতা যাপনও দীর্ঘ হোক।

গণেশ বসুর কবিতা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিকচ কুসুমের বিভঙ্গে নিসর্গের দুটি টান। কবিতার আত্মপ্রকাশেও ঐ দুটি টানই। একটি কেন্দ্রাভিগ, অপরটি কেন্দ্রাতিগ। কেন্দ্রাভিগ শক্তিতে কবি বহির্বস্তুকে স্বাধিকারে আনেন এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির অরোধ্য আকর্ষণে তাকে সমর্পণ করেন শব্দের বিশ্বে। কবিতা শব্দম্ভর; 'অর্থ' শব্দানুসারী ও শব্দাতিশায়ী। শব্দ নিয়ে অনাচার সতর্ক কবিকে মানায় না। কারণ শব্দ দিয়ে যে প্রতিমা তিনি গড়েন সেই প্রতিমা পাঠকের সামাজিক বিবেকের প্রশ্রয়প্রার্থী। শ্রুতি থেকে স্মৃতিলোকে কবিতার অভিসার সার্থক করার জন্য কবিকে একই সঙ্গে থামতে ও চলতে শিখতে হয় শব্দ নিয়ে। তাঁর থামা ও নতুন করে চলার মধ্যে পাঠকের আবির্ভাব। গণেশ বসু এমনই এক কবি, যিনি তাঁর একই কবিতার মধ্যে একাধিক অনুভবের অন্তর্বয়ন করে চলেন নিরন্তর এবং শব্দশরের সতর্ক নিক্ষেপের মুহূর্তে পাঠককে জাগিয়ে রাখেন, ভাবিয়ে তোলেন অতঃপর।

যে-সময় গণেশ বসু কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন তখন ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায় ছিল, তেমনি সাদা কাগজে কালির টানে কবিতাকে মূর্তিমতী করার দায়িত্বও ছিল। জীবনকে টিকিয়ে রাখি আমরা দায়ে পড়ে, আত্মঘাতী হওয়া কঠিন জেনে। কিন্তু দায়বদ্ধ জীবনে বড়ো দায়িত্ব একটাই—অনুভবের সত্যতাকে যথাযথ তুলে ধরা। গণেশ বসু জীবনের দায় মেটাতে মেটাতেই কবিতা পাঠকের কাছে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। কবিতা পাঠকালে উচ্চারিত বাঙ্ময় কবিতাটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কবির 'ego' বা 'alter ego' নিয়ে সমস্যা তার নয়,সমালোচকের। কিন্তু ভাষাতেই যদি লেখক (কবি নন) ইঙ্গিত দেন কবি ব্যক্তিটির দিকে তখন অনেকসময় মঞ্চ থেকে সাজঘরের দিকে পাঠক আকৃষ্ট হতে পারেন, সেখানে তিনি পেতেও পারেন 'কবি' নামক অধীশ্বরকে নয়, খেটে খাওয়া-রোদে পোড়া-মিছিল-মিটিং করা, আশা করতে করতে হতাশায় ভেঙে পড়া এক তরুণকে। ধীরে ধীরে সেই তরুণ প্রৌঢ় হয়। তার চোখের অতলে তখন হয়ত লুকিয়ে রাখা দীর্ঘশ্বাস অথবা অতীত কাতরতা। কালের বদল, পারিপার্শ্বের বদল ব্যক্তি মানুষকে বদলায়। গণেশ বসুও বদলেছেন।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' যিনি লিখেছিলেন 'নীরব সন্ত্রাস' তাঁরই লেখা। তাঁর অবিচ্ছিন্ন জীবন প্রবাহে তিনি স্রোতাপন্ন এবং তটস্থ, দর্শক এবং প্রদর্শক দুই-ই। বেগবান জীবনের বাঁককে আমরা আর একটা জীবন ভেবে ফেলি সাধারণতঃ, অন্তর্লীনধারা দৃষ্টিগোচর নয় বলেই ভুলটা ঘটে। সতর্ক অনুধাবনে বোঝা যায়, অন্তরালবর্তী ব্যক্তিটি ক্রমেই বহিরাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ছকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সব মিলে তিনি কিন্তু একই বহমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রথম ছকে যে-কবি অসম্ভব আকুতি নিয়ে বিপরীত অর্থসূচক নঞর্থক বাক্যে বলেছিলেন 'আমাকে ভুলিয়া যেও, এই মাত্র মিনতি আমার' সেই তিনিই কিন্তু প্রত্যাশা থেকে উচ্চারণ করেছেন 'নিভৃত কোরকে তুমি ভালোবাসা রাখিও সুন্দরী/স্মরিয়া প্রভূত দাবী প্রেমিকের'। চৌদ্দ পঙক্তির আঠারো মাত্রার কবিতাগুলিতে যে প্রেমাকুতি তার পরিণাম নৈরাশ্যে বলেই ব্যক্তিবিশ্ব থেকে ব্যক্তি নিষ্ক্রান্ত হতে চান, হতেও পারেন; কিন্তু সেখানেও 'চারিধারে গভীর নিরাশা'। যে-নৈরাশ্য রোমান্টিক মনের স্থায়িভাব তার আলম্বন কোনো নাম্নী যদি না-ও হয় তথাপি কল্পিতাকে আলম্বনেও কবির কাজ চলে যায়, চিরকালই গ্যাছে কবিদেরও। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সন্ধান পাঠকের পক্ষে অরণ্যে রোদন। সুতরাং গণেশ বসুর বনানী থাকতেই পারেন শুধুমাত্র অনুভবে এবং তাঁর লালনও চলতে পারে শব্দহীন পৃথিবীতে। কিন্তু যখন শুনি 'এখন নিকটে নাই' তখন চলতে থাকে দার্শনিক— শোভন নির্মম উচ্চারণ, এবং সমাপ্তিতে একটি দীর্ঘশ্বাস—'বিশ্ব-চরাচরে/কেহই রবে না জানি অন্ধকারে স্মৃতির শিয়রে।' প্রেমের জন্যে একটি মানবিক আর্তি সঞ্চালকের কাজ করছে বলেই কখনও উচ্চারিত হয় 'প্রেমের সমস্ত সংজ্ঞা অবশেষে প্রান্ত বর্তমান' অথবা 'আমার শোকার্ত আত্মা পিপাসার্ত' 'জিহ্বা দ্বি-খণ্ডিত' এবং কখনও প্রতিপক্ষে কেউ না থাকলেও অন্তর্গূঢ় দ্বি-বাচনিকতা কবিতায় এসে যায়—'আবার ফিরিয়া যাবো।' কিন্তু ফিরে গিয়ে প্রত্যাশা করা হচ্ছে; 'ঈশ্বরী প্রতিমা মমতাজ-ও শা-জাহান নামক প্রেমের archetype-এর কাছে যে বস্তু তাতে দুঃখের নিখিল। চল্লিশটি কবিতার এই সংকলনে ব্যক্তি কবির যে বয়সটি ধরা পড়েছে তা কুড়ি/একুশ-এর মধ্যে। একটি বিশিষ্ট অনুভূতির বিষণ্ণ হৃদয়ে যে লালন চলেছে তা প্রকাশে অজস্র শব্দপ্রতিমার আয়োজন 'কবন্ধ বাতাস', 'বিষণ্ণ মুখর দিনে', 'ভাস্করিত গোলাপের উজ্জ্বল শোণিমা', 'শোকের প্রকোষ্ঠ', 'জ্যোৎস্নার নীলাভ রোদ'। ষাটের কোনো তরুণ কবির পক্ষেই কাব্যের নির্মাণ সম্ভব ছিল না জীবনানন্দকে বাদ দিয়ে। জানি না কষ্টকল্পিত হবে কিনা, তরুণ কবি যে—নাম্নীর মায়াবী নয়ন দেখেছিলেন তার নামকরণে বনলতা নামটির প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। জীবনানন্দ-রসিক কবি স্বাভাবিক তারুণ্য বশতঃই অনুকরণ করে থাকতে পারেন জাহাজ এবং

বন্দরের উপমান। অথবা, বনানী হতেও পারে সেই বালিকানায়িকা যার 'চোখে উছলে উঠতো নিশিন্দাপাতার মায়া' (নীরব সন্ত্রাস কাব্যে)।

১৯৬৪-তে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' এর তিনবছর পরে প্রকাশিত কাব্য 'নিজের মুখামুখি।' প্রথম কাব্যের রেশ রয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থখানির প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায়। 'তোমার যৌবনে আজ ফিরে যাবো কল্যাণী আমার' অথবা 'অথচ সেদিন ছিলে তুমি কী ভীষণ অমিত নিকটে' জাতীয় উচ্চারণে আমি-ত্বের অবস্থান কবিতাকে Subjective করে তোলে। কবিতার এই কেন্দ্রবাসী আত্মার জাগতিক পরিচয় যাই হোক, কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার আসা-যাওয়া পাওয়া-না-পাওয়ার সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। কবির 'আমি' যেন 'আমরা' হয়ে উঠতে সময় নিচ্ছিল। 'চব্বিশ হলো না শুরু' কবিতার শেষ দিকে নিজের থেকে বেরিয়ে এলেন কবি। ব্যূহবদ্ধ, ব্যথাক্লিষ্ট যুবকদের প্রতিনিধিত্ব করছে একটি বহুবচনাত্মক উত্তম পুরুষের সর্বনাম। প্রয়োজন ছিল এই সর্বনামের। ব্যক্তি থেকে কবিকে বাইরে এসে অনেকের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয় এক সময়। তারপর একসময় তটস্থ 'আমি' স্রোতাপন্ন 'আমি'-কে দেখে কবিতা লেখে। ক্রমেই Realwriter & Author-এর পার্থক্য ধরা পড়তে থাকে। 'চব্বিশ হলো না শুরু'তে যেমন আছে এমন উক্তি' 'আমরা সবাই/একালের অভিমন্যু', অনুষঙ্গে আসে শমীবৃক্ষের কথা, তেমনি কিছু আগেই এসে যান ইতিহাস ও ভূগোলের বাধা ঠেলে সক্রেটিশ অ্যারিস্টটল-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-কনফুসিয়াস। কিন্তু নৈরাশ্যের ঘোর কাটে না কবির, তাঁর চোখে তাই মনীষীরা সকলেই অসহায়। ব্যক্তির আপন অসহায়ত্ব বোধ সমীভূত হয়ে যায় মনীষীদের অসহায়ত্বের সঙ্গে। এ একধরনের Universalisation যা কিনা চব্বিশের তরুণের পক্ষে আত্মরক্ষার কবচ। বহুজনের অসুখের অংশীদার না হলে একা-র অসুখ তীব্রতম হয়ে ওঠে। হয়ত মধ্যে মাসখানেকের ব্যবধান। কবি লেখেন 'অন্ধকার সময়ে' যে শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এলিয়ট বারবার 'O dark, dark' কথাটা উচ্চারণ তো করেনই, এমন কি তাঁর সব কবিতাতেই তাঁরই 'Murder in the Cathedral' নাটকের 'Living and the partly living' এর যাতনা জড়িয়ে দেন, সেই শতকের কোনো 'অনুভূতিশীলই' আনন্দ থেকে বিশ্বের জন্ম এমন ঋষিবাক্যে আস্থা রাখতে পারেন না। এমন কি শান্ত সমাহিত রবীন্দ্রনাথও ছিয়াত্তর সাতাত্তর বছর বয়সে গর্জন করে উঠেছিলেন তাঁর পক্ষে প্রায়-বেমানান। (প্রান্তিক দ্রষ্টব) তবু মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথও উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। গণেশ বসুর কবিতায় দেখি অন্ধকার সময়ে 'নাস্তিময় শতাব্দীর বিষাক্ত বিবর', 'স্নেহ অনুরাগ যেন পূর্বতন শতাব্দীর নগ্ন অভিজ্ঞান'। এই শতাব্দী নাস্তিময় বলেই

পূর্বতন শতকের স্নেহ অনুরাগ বিশ্বাসযোগ্য থাকে না। অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিশ শতকের তরুণ ক্ষত বিক্ষত চিত্তে লেখেন 'দেখেছি রোদের শুভ্র অক্ষমতা', 'বিবেকের ভয়াল দংশন' এবং দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ শতকের গভীর গোপনে বহমান রক্তস্রোত তাকে ভীষণ বিপন্নতার বোধকে তাড়িত করে তোলে। কার কাছে কবির এই সংবাদ নিবেদন জানি না। হয়ত সমকালীন ও আগামী দিনের তরুণ পাঠকের কাছে। অথবা যেন নিজের একসত্তার আর এক সত্তার কাছে এই সকরুণ নিবেদন:

দেখেছি রোদের শুভ্র অক্ষমতা, বিবেকের ভয়াল দংশন
নিয়ত বিক্ষত করে সহজ স্বভাবে তার, এই বিংশ শতকে
বয়ে যায় রক্তস্রোত, প্রতারণা সহৃদয় বিপ্লবের কথা ;
পায়ের মাটিও কাঁপে থরো থরো, শতকের দ্বন্দ্বিক হৃদয়
কি ভীষণ কম্পমান; কাঁদে শুধু অনির্বাণ-বৃক্ষের চেতনা।

গোটা একটা কবিতা জুড়ে অন্ধকার অথবা অমা-র বিস্তার। 'কীর্তনিয়া' গণেশ বসুর স্বনির্বাচিত কবিতাসমূহের একতম। এই কবিতাতেও ক্রন্দন, বিষাদ, শূন্যতা ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কবিমনের বিচিত্র বিভাব। 'ঋণ' কবিতায় কবি সুকান্ত-র মতই যেন সংশয়ী ও প্রতিবাদী। পাঠকপ্রতিক্রিয়া তত্ত্বানুযায়ী 'আমার সুকান্ত'র নামোল্লেখ সমর্থন পেতে পারে শেষ স্তবের ভাষাভঙ্গিমার দিকে লক্ষ্য রাখলে :

তাইতো যদিও শিকড় ছিঁড়েছে, সামনে ক্রান্তিকাল
দিগন্ত জোড়া ক্রোধ,
দুই হাতে ছিঁড়ি প্রতিমুহূর্তে সময়ের মায়াজাল
গড়ে তুলি প্রতিরোধ,
জন্মের ঋণ তবু কি হবে না শোধ?

জন্মের ঋণ নিঃশেষে শোধ করা সম্ভব নয় কোনো কবির পক্ষেই। নিরাশাতাড়িত তরুণও আকস্মিক ক্ষিপ্ততা অনুভব করেন তাঁর রক্তের গভীরে। একবার প্রত্যাশায় হয়ত মানসপ্রত্যক্ষ করে লেখেন 'সূর্যের দেশে আমাদের যাত্রা অব্যাহত', কিন্তু তার পরই পাখির ডানায় নেমে আসা অন্ধকার ঢেকে দেয় 'প্রবাল দ্বীপের বিস্তৃত চেতনা' এবং পূর্বপুরুষদের যাবতীয় ব্যথা বেদনার স্মৃতি আতুর করে তোলে কবিকে :'বুকের তলদেশে/হাজার হাজার বছরের প্রাচীন হাহাকার—/তীক্ষ্ণতর হয়ে সমুদ্র আর আকাশকে ঢেকে দ্যায়/আকাশ আর সমুদ্রকে।' কিন্তু আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান চিত্ত সান্ত্বনা খুঁজে পায় সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসময় আকাশের মতো ঘন 'রোদের মত উজ্জ্বল' কোনো এক মধ্যমপুরুষের দুটি চোখে। গণেশ বসু-র কবিতায় 'আমি' প্রায়শঃই 'আমি', কখনো 'আমরা'। কিন্তু ওঁর তুমি-কে সনাক্ত করতে অসুবিধে। প্রেয়সী ভেবে যখন পাঠক একটা তল পেলেন বলে ভাবেন তখন তা হয়ে ওঠে

স্বদেশ। প্রেমিকা ও স্বদেশের এই আনন্দময় ব্যতিহার সত্যিই পাঠককে কবি সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ও সজাগ করে তোলে। 'তারপর' নামের কবিতায় কবি ঘটমান বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পরস্পর বিরোধিতার যে ছবি আঁকলেন তাতেই একটা প্রমাণ মেলে যে বনানী-র কবি বৃহত্তর সম্ভাবনাময় এক ভূমির সন্ধান পেয়েছেন যা উৎপীড়িত হলেও নিঃশেষিত হয়নি :

যদিও বুকের প্রদেশে আমার বন্ধ্যাভূমির হাহাকার
এবং বিশ্বাসেরা ক্রমশই আলোর বিপ্রতীপ,

রক্তে যেহেতু আছে উজ্জ্বলতা তাই একসময় প্রার্থনার ভঙ্গিতে তিনি উচ্চারণ করতে পারেন :

হে আমার রক্তাক্ত মৃত পাখিরা উজ্জ্বল হও
উজ্জ্বলতা আমার তীর্থভূমি।

আবার হয়ত সমকালের কোনো বেদনাময় অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। 'রক্তঝরে মনে আমার নিরন্তর'। আসলে জীবনানন্দের পরেকার কবিরা অন্তরের গভীরে যে-রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে নিরন্তর সেই রক্তপাতের হিসাব দিতেই আগ্রহী। দৃশ্যতঃ যা মহিমাময় ও সুন্দর তা-ই যে সত্য বা একমাত্র সত্য নয় তার গোপন গভীর যে অন্যকথা বলে অর্থাৎ সত্তা যে ক্রমেই হয়ে চলেছে বিভাজিত এই অন্তরঙ্গ সত্যের উন্মোচন ঘটাতে চেয়েছেন বারবার। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা authentic & Unauthentic- আমাদের অস্তিত্বের এই দুটি ভাগ যখন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন তখন থেকেই একের মধ্যে বহুর অথবা অন্তরঙ্গের সঙ্গে বহিরঙ্গের একটা ফারাক যেন বীক্ষণাগারে পরীক্ষিত সত্যে রূপ নিতে লাগল। নিজের 'এক' যখন বিমর্ষ ও হতাশাদীর্ণ তখনই নিজের আর 'এক' হয়ত শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে দেয়। এই opposition-এর সহাবস্থান সম্ভব বলেই একটা কবিতাও বহুবাচনিকতায় গড়া উপন্যাসের শৈলীকে করায়ত্ত করে ফেলতে পারে। তাই যদিও কবির একসত্তা 'স্বীকারোক্তি' করেন— 'গভীর বিশ্বাস ধীরে ধীরে/লুপ্ত তাই চেতনায়, বুকে জ্বালা ঘৃণা বিদ্বেষের', তবু প্রতীকায়িত হয়ে যাওয়া সাম্য চেতনা হয়ে যায় লাল পাহাড় এবং চতুর্দিকে বন্ধ্যাভূমির হাহাকার শুনে লালপাহাড়ের স্বপ্ন দেখেন কবি। 'তুমি' কবিতার মধ্যমপুরুষ কে? সে যেই হোক বনলতার নামান্তর 'বনানী' নয়। নয় এই কারণে যে মধ্যমপুরুষের বহুবচন এসে গিয়েছে একবচনের কাছাকাছি বৃত্তাংশে; যেমন 'এখানে বুঝিবা আমাদের মুক্তি নেই, ...' এর অনতিপরেই পাই 'বেঁচে যাই যদি/ পাই তোমাকেই নিরবধি'। আলোর প্রত্যাশাই শেষ পর্যন্ত কবিতার মর্মকেন্দ্রে সত্য হয়ে ঠাঁই পায়। গণেশ বসু-র 'তুমি' এবং 'তোমরা'র মতই 'এখন' শব্দটা অনুচ্চারিত, 'তখন'-এর অস্তিকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে

দেয়। বা কবিতা বলেই অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বে অন্তর্বয়ন তাঁর কাব্যিক উচ্চারণকে অন্য এক পরিসীমায় বিস্তার দেয় : 'এখন সব কিছু বিবর্ণতায় মুখ ঢাকে/চতুর্দিকে অন্ধকার—/আমার বুকে/প্রস্তর যুগের আর্তনাদ নিকটতর', 'তখন' আর 'এখন'-এর দ্বৈতলীলা 'শূন্যতার পাশাপাশি' কবিতাটিকে গভীর অর্থবহ করে তোলে; যেমন : 'আমার বুক/যৌবনের প্রান্তরে।/অথচ তখন তোমার চুল আমার কাছে অসহ্য/গ্রীষ্মের মতো প্রচণ্ড'। 'বুক' ও 'বাহু', 'হৃদয়' এবং নির্বিশেষ 'প্রেম' বিপরীতের মধ্যে থেকেই গণেশ বসুর কবিতাকে গতিময় করে। এই প্রত্যয় অপ্রত্যাশিত হলেও কোনো এক সংবেদনশীল তরুণের মুখ থেকে উচ্চারিত হতেই পারে : 'ভালোবাসা কোনোদিকে নেই, উষ্ণতা কোনোদিকে নেই/সংশয় প্রবলতর'— এই অনুভূতি কবির সমকালের অনেকের বলেই ব্যক্তিকবি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছেন। তাই যে প্রণয় কামনা ও ব্যর্থতার বেদনা এককের জীবনে রোমান্টিক হয়ে বেজেছিল, তা ক্রমে যুগবৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল এই ভাষায় : 'হয়তো কেউ/ভালোবাসবে না'। কিন্তু তরুণের স্বপ্নে প্রাজ্ঞ প্রবীণের দার্শনিকতার ছাপ লেগে যাওয়ায় কবি স্রোতাপন্ন না থেকে হয়ে গেলেন তটস্থ। তটস্থ না হলে এমন গভীর ও গম্ভীরভাবে অচপলতা প্রকাশ করা যায় না : 'সবশেষে কিছুই থাকে না—শূন্যতা, কেননা/সমস্ত জিজ্ঞাসার/সমস্ত মাঠের ফসল/ সংশয়ের কণ্ঠস্বর/আপন শব্দে সমাধান, এবং পূর্ণতা/যেন অন্ধকার পর্বতের শীর্ষদেশ/ভালোবাসাহীন'। সমকালের এই অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার আলেখ্য 'মার্চ, ১৯৬৬'। বোঝা গেল রচয়িতা রয়েছেন স্বকালে এবং স্বদেশে। কিন্তু এপ্রিল এল নতুন দিগন্তের সন্ধান নিয়ে, অবশ্যই Cruellest month হিসেবে নয়। কবি কোথায় গেলেন এই বিশ্বাসের ভিত ঐতিহাসিক তা সন্ধান করুন। কবিতা-পাঠকের আয়ত্তে শুধু কবিতাটাই, তার সন্ধানের বিষয় হতে পারে বড়ো জোর কবি মন, বাকিটা কবিতার বাইরেকার সাম্রাজ্য; সেখানে পাঠক ও কবি হতেও পারেন একাসনে উপবিষ্ট। যদি পাঠক ও কবি একই আসনে উপবেশন করতে আগ্রহী-হন, তাহ'লে কবি-হৃদয়ের উষ্ণতা পাঠককেও স্পর্শ করতে পারে: 'এখন/স্বপ্নের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম, পুরনো/শব্দের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম।' স্বপ্ন বদলে গেলে শব্দতো বদলাবেই। কিছুতেই কাটছে না ষাটের অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা। তাই পুরোনো শব্দ 'গহ্বর' এবং 'হিংস্রতা' লগ্ন হয়ে থাকল কবিতার সঙ্গে এবং এই দুটি মিলে সিংহের একটা ছবিও মনে আসতে পারে। এলোও তাই। লেখা হল 'মাথায় সিংহ, দু-পায়ে পতন'। পতনকালের চিত্রটি প্রখর হয়ে ওঠে 'মাথায় সিংহের বিচরণ' এর বৈপরীত্যে। যখন 'সুবিধাবাদীর ভূমিকায় সোচ্চার করতালি' এবং কারুর বুকে সূর্যের সাহস নেই অথবা নেই ভালোবাসার ঘনিষ্ঠ

উত্তাপ তখন 'মাথায় সিংহের বিচরণ' কারুকে সাহসী করে না, করে বেদনাতুর। শেষ পর্যন্ত কবির প্রশ্ন সমাজ বা পরিবেশকে নয়, কবির প্রশ্ন নিজেকেই ; কবি এখন 'নিজের মুখোমুখি।' নিজের মুখোমুখি হতে গিয়ে হয়ত চোখে পড়ে চারদিকে আশ্চর্যশীলতা এবং তার বিপরীতে 'আমার কণ্ঠে তৃষ্ণার্ত উটের চঞ্চলতা'। 'সিংহের মণি', 'নেকড়ের ক্ষিপ্রতা', 'গোখরোর' পিচ্ছিল শরীর চোখে না পড়ে পারে না যার, সেই কবি বলতে পারেন 'আমি/ভয়ংকর জেগে আছি সার্চলাইট চোখের মণিতে' এবং তাঁর কানে আসে প্রবল ধ্বনি পতনের, নীরক্ত বিবেক। যেহেতু 'রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ' এবং বাহুর পারদে/ভয়ঙ্কর অস্থিরতা (সমুদ্রমহিষ)। তাই একালের অন্যতম সামাজিক হিসেবে তাঁর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। 'প্রেমের কবিতা' যে কবিতার শিরোনাম তার আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাবে প্রেম বা প্রেম-প্রকাশোপযোগী পরিবেশ নেই। এই কবিতায় কবির সিদ্ধান্ত 'ভালোবাসা/প্রাগৈতিহাসিক'। কিন্তু পরের কবিতা 'দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা' কবিকে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে টেনে এনে বিচলিত করে। প্রেম যে কোনো প্রাগৈতিহাসিক সত্য নয়, প্রেম যে অস্তিত্বেরই আর এক নাম—বিশ্বাসের এই আধারটুকু না থাকলে কিছুতেই এই প্রত্যাশাময় বাণী কবি উচ্চারণ করতে পারতেন না :

এখনো সময় আছে ব্যাধিমুক্ত বিশুদ্ধ হবার
ফুল ফোটানোর স্বপ্নে, এখনো বিভোর
হবার দুচোখ আছে, মাটির আবির
লেগে আছে এহাতে-ওহাতে, বাঁচার মরার
দ্বন্দ্বে আজো খোঁজে সব মিলন বাসর।

কবির আলোর তৃষ্ণা যে কত দুরন্ত তা যেন স্বস্তিবচনের মত উচ্চারিত হয়ে শেষ কয়েকটি পঙক্তিতে নিবিড়সত্য হয়ে এল.....'চাই/এখন আগুন/দ্রুত এসে লুফে নিক দক্ষিণের পাথুরে প্রান্তরে/মৃত গোলাপের চারা উঠুক উঠুক/ভরে দশদিক, মুছে এ-ভাঙা দেশের/ যন্ত্রণার চিহ্নসব,/পাতায় পাতায়/দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা, জাগুক হৃদয়/ভালোবাসা/তৃতীয় নয়ন' এই প্রেম দগ্ধকাম বলেই 'তৃতীয় নয়ন' শব্দের তাৎপর্য।

সময়টা ১৯৭০। কবি বিষ্ণু দে লিখছেন এমন সব উজ্জীবিত পঙক্তি : (ক) পরদেশি পরবাসী কত ছিল লেনিন তোমার দেশে? (খ) লেনিনের মনীষার হস্তাক্ষর বিশ্বব্যাপ্ত আজ ইতিহাসে, (গ) 'শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে শতায়ু লেনিন!' তখন যে-কোনো তরুণ কবির পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল লেনিনকে নিয়ে বড় বা ছোটমাপের একটি কবিতা না-লেখা। কিন্তু

অনূর্ধ্ব তিরিশ গণেশ বসু তাঁর স্বদেশকে স্মরণে রেখে লিখে রেখেছেন দীর্ঘ এক কবিতা : 'অধিকার রক্তের কবিতার' (১৯৭০)। উদ্ধার যোগ্য অনেক পঙক্তি আছে এই কবিতায়। 'ফর্ম'ও বড়ো বিচিত্র। দুঃসাহসী না হলে কোনো তরুণই ভাবতে পারতেন না সেদিনকার বাংলাদেশে যে, এমন কবিতা লেখা সম্ভব; যার পঙক্তিবিন্যাস কবিতার সব সংস্কারকে দলে দিয়েছে। এমন কি কবিতার দুই পঙক্তির ব্যবধানের মধ্যে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে গদ্য—নিরেট গদ্যভাষণ। যেন এক সরোদ বাদক তাঁর বা বাদ্যযন্ত্রে কোনো রাগের বিস্তার ঘটাচ্ছেন শব্দধ্বনির মধ্যে ওঠা-নামা-আপাতছেদের মায়াজাল বিস্তার করতে করতে। দীর্ঘ কবিতা প্রায়শঃ ঘটিয়ে দেয় অভিনিবেশে ছেদ। অবান্তর কথা আসে না এমন নয়। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' নয়, এলিয়টের 'The waste Land'. মূল কবিতার অনেকটাই ছাঁটাই করে দিয়েছিলেন এজরা পাউণ্ড। একের কবিতায় অপরের অস্ত্রোপচারের এহেন দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু আমাদের এক তরুণ কবি বড়ো দুঃসাহসে ভর করে সেদিনের উপছে পড়া বর্ষার ভরাগাঙে নাও ভাসালেন এবং উঠলেনও অন্য তীরে। এদেশে যখন কলে কারখানায় লে-অফত্রিশূল, ছাঁটাই খড়্গ, শো-কজ মরণ চূড়া, গ্রামে গঞ্জে জমিদারের বর্শা গাঁথে স্বর্ণবোনা পেশল পুরুষ, ভেড়ির মালিক পিটিয়ে মারে মৎস্যগন্ধা হাজার বুক, তখনই বুকে সাহস জুগিয়েছিলেন সেই পুরুষ, নাম যাঁর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তখন রঙের বদল ঘটেছে। দুঃশাসন কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে দু- বারের যুক্তফ্রন্ট। ভুল হোক শুদ্ধ হোক গ্রামে গঞ্জে উগ্র বামপন্থীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে মার্কস-লেনিন-মাও-এর নাম। বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু শব্দ উত্তরের হাওয়ায় রাশি রাশি ফেটে যাওয়া শিমূল তুলোর মত শ্রেণীশত্রু, খতম, শোধনবাদ, নয়া-শোধনবাদ...এবং এইরকম আরও। রবীন্দ্রোত্তর কবির মনে পড়ে তখন রক্তকরবীর রঞ্জনকে! কবি দেখেন 'রোয়াধানমুখ প্রতিশোধে উত্তাল এক 'ছিন্নমস্তা দিন'। দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তবক অজস্র পঙক্তির ভিতর থেকে মাথা উঁচিয়ে উঠে আসে, যেন কালভৈরবের হাতের শানানো ত্রিশূল :

(১) আমরা বানাই পার্টি, লড়াই, স্বপ্ন উত্তরণ।
অশ্রুতে তাই ক্রোধের মশাল ডানা মেলে স্পর্ধিত
মানুষে মানুষ সংগ্রামে বাঁধা, সংগ্রামই এ-জীবন
কৃষ্ণচূড়ার রক্তে তুফান শ্রমজীবী গর্বিত।

(২) মিছিলে মিছিলে আলোড়ন অবিরাম
রক্তে লেনিন আনে স্বপ্নের দিন
বোধের গভীরে অনন্ত ক্রেমলিন।

যৌবনলাল, হৃদয়ে একটি নাম
লেনিন, লেনিন, শাশ্বত সংগ্রাম।

শিল্পী তো স্বাধীন। কোনো সীমান্ত প্রহরীর উদ্যত সঙিন তাঁর সীমানাভাঙা কলমের ওপর নিষেধের আঘাত হানতে পারে না। ইংরেজির ১৯৭১—উত্তাল এপার বাঙলা, ওপার বাঙলা। এখানে তখন অতিবামপন্থী বিচ্যুতি, অথবা বামপন্থীর ছদ্মবেশে কংগ্রেসের গুপ্তচর খুনের তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে। ওখানে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে ভাষাগত Identity-কে সম্বল করে বাঙলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মুক্ত হতে চলেছে। এই উত্তাল মুহূর্তে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে, এপারে কায়েম হয়েছে 'সবুজ সন্ত্রাস', ওপারে রাষ্ট্রনায়ক খুন হয়েছেন আন্তর্জাতিক চক্রান্তে। সেই দুঃসময়ে গণেশ বসুর 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' কাব্যের প্রকাশ (১৯৭১)। এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ একটি মুখবন্ধও আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। কাব্যগ্রন্থের প্রবেশমুখে নন্দীর এই তর্জনীসংকেত ভালোলাগে না অনেকেরই। কিন্তু গণেশ বসু-র এই লেখাটি মূলতঃ কালজ্ঞাপক। তাই এর একটা প্রয়োজন আছে। বোঝাই যাচ্ছে, কবি এখন অত্যন্ত সহৃদয় এবং সামাজিক ! উত্তাল দেশে সহমর্মী হওয়া ছাড়া কবিতার গত্যন্তর নেই। কবিতালোচনার আগে এঁর কাছ থেকে থেকে ওঁর বক্তব্য শোনা যাক :

"জানি, সকলেই জানি, সইতে হয়েছিল ঝড়-ঝাপ্টা। পেরোতে হয়েছিল চড়াই-উৎরাই। শেষে বন্দী হয়েছিল প্রকৃতি। মানুষের নিয়ন্ত্রণ-কাঙ্ক্ষিত সুন্দরী বধূটি। আর মানুষ? তার রাজ্যে ঘটল কী? কোন চেহারায় ধরা দিল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের আবির্ভাবে মানুষের শ্রম? স্বাধীন-স্বাদের উপকরণ? দেখলাম, সে স্বাধীন নয়। দেখলাম, সকলেরই স্বাধীনতা নেই। শ্রমের স্বপ্নের। সে-ও বন্দী। অবহেলার শিকার। সমাজে অন্ত্যজ। অথচ এই মানুষের ভিতরেই ছিল আগুন। শিল্পপ্রাণতা। আছে আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি। শ্রম ও পরস্পরের মধ্যে দান-প্রতিদানের মানবিকতায় গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি। শোষণহীন মুক্ত পৃথিবীর সম্ভাবনা। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির আদল। এ দৃষ্টি নিয়েই আধুনিকতা। সাচ্চা আধুনিকতার স্বাদ।"

এই সমকাল-চেতনা কবিতার আধারে ধরতে গিয়ে কবি স্মরণ করেছেন, প্রমেথিউসকে, ক্ষুধিত পাষাণকে, রক্তকরবীর রঞ্জনকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসকে, ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের এবং তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের। এসবই এসেছে অনুষঙ্গ ক্রমে। কিন্তু রক্তের গভীরে শৈশবের স্মৃতি ঢেউ তোলে। ফেলে আসা শৈশবের মাতৃভূমির প্রতি মমতা সাম্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবক কবির বুকে ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার ঘটায়। 'কমরেড' কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হয়ে ওঠে দায়িত্ববদ্ধ শিল্পীর সত্তার গভীর থেকে উচ্চারিত দায়বোধ:

কমরেড
মাঝে মাঝে এরকম প্রয়োজন হয়
প্রয়োজন আবরণ আভরণ খুলে ফেলা,
ঝেড়ে ফেলা অভিশাপ কাঁধের উপর চেপে-থাকা
বিধ্বস্ত দুর্গের স্মৃতি, গুলি-খাওয়া বাঘের দাপানি
ঝুঁটি নাড়ে রক্তের গভীরে
ফুল ফোটানোর ধ্যানে রঞ্জনের স্বপ্নের চেতনায়।

'উৎসব' কবিতায় 'দুর্বাশা সময়ের কাছে নেই নিস্তার', 'বন্দীর জ্বালায় ফেঁসে হ্যানয় সময়'— এমন দুটি পঙ্‌ক্তি যেখানে সময়ের কাছে লগ্ন থাকে পৌরাণিক চরিত্র অথবা ভূগোলের এক স্থানাঙ্ক। সময়ের discourse লিখে গিয়েছিলেন বটে জীবনানন্দ। উত্তরসূরী সাহসী হয়ে ওঠেন নতুন মানসাঙ্ক কষতে। সেই সাহসিক অঙ্ক কষার মুহূর্তে কবি, 'ইস্পাতের বিক্ষুব্ধ ক্যাডার'-এর যাতনার, অংশীদার হয়ে ওঠেন। হয়ত বুঝি ছেদচিহ্ন আঁকা হয়ে গিয়েছে 'ক্যাডার'-ও নেতাদের মধ্যে। সত্তরের দুরন্ত মুহূর্তে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীদের দুঃসহ কষ্টের শরিক হিসেবে গণেশ বসুর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ উচ্চারণ করে :

পড়ন্ত বেলায় আহা শতরঞ্জ খেলার বিলাস
গোপনে গোপনে নেতাদের।

এই সময় কবির মনে পড়ে যায় রামায়ণের সেই পাখিটিকে! সীতাকে বাঁচাতে গিয়ে অসম যুদ্ধে যে নিহত হল—সেই বৃদ্ধ জটায়ুকে। এবং কবি আগেও যাঁকে স্মরণ করেছিলেন নিজের সপ্তরথীবেষ্টিত ব্যূহবদ্ধ জীবনের কষ্ট বোঝাতে সেই অভিমন্যুও আসে তাঁর স্মরণ পথে। যেহেতু এসব এসেছে archetypal imagery হিসেবে তাই এসবের জাতিগত সংস্কারও একটা থেকে যায় শব্দসত্তার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও—'হাঁকে মাস্তুল দাপায় কঁপায় ঝোড়ো হাওয়া/অভিমন্যুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রক্তদোলে/ক্ষ্যাপা যৌবন শোষণচূর্ণবর্শা তোলে/পরস্পরকে উত্তাপ দিয়ে সামনে চাওয়া/এঝোড়ো সময় ভাটিতে বাদায় নওজোয়ান/দাপায় কঁপায় জানকী হাওয়া/কে ছেঁড়ে জটায়ু তোমার ডানা'। 'দুর্বাশা সময়', 'জানকী হাওয়া'—এই ধরনের রূপকল্পে কবির অধিকার একান্ত নিজস্ব। সুতরাং প্রশ্ন নিরর্থক এদের সার্থকতা নিয়ে। 'তুমি' কবিতায় 'হতভাগ্য অধ্যাপক' যখন পরিচিত হন কৃমি ভাষ্যকার রূপে তখনও জীবনানন্দের ছায়া কাব্যভাষায় স্বীকৃত হয়। ছবি এবং পৌরাণিক রূপকল্প ব্যবহারে গণেশ বসুর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় একেবারে গোড়া থেকে। তিরিশ বছরের যুবক-কবি আবেগে লেখেন 'প্রমেথিউস স্বর' এবং 'ধলেশ্বরী ইচ্ছারা'। 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' কবিতায় আবেগমথিত

স্মৃতিচারণ অন্যমাত্রা পেল সমকালের ভাষা-শহিদদের স্মরণ করায়। কবিতায় নিয়মিত পঙক্তিবিন্যাসের প্রথাকেও ভেঙে আগের মতই এবারও কবি কবিতার সঙ্গে গদ্যকবিতা মিলিয়ে এক নতুন শৈলীর পরীক্ষা চালালেনঃ— 'রাস্তাগুলো বিদ্রোহ, বিপ্লব। মাঠে মাঠে রৌদ্রবীজ। ঝিকিয়ে উঠল ভাষা। বাহান্নর স্মৃতি। অমর একুশ। ফেব্রুয়ারি শহীদের।/তলোয়ারের ডগায় ডগায় ঘৃণা। পুবালি বাতাস স্বাধিকারে।/ চৈত্রের পলাশে স্বাধীনতা। দামাল উল্লাস। জন্মভূমি মা আমার বিদ্রোহিনী। মাগো।"— আবার তিনি ফিরে এসেছেন পঙক্তি বিন্যাসে। যেখানে স্মরণ করছেন সালাম-বরকত-রফিককে। ইতিহাসের মানুষেরা একাত্তরের কবির কাছে বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে পেয়ে গেল শাশ্বতের সম্মান।

১৯৮২-তে প্রকাশিত হল 'বাঘার থাবার নিচে'। মাঝখানে এগারো বছর কবি অবশ্যই নীরব ছিলেন না। কিন্তু একদশক বয়স বেড়ে গেছে কবির শরীরের। চিন্তার পরিণতি স্বাভাবিক। ছড়ার ছন্দব্যবহারের দিকে ঝোঁক এসেছে এবং সেই ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে শ্লোকাত্মক বক্তব্য প্রকাশে। কিন্তু ছবি আঁকার পুরোনো নেশা ধরা পড়ছে বক্তব্য—প্রধান কবিতাগুলি। 'সুখের কৃষ্ণচূড়া', 'ফসফরাসের বকুল মালায় স্বপ্ন', 'সিংহের থাবার নিচেই আধমরা নক্ষত্র', স্বপ্নের শহর অশ্বমেধের ঘোড়া।' খানিকটা রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীতে লিখেও ফেলেন, 'বৃদ্ধার কণ্ঠে কাঁপল সূর্যাস্তের মেঘ। কণ্ঠে বাজল : ওর পূরবী, এর বিভাস-এর জলতরঙ্গ আর ওর সূর্যের মূর্ছনা।' 'চাই' কবিতায় কবির অভিযোগ আছে, কিন্তু অভিমান তারও বেশি ; তাই যে-সঞ্চয় তিনি পিছনে ফেলে যেতে চান তার স্বরূপই আলাদা— 'আমি শুধু রেখে যেতে চাই এই সময় তিমিরে/সহস্বপ্নব্রতীদের না বোঝা বুকের চাপা অভিমান ফালা ফালা মেঘের বিদ্যুতে/উপেক্ষার, সমুদ্রে ক্রুজার যেন ছোটে,/রক্তের চেয়েও নোনা স্বাদ যার সেই অশ্রু দীর্ঘশ্বাসগুলি/অশ্বারোহী শব্দের আড়ালে।' 'সময় তিমির', 'রক্তের চেয়েও নোনাস্বাদ', 'অশ্বারোহী শব্দ' ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ এক একটি শব্দচিত্র। প্রথম দুটি ছবি জীবনানন্দে মিলতেও পারে; কিন্তু অশ্বারোহী শব্দ একেবারে নতুন এক ছবি। ধাবমান শব্দরাশির লক্ষ্য অবশ্যই কোনো প্রতিপক্ষ, নইলে তার অশ্বরোহী হওয়ার কোনো গুরুত্ব থাকে না। বস্তুত চল্লিশোত্তীর্ণ কবির প্রতিবাদের ভাষায় চোখের জলের নোনা স্বাদ ব্যঞ্জনাঋদ্ধ হয়ে লগ্ন থাকতেই পারে। প্রথম যৌবনের আবেগ চল্লিশের প্রায় উত্তীর্ণ যৌবনে সেভাবে থাকে না। আমার জগতের সঙ্গে ওদের জগতের দুস্তর ব্যবধান। এই ওরা কারা? শ্রেণী পরিচয়ে এরা অবশ্যই স্বতন্ত্র কারণ এদের অভিমান করার সময় ও সুযোগ আছে। কিন্তু বিপরীতে যিনি অভিমান নয় কান্নাই তাঁর সমগ্র সত্তার ওপর ও ভিতর আচ্ছাদন করে রেখেছে : 'ওদের আকাশে ভালোবাসা শুধু ভালোবাসা অভিমান/চেতনায় কাঁদি, ঘুরে ফিরে কাঁদি,

কান্নায় নীরবতা'। যে কবি নেতাদের চতুরতা, ক্যাডারদের যন্ত্রণা দেখেন এবং এক সময় বলেনও 'সারা দেশটাই যেন চামড়া-জড়ানো হাড়ের অঙ্গার' সেই কবি বলতেই পারেন চেতনায় কাঁদি, ঘুরে ফিরে কাঁদি! স্বদেশপ্রীতি— সেই স্বদেশ বাঙলাদেশ বা ভারতবর্ষ যাই হোক—গণেশ বসুর মার্কসবাদী চৈতন্যকে শাণিত করেছে। তাঁর ক্ষোভ, তার যন্ত্রণার উৎস কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের উৎকট আচরণ। রাজনীতির জগতে থেকে আদর্শচ্যুতদের সহ্য করতে পারেননি তিনি, নইলে কেন লিখলেন 'ভাড়াটে সৈনিক সব এ-দেশের নেতাগুলো, বেশ্যার অধম' 'একদা হো চি মিন' কবিতাতেও সেই ধিক্কার : শুয়োরও দামী হয় লোকের চেয়েও দামী যদি না মানুষের থাকে/সোনালি স্বাধীনতা, শুয়োরও হাসে খেলে, মানুষ পায়ে পায়ে বন্দী'।

১৯৯৯। গণেশ বসুর অত্যন্ত পরিণত মানসিকতার ছাপ নিয়ে জন্ম নিল 'নীরব সন্ত্রাস'[৯]। এই কাব্যের সর্বশেষ কবিতা 'খরা' যেন ব্যক্তি-কবির স্মৃতিভারাতুর। এই দীর্ঘ রচনা আত্মজৈবনিক বলে এর মধ্যে ধারাবাহিক একটা ইতিহাস চোখে পড়ে। দেশজোড়া খরা'র প্রকোপ। যদিও কবিতাটার নাম 'খরা' নয়, 'এলোমেলো সেখানেও কাল্পনিক চরিত্রের সংলাপে কিন্তু খরার ছবি, ধ্বস্ত মূল্যবোধের জন্য কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি জানেন 'ক্ষমতাই এখন আফিম ক্ষমতাই বন্দুকের নল/ক্ষমতাই ছেঁড়া বাশি রুটি/ক্ষমতাই দুচোখের জল'। কবির চারপাশের মানুষ বা বন্ধুজনদের স্মৃতি এসেছে নানাভাবে। 'অশ্বমেঘের ঘোড়া' দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত রচনা। কবিতার নাম ঐ কাহিনীর নামানুসারী। 'স্মরণ' কবিতায় অধ্যক্ষ শান্তি সিংহরায়-কে স্মরণ করা হয়েছে। একটি কবিতার শিরোনাম 'শম্ভুমিত্র'। 'একদিন ছিল' কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছে অগ্রজ আর এক বিবেকবান শব্দশর ক্ষেপণে অব্যর্থ কবি অমিতাভ দাশগুপ্তকে। 'নষ্টনীড়' কবিতায় আছেন রবীন্দ্রনাথ আবার রবীন্দ্রনাথ' আছেন স্বনামে কবিতার শিরোনাম হয়ে। রবীন্দ্রানুজ সব কবিই যাঁরা অন্ততঃ লিখেছেন অনেক, তাঁরা এক বা একাধিক কবিতায় নিজেকে নিবেদন করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। এটুকু না করলে উত্তরপুরুষ বুঝি অধমর্ণই থেকে যায়; কারণ কবিতার ভাষার ও ভাবের যা কিছু অনুশীলন এখনও অব্যাহত তাঁর কেন্দ্রবাসী সত্তা তো তিনিই। গণেশ বসুর লেখা বারো পঙক্তির কবিতাটি (রবীন্দ্রনাথ) পুরোটাই স্মরণীয়। কিন্তু শেষ স্তবক অবিস্মরণীয় 'তিনি জীবনের সংগীত/তিনি সত্তার নির্ভর/তিনি মুক্তির পথনির্দেশ/তিনি চলমান সুন্দর।' সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কালে সুখ ও অসুখের সংজ্ঞার্থই বদলে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। শঙ্খ ঘোষ লেখেন 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', জয় গোস্বামী লেখেন 'বজ্র বিদ্যুৎ ভর্তি খাতা', গণেশ বসুর 'নীরব সন্ত্রাস'-এও ছড়িয়ে আছে সুখাভিলাষীর

মূলবোধহীনতার কারুণ্য। 'গ্রিন কার্ড', 'রিমোট কন্টোল', 'কনকর্ড', 'স্পীডমানি' এসবই একালের উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রদত্ত সুখের অভিধানে পাওয়া শব্দ। নগর কলকাতার চারপাশে প্রোমোটার-দৌরাত্মে বেনিয়ম বাড়ি ওঠে দিনের আলোয়। তাই বিরক্ত কবি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন 'আমার বাড়ির পাশে খেলা করে 'অরণ্যের লেটেস্ট গরিলা'। বর্তমান পাঠকের বিচারে গণেশ বসু সাম্প্রতিকতম হয়ে উঠেছেন তাঁর 'বলবে তারা বলবে' কবিতায়। এই কবিতা সরবপাঠ প্রত্যাশা করে, এই কবিতা 'চক্ষুরুন্মীলিত' করে দেওয়ার মত গুরুগিরি করতে পারে। গুরু-কৃত্য করা কবিতার দায় বা দায়িত্ব নয়। তবু বিশ্বায়নের বাজারে এই কবিতার বেস্টনীটা বেশ দীর্ঘ। 'নীরব সন্ত্রাস আজো বর্ণময় খরার দাপটে'-এর চেয়ে সত্যভাষণ-আর কী হতে পারে?

গণেশ বসু লিখতে শুরু করেছিলেন ষাটের গোড়া থেকে। কাব্য সাধনা তাঁর চল্লিশ বছরের। অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যাও নগণ্য নয়। ষাটের কালের রোমান্টিক বাসনা নিয়ে শুরু করে সত্তরের কালের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিপর্যস্ত মূল্যবোধকে আঘাত হেনে পথ-চলা কবি নতুন শতকের গোড়ায় এসে লক্ষ্য করছেন নীতিভ্রষ্ট রাজনীতি, বর্ণময় খরা এবং নীরব সন্ত্রাস। আসলে আমরা এখন আর কেউই ভালো নেই। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যেকার ফারাক এতই অকল্পনীয় বিশাল যে, কখনো অন্যতর বেদনা, কখনো স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ সংবেদনশীল কবি-মনকে, আমাদের থেকেও কবি মনকে বেশী করে আক্রমণ করছে। কবিদের ভরসা চিরকালই আগামীদিন। বর্তমানের প্রহার অতীতের রম্যস্মৃতি নিয়ে কবিমাত্রই আগামী সুন্দরের প্রত্যাশী। গণেশ বসুর প্রবীণতার কাছে পাঠকের প্রত্যাশা হতাশা-দীর্ণ হৃদয় নয়, একাল ও সেকালের মধ্যে সেতুবন্ধনের উপযোগী উপাদান; যা বাঁচাবে এবং বাঁচবেও।

উৎস : এবং মুষায়েরা

কবি গণেশ বসুর কবিতা-শিল্প

সুমিতা চক্রবর্তী

কবিতাকে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে তা নিয়ে একাধিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে বিগত শতাধিক বছর ধরে। কেউ বলেছেন কবিতা বোঝার জন্য কবির জীবন ও জীবন-দর্শনকে জানা জরুরি। কেউ বলেন কবিতার ভাষা-নির্মিত অবয়ব ছাড়া আর সব কিছুই কবিতাকে গ্রহণ করবার জন্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা মধ্যপন্থী। কবিতার রূপাবয়ব কবিতাটিকে গ্রহণ করবার পক্ষে প্রধানতম পদ্ধতি— তাতে সন্দেহ কী? কিন্তু কবির জীবন, কবির সমকালীন পরিমণ্ডল এবং কবির নিজস্ব মনোজগতের কিছুটা জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। তাতে অনুভবের পরিসর একটু বাড়ে। এই ভূমিকাসহ গণেশ বসুর কবিতার জগতে প্রবেশ করতে চাই। প্রসঙ্গত এই নিবন্ধের পাঠকদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, সংক্ষিপ্ত ভূমিকার শেষে তাঁর কবিতাকে এখানে বুঝতে চেয়েছি কবির করণ-কৌশলের পথ ধরে। শব্দ নির্মিত কবিতা-মূর্তি থেকেই কবিতাকে প্রধানত গ্রহণ করতে হবে। এই তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই এবং এ-ও বিশ্বাস করি যে, কবিতার বহিরঙ্গ কবির অন্তরঙ্গ অনুভবেরই কায়াদর্পণ।

গণেশ বসুর জন্ম ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। দেশ বিভাগের সময় উদ্বাস্তু হয়ে সপরিবার কলকাতা। বসবাস প্রথমে পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্প-এ, অল্প সময়ের জন্য আত্মীয় গৃহে, আইসক্রিম কারখানার দোকান ঘরে, কখনও কোনো বাড়ির বারান্দায়। ক্রমে একটি আশ্রয় জোটে। মা প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করেন, সঙ্গে সেলাই করেন।

গণেশ বসু ও তাঁর ভাইরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেন। সঙ্গে চানাচুর বিক্রি করা, ঠোঙা তৈরি করা এবং টিউশন করা চলতে থাকে। স্কুলের ছাত্র থাকার সময়েই বামপন্থী মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। সেই সময়ে, পাঁচ-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি শরণার্থীদের পাশে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের পাশে আন্দোলন করতে সচেষ্ট ছিল। গণেশ বসু অল্প বয়সেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশের হাতে মার খেতে হয় ১৯৫৯-এ।

অভাবের মধ্যেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে মতান্তর শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেল ১৯৬৪-তে। তখন তিনি সি.পি.আই গোষ্ঠীর সঙ্গে থেকে গেলেন। কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বিভিন্ন রকমের কাজ দিয়ে। কিছুকাল করেছিলেন সাংবাদিকতা। তারপর অধ্যাপনা করেছেন অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত।

গণেশ বসু তাঁর পঠনপাঠন, অধ্যয়ন, বৈদগ্ধ্যের চর্চা এবং দলীয় মতাদর্শের ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে গিয়েছিলেন জার্মানিতে। জার্মান ভাষাও কিছুটা তাঁর আয়ত্তে আছে। এই সবের সঙ্গেই গণেশ বসু একজন কবি। সারাজীবন ধরেই কবিতা লিখেছেন। কবিতায় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন নিজের মনের সবটুকু পরিচয়। তাঁর প্রেম ও নৈঃসঙ্গ, আশা ও নৈরাশ্য, বিশ্বাস ও বিভ্রান্তি, ঘৃণা আর ক্রোধ— সব কিছুরই অকপট আধার তাঁর কবিতা।

এই নিবন্ধে আমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করব তাঁর কবিতার প্রকরণ। তার আগে দেখে নেব তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক প্রকাশকাল—

১. বনানীকে কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৪), ২. নিজের মুখোমুখি (১৯৬৭), ৩. রক্তের ভিতরে রৌদ্র (১৯৬৯), ৪. লেনিন: অধিকার রক্তের কবিতার (১৯৭০), ৫. অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ (১৯৭১), ৬. বাঘের থাবার নিচে (১৯৮২), ৭. নীরব সন্ত্রাস (১৯৯৯), ৮. অন্ন অশ্রু ভায়োলিন (২০০৫), ৯. ভাসানদরিয়া (২০০৮), ১০. ভাঙা বৈঠার গান (২০১১), ১১. বর্ণময় পৃথিবী (২০১৩) এবং ১২. বলগা হরিণের শিং (২০১৫)।

কবিতা ভাষা-শিল্প। শব্দের বিন্যাসে ভাষার নির্মাণ। অর্থ-বিশিষ্ট ধ্বনি সমন্বয় হল শব্দ। শব্দের শক্তি কতটা তা মানব সভ্যতা মর্মে মর্মে জানে। প্রাচীন কালেই ঋষিবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল— 'শব্দই ব্রহ্ম'। যাঁরা শব্দশিল্পী তাঁরা অনেকেই কোনো-না কোনো সময়ে শব্দের মহিমা নিয়ে নিজেদের মুগ্ধতা ব্যক্ত করেছেন। গণেশ বসুর কাছে শব্দ কোন্ ব্যঞ্জনায় এবং কোন্ জীবনদর্শনে ধরা দেয় তার কিছু পরিচয় প্রথমে গ্রহণ করব। যে গ্রন্থটি আমাদের এই আলোচনার অবলম্বন তা হল 'গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ'। কবির এযাবৎ প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলির একত্র সংগ্রহটি সম্পাদনা করেছেন জয়গোপাল মণ্ডল। সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন কবি স্বয়ং। ভূমিকা-লিখনের তারিখ মাঘ, ১৪২৬ অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০২০। ধরে নিতে পারি শব্দ সম্পর্কে কবির সাম্প্রতিকতম নির্ভরতার ভাষা এই ভূমিকাতেই পাওয়া যায়।

তিনি লিখেছেন প্রথমে একটি সাধারণ বাক্য— 'শব্দই কবিতার কারু'। তার দুই ছত্র পরেই তিনি লিখেছেন কয়েকটি বাক্য যাকে ঠিক সাধারণ বলা যায় না।— "কেননা, বিশ্ব জুড়ে এ সময় সভ্যতার সংকট, মানবিকতার অতলস্পর্শী অধঃপতন। এখন সীমাহীন দুর্ভোগ, অনিঃশেষ অভিযোগ, নিদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্ট, অবক্ষয় ও আত্মপীড়ন, বশ্যতা ও বিক্ষোভ, গণতান্ত্রিক একনায়কতা ও জাতিবৈরিতা; ম্যাকার্থবাদের আগ্রাসন ও জিন্দোবাদের ভয়াবহতা। এমন সময়ে শব্দই কবিদের আশাভরসা, আশ্রয়স্থল। ভবিষ্যৎ বলেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেটাই।"

বর্তমান সময় খুব সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের কাল নয়। একটা যুগ ছিল যখন মানুষ কোনো কোনো স্থির বিশ্বাসে নিজেদের মনের আশ্রয় খুঁজে পেত। যেমন অতি সাধারণ এবং সম্ভবত একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাণী—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। আজকের পৃথিবী আমাদের জানিয়ে দিয়েছে—মানুষ নিজেই কোনো সত্যতায় স্থিত নয়। মানুষ জেনে গেছে লক্ষ প্রার্থনা সত্ত্বেও কোনো ঐশী শক্তি পৃথিবীতে কোনো শান্তি নিয়ে আসতে পারে না। সেজন্য কবি লেখেন 'এই বিভীষিকাই হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ?' তারপরেই লেখেন 'তাহলে কি শব্দই হতে পারে ভবিষ্যতের স্থিতি?' এভাবেই গণেশ বসুর চিন্তনে শব্দের শক্তি ঘুরে ফিরে বার বার আসে সংক্ষিপ্ত দুই পৃষ্ঠার ভূমিকাটিতে। তিনি স্বীকার করেন যে শব্দ একা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে না; সেই সঙ্গেই বলেন 'আধিপত্যবাদীদের তিমিরবিলাস বিনাশ করতে পারে না শব্দের 'নিহিত গৌরব'। তারপরে তিনি লেখেন 'শব্দই শুদ্ধতম সুষমা'। ভূমিকার শেষে কবি গণেশ বসু শব্দশক্তির উপর নির্ভর করেই নিজের চলার পথ স্থির করে নেন— 'তাঁর কাছে শব্দই কারু, ভাষাই জাদু, বিরল বিবেক।'

গণেশ বসুর কবিতার শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করলে বলতেই হবে যে, তাঁর শব্দের পৃথিবী বাস্তব পৃথিবীর মতোই সর্বগ্রাসী। এমন শব্দ নেই যা তিনি কবিতায় ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন। তৎসম শব্দ কেবল আছে তাই নয়, তাঁর প্রথম কবিতা- গ্রন্থে রাবীন্দ্রিক ধরণের প্রচলিত তৎসম শব্দ-নিয়ন্ন সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন প্রচুর। যেমন অশ্রুময়, বেদনাতুর, স্বপ্নশিয়র, পত্রপুট, বেপথুহৃদয়। মাঝে মাঝে তৎসম শব্দযোগে চমৎকার বিশেষণ তৈরি করে নেন অনায়াসে— "বড়ো ভালোবাসি আমি ভাস্করিত গোলাপের উজ্জ্বল শোণিমা।" 'ভাস্করিত গোলাপ' শব্দবন্ধে পুষ্প সৌন্দর্যের কোমলতার সঙ্গে ভাস্করের মূর্তি নির্মাণের সাবয়বতা যেন প্রত্যক্ষ ফুটে ওঠে।

প্রথম কবিতা সংকলন 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'তেই ঐতিহ্যবাহী তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি। অনেকটাই পরম্পরাসিদ্ধ সেই সব শব্দের বিন্যাস। কিন্তু তারই

মধ্যে তরুণ কবি লিখতে পারেন অদ্ভুত দু-তিনটি পঙ্‌ক্তি যা রোমান্টিক প্রেম-কবিতার অভ্যাসসিদ্ধ অভিব্যক্তিকে যথেষ্ট বিচলিত করে।

এখন অঘ্রান এলে ভীত হই, বাঁচিতে চাহি না
দিকশূন্যপুরে এই যদি নাচে শূকরী সুন্দরী
রুনুঝুনু রুনুঝুনু পৃথিবী।

এখান থেকে বোঝা যায়, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সংস্কারই কবির মনে কোনো সময়েই ছিল না।

গণেশ বসুর কবিতায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি কথা এখানে বলতেই হবে, এই মুহূর্তে বিশ্বের সব ভাষাতেই ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ অবিরল। সেগুলিকে আর অনুপ্রবেশ বলা যায় না। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই যে বিশ্বায়িত পৃথিবীতে আমাদের বসবাস সেখানে যন্ত্র, প্রযুক্তি এবং নব্য আবিস্কৃত উপকরণসমূহ প্রায় সবই উদ্ভূত হয়েছে ইংরেজিভাষী বিশ্বে। সেই সব উপাদান এবং পরিস্থিতি ছাড়া বিশ শতকের পৃথিবী সচল থাকে না। কাজেই সেই সব তথাকথিত বিদেশি শব্দ আর বিদেশি নেই। সেগুলি বিশ্ব-ভাষার অঙ্গ। কোনো কোনো শব্দ সাধারণ বাংলা শব্দের মতোই বাংলা কবিতায় প্রযুক্ত হতে পারে। সেগুলির সঙ্গে কোনো অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা এখন জড়িত থাকে না। যেমন গণেশ বসু ব্যবহার করেছেন ট্রাক্টর, প্রপেলার, লিফ্‌ট্, কারফিউ, কর্পোরেশন, স্কোয়াড্রন ইত্যাদি। তেমনই 'মাসমিডিয়া', 'রিমোট কন্ট্রোল' ইত্যাদি শব্দযুগ্মও বাংলা শব্দভান্ডারেরই অন্তর্গত। কিন্তু তার মধ্যেই কোনো কোনো ইংরেজি শব্দবন্ধ একটু নতুন ভাব-বলয় নিয়ে আসে।

তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নাতিদীর্ঘ কবিতা। চারটি চতুষ্পদীতে ষোলো পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ। কবিতার সুরে কিছুটা নৈরাশ্য। কবি যেন জীবন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে চান। প্রথম স্তবকের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি হল।

বইয়ের র‍্যাকে লাশের ছায়া স্বপ্নভুক রাত
রইল পড়ে ভগ্ন সিঁড়ি লিট্‌ল ম্যাগাজিন।

আবার কবিতার শেষ স্তবকের শেষ দুই পঙক্তিতে কবি লেখেন।—

মঞ্চজোড়া ডাইনোসরে ঝাঁপায় খোঁড়া রাত
যাই চলে যাই, ভগ্ন সিঁড়ি, লিট্‌ল ম্যাগাজিন।
('যাই চলে যাই', অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

কবি ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন তাঁর প্রিয় জীবন। সেই জীবন তখন আর তাঁর সুন্দর মনে হচ্ছে না। লাশের ছায়া, ইঁদুর, আরশোলা, রক্ত ঝরা চিতা— এ সবই জীবনের অপ্রিয় অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই সঙ্গে কবি দু-বার উচ্চারণ করেছেন 'লিট্‌ল

ম্যাগাজিন' শব্দদুটি। একজন কবির কাছে লিট্‌ল ম্যাগাজিন যে-কোনো একটি বস্তু নয়। লিট্‌ল ম্যাগাজিন তাঁর অনুভবের বাণীশিল্পকে ধারণ করে। একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন ঘিরে একজন কবির হৃদয় অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়। একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন একজন কবির জীবনের অংশ, অস্তিত্বের টুকরো। তাঁকে চলে যেতে হবে তাঁর সেই জীবনের প্রিয় নির্যাস ত্যাগ করে। ডাইনোসরের ভয়ের চেয়েও এই দুঃখই কবির চিত্তে কষ্টের কাঁটা বিঁধিয়ে রাখে। 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' এই শব্দদুটির সম্মিলনে বাঙালি কবির চিত্তে যে ঐতিহ্যের পরম্পরা, যে অনুরাগের সিঞ্চন তা অন্য কোনো শব্দেই ধরা যায় না। আর একটি দৃষ্টান্ত কবির রাজনৈতিক চিন্তনের সবিদ্রুপ হতাশাকে প্রকাশ করে। কবিতার নাম 'ম্যাজিক নাম্বার'। এই দুটি শব্দে স্বার্থশ্লিষ্ট, অসৎ রাজনীতির পুরো ছবিটাই ফুটে ওঠে। ভারতের মতো দেশে গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনেক সময়ই পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়। শাসনতন্ত্র হাতে রাখবার জন্য ন্যূনতম যে নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা প্রয়োজন তা জোগাড় করবার জন্য নির্বাচনের পরে চলতে থাকে টাকার লেনদেন। রাজনীতির ভাষায় 'ঘোড়া কেনাবেচা'। তখন আদর্শের কথা, দেশের কথা, দলীয় আনুগত্যের কথা কেউই ভাবে না। যেভাবেই হোক 'ম্যাজিক নাম্বার' জোগাড় করতে হবে। কবি ব্যঙ্গের স্বরে উচ্চারণ করেন—

''মনে রেখো, আমাদের কেনা ঘোড়া গণতন্ত্রী নিদেনপক্ষেই।''

এই কবিতার সমগ্র পরিমণ্ডলের রাজনৈতিক প্রহসন তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশের পরিস্থিতিতে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য এই 'ম্যাজিক নাম্বার'— ইংরেজি শব্দদুটি বিকল্পহীন।

সম্পূর্ণ অন্যধরনের একটি কবিতা একটি ইংরেজি শব্দে রূপায়িত হয়েছে। নাম 'ওয়াক্সবাথ'। এই কবিতাটিতে কোনো রাজনীতি, সমাজ-চিন্তন, প্রেম-বিরহের অনুভূতি কিছুই নেই। বলা যেতে পারে এটি একটি সম্পূর্ণ শারীরিক কবিতা। পরিণত বয়স, হাঁটু ফুলে আছে, ছুঁলেই যন্ত্রণা; তখন সেই যন্ত্রণা উপশমের চিকিৎসার একটি পদ্ধতি 'ওয়াক্সবাথ', গলানো মোমের উষ্ণ স্পর্শে অদ্ভুত আরাম। এটুকুই কবিতা। কিন্তু কবিতাটিতে অদ্ভুত এক নতুন স্বাদ আছে। কবিতা নিশ্চয়ই মনের ব্যাপার। কিন্তু কবির একটা স্বাভাবিক শরীরও আছে। সেই শরীরের যন্ত্রণা মনের সংযোগ থেকে সবসময়ে বিচ্ছিন্ন নয়। তৃষ্ণার্তের কাছে এক গ্লাস জল, শীতের সন্ধ্যায় এক পেয়ালা গরম কফি যে শারীরিক তৃপ্তি এনে দেয় তা কেবল শরীরের নয়, মনেরও। 'ওয়াক্সবাথ' কবিতাটি পড়লে পাঠকের অনুভবে শরীরের বেদনা উপশমের আরাম ছড়িয়ে যায়। এভাবে পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করা সহজ নয়। একবোরেই গতানুগতিক নয় এই কবিতা। 'ওয়াক্সবাথ' শব্দে কবিতাটির নির্যাস ধরা আছে যা কোনো বাংলা শব্দে পাওয়া অসম্ভব।

গণেশ বসুর কবিতার শব্দপ্রয়োগের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য চলে আসা যাক। এক কথায় তাঁকে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর বিশ্বে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার ধারার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম এবং সজাগ এক কবি। পারিপার্শ্বিক ভুলে থাকা আত্মমগ্নতা তাঁর মনের চরিত্র নয়। সচেতন পর্যবেক্ষণে তিনি বিশ্ব-সভ্যতাকে অনুভব করতে চান এবং সেই অনুভবকে জাগ্রত বিশ্লেষণী মননের মধ্যে দিয়ে কবিতায় রূপায়িত করতে চান। যদি এই নিবন্ধের পাঠকেরা একট স্ববিরোধী শব্দবন্ধকে অসম্ভব বলে মনে না করেন তাহলে বলব কবি গণেশ বসুর সচেতনতাই তাঁর আত্মমগ্নতা।

তাঁর কবিতায় তিনি বহু ব্যক্তিনাম ব্যবহার করেন। সেই ব্যক্তিনামগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ শতকের আন্তর্জাতিক বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতি-প্রকৃতির নিবিড়তা, কাজেই পাঠককেও জেনে নিতে হয় সেই বিশ্ব-পরিমণ্ডলের ইতিহাস, রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সংঘাতের বিভিন্ন পর্যায়। আমরা কেবল কয়েকটি নাম উল্লেখ করছি। আধুনিক বিশ্বের সচেতন মননশীল বিশ্ব-নাগরিকের কাছে নামগুলি অচেনা নয়। নামগুলির সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহও তাঁরা পরিজ্ঞাত। কাজেই কবিকে কিছু ব্যাখ্যা করে দিতে হয়নি। নামের উল্লেখের সঙ্গে কবি ও পাঠকের মনের সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে আরও একটি কথা স্পষ্ট হয় কবি গণেশ বসু তাঁর সমমনস্ক পাঠকের জন্যই কবিতা লেখেন। কয়েকটি ব্যক্তিনামের উল্লেখ করছি— চে গেভারা, লেনিন, কাস্ত্রো, হো চি মিন, মায়াকোভ্‌স্কি, রোজা লুক্সেমবুর্গ, মুসোলিনি। এই নামগুলি থেকেই কবির রাজনৈতিক মতাদর্শের অভিমুখ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বৃত্তের বাইরে যে সব ব্যক্তিনাম তিনি ব্যবহার করেছেন তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। একটি কবিতার নাম 'আর্কিদিমিস' (অন্ন, অশ্রু ভায়োলিন)। আর্কিমিদিস নামটি সাধারণ পাঠকের জন্য। তিনি ছিলেন প্রাচীন গ্রিস-এর এক গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানী। তাঁর কাছে আধুনিক গণিতবিদ্যা অনেকটাই ঋণী। এই কবিতায় শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করি—

'সিরাকিউজের ডানা ছিন্নভিন্ন। ক্ষমতায় সেঁকে নেয়া এক
রোমানের স্পর্ধা ফোঁসে। উদ্যত খড়্গের ছায়া কেঁপে যায়। তাকালেন তিনি।
সাবধান। রক্ত যেন মাটিতে পড়ে না।

এই তিনটি পঙ্‌ক্তির পাঠোদ্ধার করতে গেলে জানতে হবে আর্কিমিদিস-এর জীবন মৃত্যুর বৃত্তান্ত। ২৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর জন্ম। জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত এই মনীষী রাষ্ট্রনীতির খবরে আগ্রহী ছিলেন না। সিসিলি-র সিরাকিউজ নগরীতে তিনি গাণিতিক সমস্যার সমাধানে মগ্ন থাকেন। এক সময় রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের

কালে রোম সেনাপতি মার্কার ক্লডিয়াস মার্সেলাস সিরাকিউজ নগরী দুবছর অবরোধ করে রাখেন। কথিত আছে যে সেনাপতি আদেশ দিয়েছিলেন যে, আর্কিমিদিস-এর কোনো ক্ষতি যেন না করা হয়। কিন্তু এক রোমান সৈনিকের মনে হল আর্কিমিদিসের বিভিন্ন নক্শার মধ্যে লুকোনো আছে কোনো গুপ্ত চক্রান্ত। সৈনিকটা সেনাপতির কাছে যাওয়ার জন্য আর্কিমিদিস-কে আদেশ করে। কিন্তু গবেষণায় মগ্ন আর্কিমিদিস কাজ ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সেই সৈনিক তরবারির আঘাতে তাঁর শিরচ্ছেদ করে। এই ঘটনাটি পুরোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। কিন্তু ক্ষমতাবানের স্পর্ধা বিজ্ঞানীর রাষ্ট্র-উদাসীন দূরদৃষ্টিকে চিরকাল সন্দেহ করে এসেছে। ইতিহাসে আছে তার আরও সাক্ষ্য। দুই সহস্রাধিক বর্ষের ওপার থেকে ক্ষমতা-দম্ভের এই ঘটনাটি কবি গণেশ বসুকে এতটাই বিচলিত করেছিল যে, কবিতাটি তিনি না লিখে পারেননি। কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিটি প্রগাঢ় ব্যঞ্জনাময়। কবি যেন ঘাতককে বলেন— এই রক্তপাত সাবধানে লুকিয়ে রাখো। যদি তা মাটির বুকে প্রাবাহিত হয় তা হলে জন্ম নিতে পারে ঘাতক বিরোধী বিদ্রোহের বীজ।

গণেশ বসুর কবিতার বৈদগ্ধ্যের পরিমাপ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে-র কবিতা যেমন ইতিহাসের কোশ-গ্রন্থের সহায়তা ছাড়া পাঠকের পক্ষে মর্মোদ্ধার করা সহজ নয়; গণেশ বসুর কবিতাও তাই। বর্তমানে আন্তর্জাল কাজটিকে অনেকটা সহজ করেছে। ততটা সময়ও দেবেন— এমন পাঠক কতজন আছেন জানি না। কিন্তু কবি বিষ্ণু দে যেমন পাঠকের কথা ভেবে কবিতা লেখেননি; তেমনই গণেশ বসুও লেখেননি। কোনো মহৎ কবিইতো লেখেন না।

একটি দৃষ্টান্তই দেওয়া গেল। নাহলে তাঁর কবিতা-প্রকরণের অন্য দিকগুলিকে স্পর্শ করাই যাবে না।

আমরা এরপর চলে আসব তাঁর কবিতার বাক্যগঠনের বৈশিষ্ট্যে। প্রথম কবিতা সংকলন 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'। যে সময়ে এই কবিতাগুলি লেখা তখন সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার কবিতায় বিশেষ হয় না। তিরিশের কবিরা সাধু এবং চলিত দু-রকম ক্রিয়াপদই ব্যবহার করতেন। তবে চলিত ক্রিয়াপদের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। জীবনানন্দ একই কবিতায় সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ কখনও কখনও মিশিয়েছেন। চল্লিশের কবিরা এবং পঞ্চাশের কবিরা প্রধানত চলিত ভাষার ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেছেন। ব্যতিক্রম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কোনো কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তিতে সাধু ক্রিয়াপদের অনবদ্য প্রয়োগ কবিতার পাঠকেরা ভোলেননি—'হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা'। ষাটের কবিদের লেখায়

সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগ প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু গণেশ বসু তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থে বেশ সচেতনভাবেই সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কবির স্বাধীনতা পাঠকের কাছে মান্য। কিন্তু কোথাও কোথাও একই কবিতায় সাধু ও চলিতের মিশ্রণ যেন কিছু দুর্বল বলেই মনে হয়। যেমন—

"এমন করে আমায় তুমি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
ভাবিতে পারি নাই," (১০ সংখ্যক)

তবে এমন প্রয়োগ কমই। সাধারণভাবে কোনো কোনো কবিতায় সাধু ক্রিয়াপদ এবং কোনো কবিতায় চলিত ক্রিয়াপদ স্বচ্ছন্দভাবেই ব্যবহার করেছেন কবি। পরবর্তী কবিতা-গ্রন্থগুলিতে চলিত ক্রিয়াপদেরই প্রয়োগ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

গণেশ বসুর কবিতার বাক্য গঠনে যে কোনো শব্দের প্রবেশাধিকার অবাধ। কাজেই শব্দ বিন্যাসের সাহায্যে তিনি অনায়াসেই ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, ক্রোধ আবার আত্মমগ্ন ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারেন।

কিন্তু পাঠক লক্ষ করবেন, যেমন শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তেমনই বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও কবি বাংলা সাহিত্যের অতীত সম্ভার বাক্যের গঠনে এমনভাবে গেঁথে দেন— তার পূর্ণ ব্যঞ্জনা সবসময় সব পাঠকের কাছে সুপুরিস্ফুট হয় না যদি না পাঠকও পরিচিত থাকেন সেই সাহিত্য-পরম্পরার সঙ্গে।

কবিতার নাম 'মেহের আলি' (অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ) কবিতার পঙ্‌ক্তিটি হল— "আমারো যৌবনে ক্লান্ত পাগল মেহের আলি হেঁকে হেঁকে যায়।" এই পঙ্‌ক্তিটি যে কথাটি অনুক্ত আছে তা হল 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পাগল মেহের আলির জীবনদর্শনের বাণী— 'সব ঝুট হ্যায়'। কবি মেহের আলির হাঁকের কথা বলেছেন। কিন্তু মেহের আলির উচ্চারিত শব্দগুলি যে-পাঠকের স্মৃতিতে রণিত হবে না তাঁর কাছে কবিতার পাঠ থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। আর একটি কবিতার নাম 'কপিলা' (রক্তের ভিতরে রৌদ্র)। কবিতাটিতে একাকিত্বের যন্ত্রণা, অসহায় বিপন্নতার সঙ্গে প্রেমের মিশ্রণ। পরিবেশে ভয়ঙ্করত্ব কম্পমান। এবং কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি—

"হাঁ-মুখ পদ্মার বুকে রাত জাগি আমিও কপিলা।"

অথচ কবিতাটিতে কোথাও 'কপিলা' শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা হয়নি। যে পাঠক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়েননি তাঁর কাছে কবিতাটি একভাবে ধরা দেবে ঠিকই। কিন্তু 'কপিলা' শব্দটি তাঁর কাছে থেকে যাবে অর্থহীন। যে-পাঠক উপন্যাসটি পড়েছেন তিনিই কেবল অনুভব করবেন— এই দশ বারো পঙ্‌ক্তির কবিতাটি হয়ে উঠেছে ওই অসামান্য উপন্যাসটির মন্থনজাত নির্যাস।

এই ধরনের প্রয়োগ গণেশ বসুর কবিতায় এতই বেশি যে তা বহু ব্যাখ্যাতেও শেষ হবে না। রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি-ভাঙা বাক্য গঠন অনেকবারই আছে। আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি লিখেছেন—

ঘোলাটে আকাশ,
রাস্তায় দাঁড়ায় এসে আশ্চর্য মেয়েটি
পদুমার চৌষটি পাখুড়ি।

চর্যাগীতির পাঠক না হলে এই চৌষট্টি দলের পদ্ম-উপমা মেয়েটি যে আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় অনু ভাবনাকে ক্ষমতার পৃথিবীর নীচতার মাঝখানে অম্লান আলোক শিখার প্রতীক হয়ে জ্বালিয়ে রাখে তা অনুভব করতে পারবেন না অন্য কেউ।

গণেশ বসু তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তির মধ্যে ইংরেজি বাক্য, সংস্কৃত বাক্য, জার্মান ভাষার কবিতার পঙ্‌ক্তি এবং একাধিক মণীষীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। পাঠককে নিজের শ্রমেই পৌঁছতে হবে তাঁর কবিতার কাছে।

কবিতার আলোচনায় চিত্রকল্প একটি আপরিহার্য দিক। চিত্রকল্প কাকে বলে ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। কেবল উদ্ধৃত করব সিসিল ডে লুইস-এর লেখা বহু পরিচিত সেই বইটির একটি বাক্য— 'এভ্‌রি পোয়েম ইজ ইটসেল্‌ফ্‌ অ্যান ইমেজ' (দ্য পোয়েটিক ইমেজ, ১৯৪৭, সংস্করণ ১৯৫৫ পৃ: ১৭)। সরাসরি ব্যাখ্যার পরিবর্তে এবং প্রত্যক্ষ বক্তব্য পরিহার করে শব্দ-নির্মিত একটি মূর্ততার নির্মাণই চিত্রকল্প। 'মূর্তি' বলে 'মূর্ততা' বললাম। তার কারণ 'মূর্তি' শব্দে দৃশ্য এবং স্পর্শগ্রাহ্য সাবয়বতা খুব স্পষ্ট। কিন্তু সুর, সৌরভ, এবং স্বাদের অনুভবেও চিত্রকল্প গড়ে উঠতে পারে। শ্রুতি অথবা গন্ধ-চিত্রকল্পের মূর্তি থাকে না। কিন্তু থাকে ইন্দ্রিয়-সংবেদী মূর্ততা। চিত্রকল্প ছাড়া কবিতা নেই। অধিকাংশ কবিই দৃশ্য-চিত্রকল্পের সঙ্গে অনুভব ও অভিজ্ঞতার স্মৃতির মিশ্রণে শব্দ-শিল্প গড়ে তোলেন। একটা সময় ছিল যখন গণেশ বসুর কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বার বার উল্লেখ করা হত তাঁর 'সমুদ্রমহিষ' কবিতাটি ('নিজের মুখোমুখি')।

প্রাণী-প্রতীক কবিতায় নতুন নয়। জীবনানন্দ ঘোড়া, বুনোহাঁস, ঘাই হরিণী, উটের গ্রীবা, ইঁদুর-ধরা পেঁচা ইত্যাদি প্রাণী-প্রতীককে অবিস্মরণীয় করে দিয়ে গেছেন। বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার ঘোড়াটিকে কে ভুলতে পারে? অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কাক ডাকে' কবিতার কাক এবং তার বিদেশি পূর্বসূরি এডগার অ্যালান পো-র 'দ্য র‍্যাভেন'! এত প্রতীকের পরেও গণেশ বসুর 'সমুদ্রমহিষ' চিত্রকল্পরূপে এবং প্রতীকী তাৎপর্যে বাংলা কবিতায় এক নতুন ব্যঞ্জনা এবং স্থায়িত্ব দিতে পেরেছেন। এ জাতীয় সাফল্য খুব সুলভ নয়। 'সমুদ্রমহিষ' প্রতীকের গঠনেই মিশে থাকে পুরাণ স্মৃতি। সমুদ্র গর্ভে অগ্নির ধারণা

আর সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে আসা তেজস্বী দিব্য অশ্ব আমাদের কাছে পরিচিত। কিন্তু সমুদ্রমহিষ সেই পুরাণকৃত ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে একালের কবির নিজস্ব কল্পনা। আলোড়ন-ক্ষুব্ধ সমুদ্র আর ক্রোধদীপ্ত মহিষের ভীষণ শৌর্যের ছবি মিশেছে এই কল্পনায়। কবি সমুদ্রমহিষকে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ও অস্থিরতার ভাবমূর্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। তার বহিরঙ্গে ধ্বংস-শক্তির; কিন্তু জীর্ণ, অসত্য আর অন্যায়কে দলিত করবার জন্যই এই অস্থির ক্রোধ।—

মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ঙ্কর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।
... ...
এখন রক্তের মধ্যে স্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।

পশু-পাখির চিত্রকল্প কবিতায় একেবারেই নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ শেয়াল, শকুন, বিড়াল, জেব্রা, মাকড়সা, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীকুলকে বেশ চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরেও গণেশ বসু তাঁর প্রতীক-সন্ধানী চোখে কবিতার ভাষায় নামিয়ে আনেন গন্ডারকে, কুমিরকে। এই দুটি প্রতীক সম্পর্কে কিছু বলবার আগে সাধারণভাবে বলে নেওয়া যায়, এই কবি বিশ্বের, বিশেষ করে ভারতের ক্ষমতালুব্ধ, ভোগবাদী, নির্মম, অমানবিক বর্তমান সমাজের সার্বিক পরিস্থিতিতে একই সঙ্গে বিচলিত ক্রুদ্ধ এবং অস্থির হয়ে ওঠেন। সেই প্রথম কবিতা-সংকলনের প্রেমনিষিক্ত অনুভবলোক অতিক্রম করে সময়ের সঙ্গে যত তিনি পথ চলেছেন ততই অন্তর্গত অশান্তি তাঁকে আক্রান্ত করে রেখেছে। যদি কোনো পাঠক কবিতার মধ্যে শান্তি, প্রসন্নতা এবং নির্মল আশাবাদী শুদ্ধতার সন্ধান করেন তাহলে গণেশ বসুর কবিতা তাঁর জন্য নয়। যদি বাস্তবের স্বরূপ দেখেও আমরা কোনো কল্পিত সুখের জগতে বাস করতে চাই তাহলে তা মিথ্যাকেই লালন করে। কবির সমুদ্রমহিষ ঠিক এই মুহূর্তে এই দেশে আমাদের সকলেরই মধ্যে আশ্রয় খুঁজে সেই ক্রোধকে শান্ত রাখার ভান করি। গণেশ বসুর কবিতায় অন্তত সেই ভান নেই।

এই ভাবনার প্রেক্ষিতে কবির গণ্ডারকে দেখা যেতে পারে।—

ক্ষমতার স্বাদ পেলে কেউ কেউ হয়ে ওঠে মাতাল গণ্ডার
মাতাল গণ্ডারগুলো খড়্গে খড়্গে ঝলসে ওঠে তিমিরবিলাসে।
বিনয়ের বৃষ্টি নেই ছিটে ফোঁটা, বুনো আগাছায়

ভরে যায় স্বপ্ন সব, কাঁটায় কাঁটায়
কষ ঝরে, চোরা ঘূর্ণি, পতনের অশনিসঙ্কেত। (নীরব সন্ত্রাস)

কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তি গভীর বিষাদের স্পর্শে আমাদের আর্ত করে তোলে। 'গণ্ডার' কবিতাটি কোনো দিক থেকেই দুরূহ নয়। বিবেকবিহীন ক্ষমতাবানদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ। কিন্তু শেষের বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তিটি হল—

''নিখিলের ঘোড়াগুলো কেন যে এমনভাবে বদলে যায় মাতাল গণ্ডারে?''

শেষ পঙ্‌ক্তিতে কবিচিত্তের নৈরাশ্য জর্জরিত জিজ্ঞাসা জীবনানন্দের 'মহিনের ঘোড়া'র মতো শোনালেও এ ঘোড়া আলাদা। 'নিখিলের ঘোড়া' সম্ভবত বিশ্বের শুদ্ধ শক্তির এবং অমলিন তেজের প্রতীকী প্রাণী সেই নিখিলের ঘোড়াগুলি মাতাল গন্ডার কেন হয়ে যায়— কে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে?

অজস্র প্রাণী-প্রতীক আছে গণেশ বসুর কবিতায়। ভূচর, খেচর, জলচর এবং সরীসৃপ। কিন্তু দৃষ্টান্ত দেবার অবকাশ একটি নিবন্ধে হবে না। আর একটিমাত্র প্রাণী-প্রতীকের কথা বলব। গণেশ বসুর বিভিন্ন কবিতায় এই বিচিত্র বর্ণের পাখিটি চিত্রকল্প ও প্রতীক হয়ে এসেছে। সমুদ্রমহিষের সঙ্গে তাকেও মনে পড়ে। সে এক সোনালি মোরগ। সমুজ্জ্বল, গৌরব সমুন্নত ও প্রত্যয়দৃপ্ত আশা-সংকল্পের প্রতীক। মোরগের বর্ণময় পালক-বিন্যাস, অবয়ব-গড়নের সুডৌল প্রপোরশন্, রক্ত-শিরঃ উষ্ণীষের সম্ভ্রান্ত সজ্জা, সকালের আলো ফোটার মুহূর্তে সূর্যোদয়ের বার্তা ঘোষণার মধ্যে যেন এক স্বমহিম নেতৃত্বের আভাস অনুভব করা যায়। গণেশ বসুর কবিতায় কখনও এসেছে বাতাসের গতি নির্দেশক হাওয়া মোরগ। যেন দেশ-কালের ঘূর্ণি সর্বাগ্রে অনুভব করছে সেই-ই, সংকেত দিচ্ছে প্রকৃত পথের। সেই পথ সংগ্রামের পথ। রক্তঝরানো পথ। তবু সূর্যের প্রত্যাশা অনির্বাণ।—

সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায়
যেখানে রক্তের জলে সূর্য হেসে যায়।

ক্রমে হাওয়ার-মোরগ ভিন্ন অর্থে প্রাণময় হয়ে ওঠে। তার পায়ের তলায় আর থাকে না স্থিতাবস্থায় প্রতীক গির্জার চূড়া। পর্বতশীর্ষে সোনালি মোরগ হয়ে ওঠে কবির যাত্রার লক্ষ্য। কখনও কখনও নৈরাশ্যের মুহূর্তে সেই স্বর্ণাভ পাখিকে কবি বিপন্নও দেখেছেন—'সামনে তাকালে অন্ধ, পিছুটান রক্তাক্ত মোরগ।' মোরগকে নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কুক্কুট' নামের কবিতা লিখেছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমতের বিপক্ষে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- এই পাখিটির মানুষ তার খাদ্য অভ্যাসের সঙ্গে বড়ো বেশি জুড়ে নিয়েছে বলেই কবিতা সভায় তার স্থান হল না। কিন্তু কবিতার ইতিহাস সে কথা বলে না। চতুর্দশ শতাব্দীর চসার-এর কবিতায় বর্ণময় এবং প্রভাতের দূত মোরগ রাজকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। চসারও আখ্যানটি নিয়েছিলেন

প্রাচীন লোককথা থেকে। অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর কাছে সূর্যোদয় যে প্রাত্যাহিক কর্মযাত্রার প্রত্যাদেশ বহন করে আনে তারই ধ্বনিসংকেত মোরগের ডাক। সুকান্ত ভট্টাচার্য ক্ষুধার্তের প্রতিনিধিরূপে একটি মোরগকে কবিতায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু গণেশ বসুর সোনালি মোরগ মানবসভ্যতার আদিযুগের প্রতিটি নবীন প্রভাতের আলোকদূতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরাণ থেকে চিত্রকল্প গ্রহণ করবার ঐতিহ্য বিশ্বের সব দেশের সাহিত্যেই প্রচলিত। গণেশ বসুর কবিতাতেও পুরাণ-চরিত্রের অভ্যস্ত ব্যঞ্জনা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তিনিও কবিতায় নিয়ে এসেছেন ভীষ্ম, জটায়ু, অহল্যা, একলব্য, জরাসন্ধ, অভিমন্যুকে। ক্বচিৎ পাশ্চাত্য পুরাণ চরিত্রও আছে। যেমন অর্ফিয়ুস, ভেনাস। কিন্তু একথা বলব না যে, কোনো নুতন তাৎপর্য পুরাণ চরিত্রগুলি তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সেই তুলনায় প্রাণী প্রতীক তাঁর কবিতায় অচেনা রহস্যের ইঙ্গিত দেয়। পাঠক তাঁর টিকটিকি, সিন্ধু ঘোটক, লাল হরিণ, শুঁয়োপোকা ইত্যাদি প্রতীকী চিত্রকল্পগুলি দেখলেই তা অনুভব করতে পারবেন।

মিশ্রবৃত্ত আর কলাবৃত্ত— এই দুটি ছন্দের চলনেই গণেশ বসু স্বচ্ছন্দ। গদ্যরীতিতেও অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার সামগ্রিক গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত বলা যায় যে, তিনি দীর্ঘ কবিতা, মাঝারি মাপের কবিতা এবং খুব ছোটো তিন-চার-পাঁচ পঙ্‌ক্তির কবিতাও লেখেন। কবিতা দৈর্ঘ্যে প্রতিটি পরিসরেই তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ। আমি তাঁর দুটি দীর্ঘ কবিতার উল্লেখ করব বিশেষভাবে। একটি হল 'নীরব সন্ত্রাস' সংকলনের 'খরা' কবিতাটিকে বলা যায় কবির আত্মজীবনের চলছবি। দেশ-গ্রাম, পিতামহ ও পিতার প্রসঙ্গ, দেশবিভাগ, দেশের স্মৃতি, জন্মভিটে ছেড়ে শহরে পা রাখা। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গকে স্বদেশ করে নেবার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের পথের প্রত্যক্ষতাকে কবি কয়েকটি নামের উল্লেখে বাস্তবায়িত করে তোলেন—মুজফ্‌ফর আহমদ, আব্দুল হালিম, বঙ্কিম মুখুজ্যে, প্রমোদবাবু, পূরণ চাঁদ, ভবানী সেন, চারু মজুমদার।

আবার জীবনকে গড়ে তোলার পথে অন্তরের গভীরে কবিতার অপ্রতিরোধ্য সঞ্চার। সেখানে 'স্বপ্নের ভিতর হেঁটে বেড়ান জীবনানন্দ'। কেবল জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে নন, তিনি উল্লেখ করেন মহাদেবের দুয়ার, পারাণ মাঝির হাঁক, জননী যন্ত্রণা, মাটির বেহালা, অমলকান্তির রোদ্দুর হতে চাওয়া এবং বাবরের প্রার্থনা। এই অংশটি পড়তে পড়তে একজন কবির, একজন সংগ্রামী কবির প্রাণপ্রবাহের স্পন্দন অনুভব করি। তাঁর বেঁচে থাকার পথে রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রপথিকরা, আর কবি হওয়ার পথে পূর্বজ কবিদের কাছে তাঁর অনাবিল ঋণের স্বীকৃতি। প্রবন্ধ লিখে নয়, বক্তৃতা দিয়ে নয়; স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা-পঙ্‌ক্তিতে যেভাবে

তিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষকে অকুণ্ঠ হৃদয়ে স্মরণ করেছেন তা পাঠকের মনকে ভরিয়ে তুলবে; যদি সেই পাঠকের জানা থাকে দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাস আর কবিতার পর্ব-পর্বান্তর। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কবিতাটি কেবল জীবনস্মৃতির কবিতা নয়। কবিতার নাম 'খরা'। কবি বাস করেন এক খরায় পোড়া পৃথিবীতে। সেখানে কেবল এই দেশ নয় সমগ্র পৃথিবী মৃতকল্প। কবিতার শুরু হয়েছে ইথিওপিয়া-র পরিস্থিতি দিয়ে; মৃত সন্তান বুকে করে সোমালি জননীর ছবি দিয়ে, আর ওড়িশার ক্ষুধার্ত মানুষের প্রসঙ্গ দিয়ে। কবির আত্মজীবন আর বিশ্বের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া সবই এক খরা পীড়িত বিশ্বের অঙ্গীভূত। এই কবিতাটি দীর্ঘ। কিন্তু মহাকাব্যিক বিস্তারের জন্য সেই দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন ছিল।

আর একটি দীর্ঘ কবিতার নাম 'লেনিনঃ অধিকার রক্তের কবিতার'। একক কবিতা না বলে এটিকে সম্পূর্ণ একটি কাব্য বলাই সঙ্গত। যদিও কবি ভুমিকার কয়েক পঙ্‌ক্তিতে দীর্ঘ কবিতা বলে নির্দেশ করেছেন। ১৯৭০-এ প্রকাশিত কাব্যটির বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ। কিন্তু কেবল লেনিন-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে রচনাটি শেষ হয়নি; ভারত ও বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক সংকট, ভারতীয় ও বাঙালির সভায় প্রবাহিত কবির নিজের অনুভূতিমালা, সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিছু স্মৃতিও কবিতাটিতে মিশে আছে। দীর্ঘ রচনাটিতে মিশ্রবৃত্ত পয়ার, কলাবৃত্তের তরঙ্গ এবং গদ্য বাচনরীতি সংমিশ্রিত। কবিতাটির বিভিন্ন স্তর আছে। বাস্তু হারানো কিশোরের জীবন সংগ্রাম, বিশ্বজোড়া শ্রমিক জাগরণ, নতুন যুগের স্বপ্ন, তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার স্মরণে ভারত ও বাংলার সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় এক সাম্যময় পৃথিবীর জয়গান ঝংকৃত এই কবিতায়।

ইতিহাসের বিরুদ্ধ গতিতে সেদিনের সেই স্বপ্ন বাস্তবে স্থায়িত্ব পায়নি; কিন্তু তাতে মানবমুক্তির স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের ভিত্তিভূমি যে সত্য ও সাম্যের নৈতিকতার শক্তি— তার মূল্য কমে না এবং তা মিথ্যা বলেও প্রমাণিত হয় না। ইতিহাসও রুদ্ধ হয় না কোনো একটি শতাব্দীর সময়সীমায়। দীর্ঘ কবিতার রূপ রচনায় গণেশ বসুর অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য কাব্যটিকে অতীব সুপাঠ্য করেছে। এই কবিতাটি মনে করিয়ে দিতে পারে লেনিনকে নিয়ে লেখা মায়াকোভ্‌স্কি-র দীর্ঘ কবিতাটি।

যেমন দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন, তেমনই ছোটো এবং খুব ছোটো কবিতাও লিখেছেন গণেশ বসু। দুই, তিন, চার, পাঁচ পঙ্‌ক্তির কবিতা আছে এবং এক পঙ্‌ক্তির 'ওয়ান লাইনার'ও আছে। তাঁর এরকম একটি ছোটো কবিতার গুচ্ছের নাম 'মুহূর্ত মঞ্জরী'। সেখানে থেকে দুটি এক পঙ্‌ক্তিক কবিতা উদ্ধৃত হল।

'দেশটাকে ভালোবাসলেই তুমি দেশদ্রোহী'। (দেশদ্রোহী)

'মৃত্যুর কোনো সুন্দর সমশব্দ-ও জানা নেই।' (শব্দসন্ধান)

ছোটো কবিতায় তাঁর কতটা সাবলীলতা ছিল তার আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। কবিতাগুচ্ছটির নাম 'এলোমেলো'। প্রথম কবিতাটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। দ্বিতীয় কবিতাটি মানুষের আত্ম আবিস্কারের বৈরাগ্য।

একদা মিত্র অধুনা বৈরী
সেদিন জনতা এখন স্বৈরী
কিমাশ্চর্য ছবি,
মন্ত্রীর পোষা ময়নাও দেখি
বনে যায় বিপ্লবী। (ময়না)

নামাবলি ছিল তার বুকে
নামাবলি ছিল তার সুখে ও অসুখে
যতদিন যায়
পুরনো পাতার মতো খসে পড়ে নামাবলি
ঘন কুয়াশায় (নামাবলি)

গণেশ বসু যে সময়ে কবিতা লিখেছেন তখন বাংলা কবিতায় কয়েকজন কবি যুথবদ্ধভাবে 'শ্রুতি' নামের একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটু নতুন ধরনের কবিতা লিখতে চাইছিলেন। ছয়-এর দশকের মাঝামাঝি বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। কিন্তু এই কবিরা চাইছিলেন সত্তার নিগূঢ় নিহিত অবলম্বনরূপে চৈতন্যের পরিস্রুতি। সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কবিতায় স্থান দেবেন না ব'লে তাঁরা স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন। ফলে এই কবিদের সঙ্গে মিলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না গণেশ বসুর। যদিও এই ছয় এর দশকে তিনি প্রেমের কবিতাই প্রধানত লিখেছেন। কিন্তু 'শ্রুতি'-র কবিদের মতো সংবৃত চৈতন্যের ধরনে নয়, ভাবাবেগই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। তবে কবিতার প্রকরণের দিক থেকে

'শ্রুতি' গোষ্ঠীর কবিদের একটি পরীক্ষা সম্ভবত তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কথাটি মনে পড়ল গণেশ বসুর এ যাবৎ প্রকাশিত শেষ কবিতা সংকলন 'বল্‌গা হরিণের শিং' (২০১৫)— সংকলনের শেষ পাঁচটি কবিতা দেখে।

'শ্রুতি' গোষ্ঠীর কবিরা কবিতাকে শ্রুতির আওতা ছাড়িয়ে বেশ সচেতনভাবেই 'দৃশ্য' করে তুলেছিলেন। কবিতার পট অর্থাৎ পৃষ্ঠার সাদা অংশকে বিশেষ পরিকল্পনায় ব্যবহার করে শব্দের সাহায্যে ভাবনুসারী দৃশ্যময় কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা। এই রীতি অবশ্য খুব নতুন নয়। পাশ্চাত্য কবিদের অনেকেই এই স্টাইল-এ কবিতা রচনা করেছেন আগে—মারিনেত্তি, আপোলিনেয়ার, মায়াকোভ্স্কি, কামিংস, কিছুটা এলিয়টও। কমবেশি অনেক কবিই পৃষ্ঠার উপর মুদ্রিত শব্দের বিন্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকেন। কিন্তু 'শ্রুতি'র কবিরা বাংলা কবিতায় এ বিষয়ে ছিলেন রীতিমতো একটি নতুন লিখনভঙ্গির সচেতন সূত্রধার। গণেশ বসুকে এই রীতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর অনেক কবিতার মধ্যেই কোথাও কোথাও শব্দের বিন্যাস এবং সেই বিন্যাসে ছেড়ে রাখা পৃষ্ঠার সাদা অংশের পরিকল্পনার একটি ভাবানুষঙ্গ অনুভূত হয়। কিন্তু যে কবিতাগুলির কথা বলছি সেগুলি সে জাতীয় নয়। সেগুলিকে অনেকটা 'চিহ্ন' কবিতা বলা যায়। একটি বাক্যাংশে দুটি তিনটি শব্দের সঙ্গে কবি বসিয়ে দেন কয়েকটি চিহ্নের, বিন্দুর এবং রেখার সমাহার। দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তিনটি রচনার। সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা পাঠকের বিচার্য। কিন্তু কবির কাছে সেগুলি গ্রহণযোগ্য তাতে সংশয় নেই। কবি কি তাঁর পরিণত বয়সে এমন কথাও ভাবছেন— শব্দ দিয়ে কোনো কোনো সময়ে মনের ভাবনাটিকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না?

গণেশ বসু সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে নিজের সমাজবোধ, মনুষ্যত্ববোধ এবং কবিতা বোধকে অবিছিন্ন রেখেছেন। কবিতাটি পাঠকের কেমন লাগবে সে বিষয়ে তাঁর ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। নিজেকে সার্বিক সততায় প্রকাশ করতে পারছেন কিনা এই আত্মজিজ্ঞাসাই তাঁকে কবি করে তুলেছে। স্পষ্ট করে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষতচিহ্নগুলি তিনি দেখাতে চান বলেই তাঁর কবিতায় আত্মমগ্ন অনুভবের অবকাশও আছে, তা অনেক সময় পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

আমরা শেষ করব তাঁর 'এলোমেলো' নামের কবিতাগুচ্ছের একটি চার পঙ্‌ক্তির কবিতা দিয়ে। এই কবিতায় ধরা পড়েছে পার্থিব জীবনের সার সত্য:

ক্ষমতাই এখন আফিম
ক্ষমতাই বন্দুকের নল
ক্ষমতাই ছেঁড়া বাসি রুটি
ক্ষমতাই দুচোখের জল।

ক্ষমতা যখন তার অস্তিত্বের নিবিড় কৃষ্ণগহ্বরে, রক্তকরবীর রাজার মতো, অশ্রুবিন্দুর ক্ষরণ চিনে নেয়—তখন, একমাত্র তখনই সেই মুহূর্তের জন্য— পৃথিবী বাসযোগ্য হয়।

প্রতিভাবান কবি গণেশ বসু

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অনুভব, উপলব্ধি, কল্পনাপ্রতিভা ও দর্শনের সমন্বয়ে কবিতার জন্ম। এই চারটি উপাদান একান্তই ব্যক্তিগত, এর কোনো একটির অভাবে কবিতা সৃষ্টি অসম্ভব। অন্তত আমার কবিতা পড়ার ও অনুভব করার অন্তর্গত বয়ন শিল্প এই রকমই।

সৃষ্টিধর্মিতা থাকাই যথেষ্ট নয়, আত্মার অনুভব ও তার নিবিড় কর্মই সৃষ্টি ধর্ম, এ দুয়ের মেলবন্ধন চাই। আর যে তা করতে পারে সে তাতেই নিবিষ্ট হয়ে থাকে, অন্য কাজ তার পরিপূরক মাত্র।

কবি গণেশ বসু হলেন এরকম একজন সমন্বয়কারী শিল্পী। শব্দের শূন্য পাত্রে অনুভব ও অভিজ্ঞতার নিষ্কাশন করতে জানেন তিনি, তাই যৌবনের শুরুতেই তাঁর কবিতার জন্ম একেবারেই অন্তর্গত তাড়নার বশে।

আমি তাঁর সৃজনশীলতার বহুদিনের পাঠক। তাঁর নির্মাণ ও সৃষ্টিধর্মের সঙ্গে যৌবনের শুরু থেকে যুক্ত হয়ে আছি। যখন প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশ করেছেন তখন থেকে নিবিড় পাঠে মন দিয়েছি আমি। কেননা প্রায় সম সময়ের বন্ধুত্বও ছিলো আমাদের, আমার 'অসীমার প্রতি সনেটগুচ্ছ' প্রকাশ, তখন যৌবন শুরুর সময়কাল। প্রেম এসেছিলো বাস্তব জগতে বিচরণ করতে করতে আকস্মিকভাবে। আর তার প্রকাশ হয়েছিলো অনুভব ও উপলব্ধির যৌথ মিলনে।

'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'— অসাধারণ অনুভব-উৎসারিত পংক্তি, যা সব সময়ে মনে মনে বার্তা দিতে থাকে।

'মনে হয় শূন্যতায়, 'তুমিহীন কাটে না সময়'। এই অনুভব-উৎসারিত শব্দগ্রন্থনা একজন প্রকৃত কবিরই কলমে বেজে উঠতে পারে।

'কোন্‌খানে যাই? তোমাকে ছাড়া যে বাতাস কাঁদে
একা রয়ে গেলে পাঁজরে বইছে করুণ গান।'

এই পংক্তি বা স্তবক, সমগ্র কবিতা একজন প্রকৃত কবির— কবির কলম থেকে উৎসারিত হতে পারে। গণেশ বসু একজন প্রকৃত কবি, এবং অসাধারণ স্রষ্টা।

'বনানী' এই পৃথিবীতে আলো অন্ধকারে উজ্জীবিত একজন কবির প্রিয় নারী, তাকে নিয়ে অসংখ্য সুন্দর কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছিলো, কারণ সে কবির মনকে আলোড়িত করেছিলো সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে।

এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত তাঁর ১২টি কাব্যগ্রন্থ। ড. জয়গোপাল মণ্ডল তাঁর কল্পনা প্রতিভা ধীশক্তির যোগে 'কবিতা সংগ্রহ' করেছেন অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে। একজন আলোচক যে এমন কবিতা প্রেমিক, তা মেনে আমি আশান্বিত হয়ে আছি, কারণ তাঁর সংবেদী হাতে কবিতার অনুভব, রূপনির্মিতি অনুভব ক'রে তাকে সংবেদনশীল পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, ভবিষ্যতেও তুলে ধরবেন।

গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহে রয়েছে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৪), নিজের মুখোমুখি (১৯৬৭), রক্তের ভিতরে রৌদ্র (১৯৬৯), 'লেনিন: অধিকার রক্তের কবিতার (১৯৭০), 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ (১৯৭১), বাঘের থাবার নিচে (১৯৮২), নীরব সন্ত্রাস (১৯৯৯), অন্ন অশ্রু ভায়োলিন (২০০৪), ভাসান দরিয়া (২০০৮), ভাঙা বইঠার গান (২০১১), বর্ণময় পৃথিবী (২০১৩), বল্‌গা হরিণের শিং (২০১৫) প্রভৃতি গ্রন্থ।

আমি আর গণেশ বসু একই সময়ে কবিতা ধরে বেঁচে থেকেছি। তবে, তার গণমুখিতা কবিতায় ধরা পড়েছে। কারণ তিনি, ঐ সময়, ষাট-সত্তরের দশকের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং থাকাটা ছিল প্রকৃত অর্থেই লগ্ন। যে দর্শন আমাদের যুব সমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে, তিনি তাকে বাস্তবে রূপ দিতেও চেয়েছিলেন। তবে তাঁর কবিতায় ছিলো কিছু ভিন্ন মাত্রা। আর ঐখানে নিজের হৃদয় জুড়ে বেদনা তুলে আনতে ব্যস্ত ছিলাম আমরা। তাই, মাত্রাগত পার্থক্য এসেছিলো দুটি ভিন্নধারায়।

'নিজের মুখোমুখি' বইটির প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর চিন্তা ও অনুভব শক্তির দায়বোধ কোনদিকে ও কতোখানি তা নিপুণ ভাবে ধরা পড়েছে।

'সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌঁছোনো গেল না,
পৌঁছোনো যাবে না বুঝি কোনোদিন।
এখানে কেবল
রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে
সংখ্যাহীন মানুষের রক্তের ওপর দিয়ে
সংখ্যাহীন যুবতীর আকাঙ্ক্ষা মাড়িয়ে
বুনো গোলাপের স্বপ্নে বিমোহিত যুবকের বুকের ওপর দিয়ে
অন্ধকার সেতুর ওপারে'

লেখার প্রসাদগুণ ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা সংবেদী-মনকে আকর্ষণ করে সহজেই। মনে হয়, এতো আমিই বলছি আমার কথা। কোথাও আড়ষ্টতা ও অস্পষ্টতা নেই। আর যা নিয়ে কবিতা সৃষ্টি তা অনুভবধর্মী মানুষের বেদনাক্লিষ্ট উদাহরণ।

'চব্বিশ হলো না শুরু, তবু দেখি ক্লান্তি অবসাদ
সমস্ত শরীরে ব্যক্ত, সৃষ্টি করে প্রদোষের প্রবল বিষাদ
স্বাভাবিক শূন্যতায়
অথচ চেতনা কিংবা অবচেতনায়
আলো আর আকাঙ্ক্ষার অজস্র প্রতিমা
রচেছিলো স্বপ্ন কতো, তার কোনো সীমা
অন্তত জানেনি নিঃস্ব হৃতরাজ্য যৌবনের আয়ু
এখন জড়তাগ্রস্ত একালের স্নায়ু।'

পূর্ববাংলা থেকে আগত, অতিশয় দরিদ্র পীড়িত এক তরুণের তো এরকম উপলব্ধি সম্ভূত উচ্চারণ করাই সম্ভব। কোথায় সচ্ছলতা ও আনন্দ নেই। এবং সহজ কথা

'এখন এসব বুকে বাজে
আর্তনাদে একালের যুবক সমাজে:
হৃদয়ে হৃদয়ে ঘৃণা বড়ো
বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কাঁপে থরো থরো'

অসামান্য নান্দনিকতা, অসম্ভব উপলব্ধিজাত উচ্চারণ। লিখবো, তা নিয়ে দিনের পর দিন চিন্তা নয়, ভিতরে উদ্ভূত পরিস্থিতির নিষ্কাশনই কবিতা হয়ে ওঠে, কিভাবে তা হয়, তা এই সব কবিতার সহজিয়া প্রকাশ দেখে অনুভব করা যায়।

আমাদের বড়ো হয়ে ওঠার সময়টা ষাটের দশক জুড়ে। সময়টা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে, সংঘর্ষে উত্তাল। আমরা একটু খাওয়া পরার অভাবে উদ্‌বাস্তুর ছেলে মেয়েরা ছিলো প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন। তখন মনে হতো—

'প্রতিটি মুহূর্তে ভাবি বিষণ্ণ যুবারা সব কী করে এখানো
বেঁচে আছে অন্ধকারে, নাস্তিময় শতাব্দীর বিষাক্ত বিবরে
কাটায় উজ্জ্বল দিন, পত্রহীন হেমন্তের বৃক্ষের মতন
প্রসারিত বাহু মেলে অশ্রুময় পৃথিবীর বিষাদ প্রান্তরে
একাকী দাঁড়িয়ে রয়।' (অন্ধকার সময়)

গণেশের কবিতায় আমি নিজেকে দেখি, খুঁজে পাই সময়ের দুরন্ত বিষাদ বেলায় গণেশ কী ভাবে আমি, আমাদের কথা লিখছেন। হয়তো একজন প্রকৃত কবির এটাই ধর্ম।

'এবার বুঝি নিজের দিকে তাকাতে হবে ফিরে
কীর্তনিয়া, শুনতে হবে স্মৃতির পদাবলি
সর্বনাশা বিষাদ কেন চতুস্পার্শ্ব ঘিরে
কাঁদায় শুধু, ভুলেও আর পাতেনা অঞ্জলি
স্নেহ কিংবা ভালোবাসার অমল করপুটে' [কীর্তনিয়া]
'প্রতিটি স্বপ্ন বিচূর্ণিত, প্রতিটি হৃদয়
ভীষণ শূন্যতার পাশাপাশি— যেন
সভাশেষের ময়দান হাহাকার, যেন
হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা রিক্ত নির্জনতা
আবৃত করতে চায় আকাশ আর সমুদ্রকে
সমুদ্র আর আকাশকে।' [যদিও জলের গভীরে]

এই প্রসঙ্গে ওঁর কবিতার ভাষা নিয়ে কিছু বলতে চাই। গণেশের ভাষা কোনো ভাবেই কৃত্রিম নয়, একেবারেই প্রতিদিনের মুখের ভাষা, আর তাকে কাব্যগুণ সমৃদ্ধ করে তোলে সহজ ভাবে।

'প্রতিটি স্বপ্ন বিচূর্ণিত, প্রতিটি হৃদয়
ভীষণশূন্যতার পাশাপাশি'

এই ভাষায় কোনো কৃত্রিম নির্মাণ নেই; সহজ ভঙ্গিতে জীবন-মন্থিত শব্দ ব্যবহার করেছেন গণেশ। এটা কবিতার ক্ষেত্রে একটা বড়ো কাজ। যে মানুষ সংবেদনশীল মন নিয়ে কবিতা পড়বেন, তাঁর কাছে ভাষা যেন 'ব্যারিকেড' তৈরি না করে। অথচ কবির চেতনা যেন পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়—

'বুকের ভিতরে কার ছায়া কাঁপে, কার
সমস্ত সৈকত জুড়ে আনাগোনা
দীর্ঘশ্বাস স্মৃতি ঝরে, ভয়ানক তোলপাড়, চোখ
অশ্রুর গভীরে যেন, স্নায়ু ছেঁড়ে, হো হো অন্ধকার
চারদিকে সম্ভাবনাহীন
লালচে ভয়াল দাঁত বিধ্বস্ত বন্দর।

চারদিকের সে সময়ের পরিবেশ এবং একজন যুবকের তাতে জড়িয়ে থাকার বিষাদ, চমৎকার ব্যবহারময় শব্দ দিয়ে এঁকেছেন কবি। এটাই তো কবির কাজ। আমাদের সবার মনে কি প্রশ্ন জাগে না—

'আমিও কি নিরাশ্রয় অবশেষে'
.....
'শুধু করতলে বিভীষিকা, দাবদাহ, প্রবল ধিক্কার?'

এরকম পংক্তি ও স্তবক অবিস্মরণীয় বলে মনে হয় আমার, আমি নিজেকে দেখতে পাই, খুঁজে পাই এই সব শব্দগ্রন্থিত কবিতায়। কেননা বিষাদ, শূন্যতা আমার জন্ম থেকে শরীরে লগ্ন হয়ে আছে।

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' ১৯৭১, বইটি যেন 'গভীর গভীরতর অসুখ এখন'।

'তোমার চোখে স্বদেশ কাঁপে আরেক চেতনায়' এই আরেক চেতনায় বলতে কবি কোন্ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন?

আমাদের ৪৭-এর বাংলা বিভাগের তার যে জগৎ দু' বাংলায় আমরা দেখেছি, তার মতন ভয়ঙ্কর দিন আমাদের অভিজ্ঞতায় তখন ছিলোনা, ভাসমান শবের পাশ দিয়ে স্টিমার চলেছে, দেখেছি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে মানুষ চলেছে একটু আশ্রয়ের খোঁজে। সেটা আমাদের কিশোর কাল ও যৌবনের সূচনা দিনগুলো। কিন্তু সেই ধ্বংসলীলার অবসানে ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন বাংলাদেশে হয়েছে, যার ফলে পাকিস্তান দু-টুকরো, সেই সবের সঙ্গী হয়নি এ বাংলার মানুষ, কারণ বাংলা ভাষা নিয়ে এ দেশে কোনো সংকট ছিল না। কিন্তু, আর এক চেতনা জেগেছিলো সেই সময়ে আমার বাংলায়। 'ধ্বস্ত স্বদেশ তোমার চোখে আরেক চেতনা'। গণেশ বসু তাঁর চেতনায় আর এক দিক দেখতে পেয়েছেন, তাঁর স্বদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমার বাংলাদেশ দু'টুকরো হবার আগে বরিশালে গেলাম। আমার জন্মের পর ছ'বছর কেটে গেছে, দলে দলে হিন্দু তার সব কিছু সঞ্চয় ফেলে এ বাংলার মাটিতে স্বদেশ খুঁজে নিতে প্রবল প্রয়াস চালাচ্ছেন। কিন্তু ও বাংলায় তার পরেও ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত, আর তা প্রবল আকার নেয় মুজিবরের নের্তৃত্বে পুর্ব পাকিস্তানের ভাষা শহীদের মৃত্যু আরো অসংখ্যের জীবন দানের মধ্য দিয়ে।

'জমানো সব কান্না ঝরে, হারিয়ে ফেলেছি
খোঁয়াড়ে বাঁধা গুমরে মরার অথৈ অভিশাপ,
ঘাড় ঝাঁকিয়ে অবিশ্বাসের তোমাকে পেয়েছি
ভালোবাসায় অগ্রগতি, ভুলেছি অনুতাপ,
ভিতর বোধের স্বপ্ন শ্রমে কেশর মেলেছি'

খুব ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছিল ফেলে আসা জন্মভূমির স্মৃতি, সত্তা। যদিও, আমি তখন এতোটা আন্দোলিত হইনি, কারণ বলা যায়— সামান্য বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিদিনের যুদ্ধ লড়ছি তখনও কবিতা তো জেনে বুঝে হয় না, তার জন্যে হতে হয় সেই বিষয়ে সংবেদনশীল। তা আসার মধ্যে তখন তেমন ছিলো না। আমি পায়ের মাটিকে শক্ত করতে ব্যস্ত ছিলাম।

গণেশ বসু বামপন্থী কবি বলে তখন পরিচিত, ছিলেন সবার কাছে প্রিয়। বামপন্থীরা সমকালের নানা বিষয়ে সহজেই সাড়া দিতে পারেন। তাই, সহজেই অনুভব করে বলতে পারেন :

'স্বাগত জানাবো কাকে, কার করতলে আছে আগুনের আঁচ
এখন কেবল হাঁটি, গোলক ধাঁধায় হাঁটি, ঘাড়ে নিয়ে সন্ত্রাসের বেড়া।'

এই বস্তুচেতন সমকালীনতা গণেশের কবিতায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সব চাইতে ভালো লাগে শব্দবন্ধনের কৃত্রিমতা কোথাও নেই, অথচ গ্রন্থিত শব্দ নানামুখি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। এটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরাট কাজ।

'নীরব সন্ত্রাস' (প্রকাশিত হয় ১৯৯৯তে)। তখন বয়সে আরো পরিণত গণেশ কতো সহজে লেখে:

'এ কোন্ কালো দিঘির থেকে উঠলো জেগে ঢেউ
মাথায় জ্বলে চিতা
দুহাতে নদী দুপায়ে কাদা শরীরে খেলে যায়
কোরাণ আর ও গীতা।'

এটাই হলো 'রিয়েলাইজেসান' এর উচ্চারণ, জাত কবিতা।

যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াচ্ছেন, ওখানকার অধ্যক্ষ শান্তি সিংহ রায়ের স্মৃতিতে লেখা চার লাইনের কবিতার যেমন গঠন ভঙ্গি তেমন কী তাৎপর্যময় হয়ে বেজে উঠেছে—

'স্মৃতি কার মায়াবী সেতার,
স্মৃতি কার শরতের রোদ,
আমার চেতনা জুড়ে কার
বেজে যায় হারানো সরোদ।'

আসলে কবিতা লিখছি বা লিখবো ভাবলেই তা কবিতা হয়ে উঠবে এমন নয়; যে অনুভব গাঢ়তর চেতনায় জুড়ে যায়, যা প্রকাশের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তাই কবিতার বিষয় এবং হয়ে ওঠে কবিতা।

গণেশ বসুর কবিতার সঙ্গে একাত্ম হতে সময় লাগে না। যদি পাঠকের প্রস্তুতি থাকে, তাঁর কবিতার সঙ্গে একাত্ম হবার। আমি গণেশের লেখনের প্রস্তুতি অনুভব করতে পারি। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সমর্থক ও কর্মী হয়েও নিজেকে একমাত্রিকতায় আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। একমাত্রিকতা কবিতার শত্রু, তার থাকে বহুমাত্রিকতা (mulidimention), সেই কাজ সবার জন্যে নয়। দেখব ব্যক্তিগত আনন্দ বিষাদ কতো সুন্দর ভাবে গণেশ প্রকাশ করেছেন— নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রকে নিয়ে লেখা একটি কবিতায়— 'কোনো অভিমান নয়। কার প্রতি

অভিমান? নীরব নিঃসঙ্গ চলে যাওয়া / ঢের বেশি উজ্জ্বলতা, সহজ সারল্য/ এই রাজকীয় বিনা আড়ম্বর নক্ষত্র প্রস্থান। থেকে যায় কিছু চাওয়া পাওয়া/ ঢেউয়ের চূড়ায় সমুদ্রের নিজস্ব বলয়ে দায়বদ্ধ প্রকীর্ণ প্রহর / নচিকেতা, তোমার মননে।'

এইভাবে কবিতার একাধিক যাত্রা দেখে চেনা সহজ, এতো গণেশ বসুই লিখেছেন। বিষয় ও ভাবনার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তার দুই দিকেই তাঁর সমানাধিকার। কবিতা পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে থাকতে হয়। আর অপাতত শেষ গ্রন্থ 'বল্‌গা হরিণের শিং' -এ এসে মনে হয় পরিণত কবির এই প্রবল উপস্থিতি আর যেন পরিণততম এখানে। কতো সংক্ষিপ্ত কবিতায় তাঁর— কবিতার চিরকালীনতা মনে গেঁথে যায়।

'নেকড়ের দাঁতের মধ্যে শাসকের সূর্যোদয় চিরকাল ঘটে।' [চেহারা]
'অস্ত্র কেনাবেচায় যখন ব্যস্ত থাকে হাত
শান্তি তখন গুনতে থাকে হাজার হাজার লাশ।' [শান্তি]
'কবিতা আমার অন্ন
আর সে অন্ন প্রত্যহ চাই প্রতিটি লোকের জন্য।' [অন্ন]
'আমার শরীর আর স্বর
মিলে মিশে কবিতার বিশ্বচরাচর' [কবিতা]

এত কম শব্দে চিরন্তন সত্য তুলে ধরেছেন গণেশ। এই গ্রন্থের কবিতার শরীর নিয়ে আছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, কিন্তু কখনো অনুভূতি দেশের বাইরে যায়নি। প্রত্যেক কবিতা প্রেমিককে আহ্বান করছি, গণেশ বসুর কবিতার পাঠক হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করুন।

জয়গোপাল মণ্ডল অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ করেছেন। বইটি প্রকাশ করে, সম্পাদনা করে। তাঁর লেখা ভূমিকাটি কবিকে প্রকৃত রূপে চিনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

দীর্ঘদিনের কবিতার পাঠক ও লেখক রূপে গণেশকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এই গ্রন্থের অসামান্য কবিতার কারুকৃৎ তিনি, থাকবেন প্রকৃত পাঠকের অন্তঃস্থলে অনেক অনেক কাল।

প্রগতি কবিতার যথার্থ উত্তরসূরি

অনন্ত দাশ

বাংলা প্রগতি কবিতার যে ধারাটি চল্লিশ থেকে প্রবাহিত হয়ে পঞ্চাশে তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিরা বহন করেছেন তাকে নতুন আবেগে সঞ্জীবিত ও সঞ্চালনা করেন ছয়ের দশকের অন্যতম বিশিষ্ট কবি গণেশ বসু। তিনি এই ধারাটিকে শুধু প্রবহমান রাখেননি, তাঁর প্রতিবাদী সত্তায় তাকে দিয়েছেন সমাজবাস্তবতার এক বিশেষ রূপ। তিনি জীবননিষ্ঠ ও কাল সচেতন। রাজনৈতিক আদর্শ, মানবিক ভাবনা ও প্রগতি চেতনা দিয়ে তিনি জীবনের সমগ্রতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই, সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনে যে প্রেম এসেছে তাকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

১৯৬৪-তে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' নামক কাব্যগ্রন্থটির মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যজীবনের শুরু। প্রেমপ্রীতি, বিচ্ছেদ ও বিরহ এবং তা থেকে উদ্ধৃত বিষাদ ও আনন্দ প্রথম দিকে ছিল তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি—

যতই ভুলিতে চাহি কোনক্রমে পারি না ভুলিতে।
নিরবধিকাল ধরে জেগে আছো, জানি জেগে রবে
অসহ স্মৃতিকে নিয়ে বেদনায়...(কবিতাগুচ্ছ-১১)

নিরবধিকাল ধরে প্রেমিকা তাঁর হৃদয়ে 'অসহ স্মৃতির' মমতাময় চৌম্বক আকর্ষণে জেগে আছে এবং এই কাব্যের বহু কবিতায় তা শুদ্ধতম ভালবাসার উত্তরণ ঘটিয়েছে। গভীরতর উপলব্ধিতে এই প্রেম তাঁর জীবনে এনে দেয় বিপুল প্রসারতা, তুচ্ছ হয়ে যায় যশ, খ্যাতি, রাজ্যপাট, সম্রাটের গরিমা। তিনি চান প্রেমকে শিল্প করে তুলতে, চাই রচনা করেন— 'পবিত্র শিল্পের বুকে' শুদ্ধতম ভালবাসা। কবি তরুণ সান্যাল যাথার্থই বলেছেন, 'কবি প্রেম ও শিল্পকে এক কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন।' তাঁর কাছে 'শিল্পই প্রেম এবং প্রেমই শিল্প'।

তবে যে কবি দেশকাল সমাজ সম্পর্কে খুব সচেতন, যিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন অন্যায়, নীতিচ্যুতি, দেখেছেন দাঙ্গা, দেশ ভাগ, দুঃস্থের মিছিল, ছিন্নমূল জীবনের অনিশ্চিতির অন্ধকার, বহন করেছেন অসহনীয় দারিদ্র তাঁর

পক্ষে প্রেমের বিচ্ছেদ-বিরহের বিষাদের অনুশোচনায় দীর্ঘ দিন কাটানো সম্ভব নয়। তিনি নিজেকে শুনিয়ে বলেন— 'এবার বুঝি নিজের দিকে তাকাতে হবে ফিরে' এবং পরক্ষণে অনুভব করনে 'বাহুতেআরেক পৃথিবীর স্বপ্ন'। এই আরেক পৃথিবীর স্বপ্ন রচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন—

'কোথাও সরলতা নেই
চিন্তার জটিলতা পরস্পর বিপ্রতীপ আলোয়
সুবিধাবাদীর ভূমিকায় সোচ্চার করতালি।'

(মাথায় সিংহ, দু'পায়ে পতন/নিজের মুখোমুখি) তিনি 'নিজের মুখোমুখি' হয়ে অনুভব করলেন 'যেন এক পৃথিবী বোবা কান্নায়/তরঙ্গিত।' বিরুদ্ধ প্রার্থনায় প্রতিটি মুহূর্ত রহস্যের। 'জটিলতা আর অবিশ্বাস।' আর এই বিরুদ্ধ পরিবেশের প্রতারণায় বিমূঢ় হয়ে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ উচ্চারণ—

'এখন কে যেন আমার কণ্ঠরোধ করে, কে যেন
রাত্রির নিঃসঙ্গতায় বাঁধতে চায়। প্রতিদিন
ভোরের নির্জনে কংকালের মন্ত্রোচ্চারণ'

তিনি ব্যথিত চিত্তে অনুভব করলেন 'তারপর নির্জনতা এলো/ভোরের মতো নির্জন হলো মাঠের গল্পগুলো/শূন্যতার স্রোত বুকে তুষার।' কিন্তু, সর্বনাশের আরও কিছু বাকি ছিলো। মানুষের দম্ভ ও লোভ, ক্ষমতালিপ্সা ও লালসা নিরীহ মানুষের প্রতি অত্যাচারের ফলস্বরূপ তিনি আরও লক্ষ্য করলেন—

'ধস নামলো চারদিকে
রাত্রির কণ্ঠ ছাপিয়ে কান্না এলো
প্রস্তর যুগের আর্তনাদ
বিষাদ নড়ে বসলো পাহাড়ে
আকাশ একবার দুলে উঠলো নদীর মতো
বাতাস শুনিয়ে গেল বিচ্ছেদের তীব্রতা' (তারপর)।

'বিষাদ নড়ে বসলো পাহাড়ে', 'আকাশ একবার দুলে উঠলো নদীর মতো' ইত্যাদি কবির মননলোকে যে সংশ্লেষ সৃষ্টি করেছে তারই ফলশ্রুতিতে উচ্চারিত হলো তাঁর আর্তি ও খেদোক্তি—'সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌঁছনো গেল না/ পৌঁছনো যাবে না বুঝি কোনোদিন।' কবি-হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী দিয়ে সমাজের অতি পরিচিত অন্যায় ও অবিচারকে পাপ ও দুঃখের গ্লানিকে এত ভয়াবহ দুর্বিষহ আকারে প্রকাশ করার মধ্যে কবির সমাজভাবনা ও সত্যতাকে অনুভব করা যায়; তাই 'সোনালি গির্জার মোরগচূড়ায়' না পৌঁছানোর এই আক্ষেপকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, 'সমুদ্রমহিষ' কবিতায় তিনিই আবার বলেছেন 'এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।'

কবিতাকে তিনি নিছক শব্দচর্চায় পরিণত করেননি, স্বকীয় চিন্তাভাবনায় কবিতাকে আবর্তসংকুল জীবনের সমার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। কবিতা তাঁর কাছে নিছক ভাববিলাস নয়, ছিন্নমূল জীবনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতার মর্মমূলে এক নিদারুণ অভিঘাত এনে দিয়েছে। ব্যক্তিগত দারিদ্র, সাংসারিক টানাপোড়েন, সামাজিক অন্যায়-অবিচারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু হাহুতাশ করেননি, পাঠকের অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে মার্কসিস্ট কবির দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেছেন। আর, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি ভাবালু উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে কবিতাকে উপযুক্ত শব্দচয়ন ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

দেশ বিভাগের যন্ত্রণাকে তিনি যেমন কয়েকটি বেদনার্ত শব্দে প্রকাশ করেন—'টুকরো দেশের চোখের জলে স্বপ্ন জাগে স্বাধীন স্বর' (ধানের চূড়ায়) আবার স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার রক্ষায় পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিকণ্ঠ।

'হঠাৎ আমায় ঘিরলো যখন
এই পৃথিবী ঘুমের ধ্যানে
বন্দুকেরই কুঁদোর গুঁতো
ফেলল ছুঁড়ে প্রিজন ভ্যানে
এই তো স্বদেশ স্বাধীন স্বদেশ আমার দেশ'

(জবানবন্দি/অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ)

সমাজ-সচেতন কবিতা বলতে অনেকে শুধু আলো-উজ্জ্বলতা, আশা-উদ্দীপনা মজুর কৃষকের প্রতি দরদি মনোভাবাপন্ন এক ধরনের আশাবাদী কবিতাকে বোঝেন, কিন্তু জীবনে যেমন আলো আছে, অন্ধকারও আছে, প্রত্যাশা ও হতাশা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, সংকল্প ও তার বিচ্যুতি—সবই সত্য। তাই, কবি কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠককে যেমন আশায় উদ্দীপ্ত করেন তেমনি বিশ্বাসভঙ্গের হতাশাকে প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। 'কমরেড'-কে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতায় তাঁর এই দ্বিধাদীর্ণ মনের পরিচয় পাই—

কী করে তাকাবো আমি কোন্ দিকে বিশ্বাসের রুমাল ওড়াবো?...
.....
কমরেড
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে যায়
আলোর ত্রিকাল ধাড়ে থাকা
স্বপ্নমুখ ভালোবাসা সে সময় স্মৃতি হয়ে ঝরে
স্মৃতিতে তখন শুধু দোলে

ভোরের গলানো গিনি কী করে কেমন করে যেন
অন্ধকারে এক পা এক পা আধো হাঁটি হাঁটি ভুবনডাঙার'।

বিশ্বাসহীনতার মধ্যে, ভুলভ্রান্তির মধ্যেও কবি কমরেডকে সান্ত্বনা দেন এবং দেখান ভালোবাসার স্বপ্নমুখ্য আর অন্ধকারে এক পা এক পা করে উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে চান। কবি নিজেও এই কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন, 'লোককবিতার তাজা জীবনবোধের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প পরীক্ষার উচ্চতর কৌশল কবির হাতের মুঠোয়। পতনের জগতেও বেঁচে থাকার আশা তাঁরা হারান না। রক্তময়তার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত স্পপ্ন দেখেন ভবিষ্যতের। উজ্জ্বল সম্ভাবনার।'

এইভাবে আনন্দেবিষাদে, ভালোবাসায়-ঘৃণায়, দুঃখে-অন্ধকারে মানুষের বিপুল মিছিলকে সঙ্গে নিয়ে অনুভূতি ও অভিন্নতার উপল খন্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর এই যাত্রা।

'আত্মপ্রতিকৃতি' (অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ), 'দশ বছরের তাঁবু' 'বত্রিশ বছরে', 'ইচ্ছামতী', 'মুখ', 'স্বপ্নভূমি', 'বাঘের থাবার নিচে' প্রভৃতি-কবিতায় তাঁর বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি ও সংগঠনী চেতনার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। সংঘাত বিক্ষোভে এক দ্বন্দ্ব দীর্ণ জীবনের দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৪-তে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' থেকে ১৯৮২-তে 'বাঘের থাবার নিচে' কাব্যের প্রকাশকাল পর্যন্ত তাঁর কবিজীবন ছিল গভীর উদ্দীপনাময়।

'বাঘের থাবার নিচে' কাব্যের সতেরো বছর পর ১৯৯৯ সালে বেরুলো তাঁর নতুন কাব্য। 'নীরব সন্ত্রাস' এই বইয়ে তিনি কবিতার অন্য এক নতুন জগৎ খুঁজে পেলেন। একজন শক্তিশালী, প্রথম সারির কবিরূপে গণেশ বসুর পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। যে বমপন্থী রাজনীতি তাঁর কাছে হাতের তালুর মত আদর্শ নিয়ে ছিলো, সেখানে দেখা দিল নানা বিচ্যুতি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অন্ধকার চোরাগলিতে মুখ লুকালো। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসারত্ব তাঁকে পীড়িত করলো। ক্ষোভে দুঃখে কবির এক অসহনীয় যন্ত্রণা আর্তনাদের মত আমাদের হৃদয়ে আলোড়িত হয়ে উঠলো, আমরা শুনলাম 'এভাবে কি বাঁচা যায়? একে কি জীবন বলো তুমি? নীরব সন্ত্রাস চলে চরাচরে, মাথার ভিতরে দ্রোহ, জালা। গূঢ়তর অভিমান, পায়ে পায়ে শিকলের শব্দ জাগে পরতে পরতে ভালোবাসা ভেঙে ভেঙে মেঘের বিষাদ বাজে কাঁদে/ একা একা হাহাকার দিনগুলি, বান্ধববিহীন। (নীরব সন্ত্রাস)

'নীরব সন্ত্রাস চলে চরাচরে, মাথার ভিতরে দ্রোহ, জ্বালা' এই পঙ্‌ক্তির ভিতরে সময় তাঁর কবিতায় যাথাযথভাবে উঠে এলো। তিরিশ/চল্লিশ দশকে বাংলা প্রগতি কবিতার যে ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল তা ছিলো প্রচলিত ধারার অনুবর্তন;

পরবর্তীকালে কবিরা এলিয়ট, পাউন্ডের কাব্যের কাছে ঋণ স্বীকার করে এই ধারাটি সচল রাখেন, কিন্তু ষাটের দশকে গণেশ বসু কারও কাছে ঋণ স্বীকার করে নয় পারিপার্শ্বিকের প্রবাহে সমাজ সচেতনার পথ বেয়ে প্রগতি কবিতার ধারাটিকে বাংলা কবিতায় বহমান রাখলেন। অগ্রজ কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের কাছে মনোবেদনা জানিয়ে বললেন—

'একদিন ছিল আমাদের দিন ঝড়ের মুখ
একদিন ছিল আমাদের দিন অন্ধকার
চারদিক থেকে তাড়া করে আজ নষ্টদিন
একদিন ছিল আমাদের দিন অলংকার'।

'একদিন ছিল আমাদের দিন অলংকার'— অলংকারময় সুন্দর দিনগুলো কেন ভীষণভাবে অবাঞ্ছিত হয়ে গেল? কোন্ হার্মাদের আক্রমণে জন্মরোমান্টিক কবির স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল? কবি সেই সমাজবিরোধী লুম্পেনদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেও ভয় পান না; নিঃসঙ্কোচে বলেন 'লুম্পেন এসে ফালাফালা করে অন্তঃপুর'।

এই বইয়ের অন্যতম সেরা দীর্ঘ কবিতা 'খরা'। খরা কীভাবে প্রকৃতি থেকে মানুষের মনে ও চারপাশের জীবনে ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখিয়েছেন বলেছেন— 'খরার ভিতরে আমি খরা হয়ে এখন ঝিমোই।' বলেছেন মেধা নেই, মেধার ভিতরে আজ খরা/বোধ নেই বোধের ভিতরে আজ খরা।' প্রকৃতি থেকে এই খরা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে— 'এখন খরা/ইথিওপিয়ার বুকে...এখন খরা/বাকরুদ্ধ ওড়িশার আরশিনগর'। আফ্রিকা, ওড়িশা থেকে এই খরা আমাদের চারপাশে বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনল— 'এখন এদেশে খরা, গ্রহণের ছোঁয়া লাগে সৃষ্টির শিকড়ে/এখন এদেশে খরা কবিতা সংগীত ছবি হাজামজা ডোবা/শুধু বালি/শুধু বালি/বালির সংসার'। মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও ভালবাসাতেও এই খরার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল—

'এখন খরা
আমাদের অক্ষরে অক্ষরে
বোধে
বোধিতে
ভালবাসায়'

এবং অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে কবির জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়—

'খরার ভিতরে আমি খরা কেন? দেশজোড়া খরা'! কবির এই গুরুত্বপূর্ণ 'খরা' কবিতাটি আমাদের এলিয়টের 'The Waste Land' কবিতায় মর্মার্থের দিকে

টেনে নিয়ে যায়। এলিয়ট 'Waste Land'-এর চিত্রকল্পে বর্তমান সন্ধ্যাযুগকে দেখেছিলেন, আর কবি গণেশ বসু দেখেছেন 'খরার' চিত্রকল্পে। নিঃস্ব, রিক্ত খরার এই রূপ যেন সৃষ্টি সম্ভাবনাহীন যুগেরই প্রতিবিম্ব। খরার আগমনে চতুর্দিকে শুষ্কতা, রুক্ষতা, প্রাণহীন পৃথিবীতে জীবনের ক্ষয়িষ্ণু রূপকে দেখলেন, দেখলেন চতুর্দিকে নেতির হাহাকারে—

'নদীও ফেরায় মুখ, নদী নেই নেই...
মাটির গভীরে নেই জল
প্রাণের শিকড়ে নেই জল
জল নেই চোখের দু-কোণে
বৈরাগী বৈশাখী মেঘ ভেসে যায়, উড়ে চলে যায়
প্রান্তরে প্রান্তরে কালো ছায়া নামে জল নেই, নেই...
.....
এখন পাথর
সবই পাথর হয়ে গেছে'

এলিয়টের ভাষায়—

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road

এলিয়ট ওয়েস্টল্যান্ডএর শেষে বর্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, কবি গণেশ বসু এক সর্বনাশা সময়ের বুকে বসে যুগের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন—'হারিয়ে যায়/ আপন করতে করতে হারিয়ে যায় হারিয়ে যায়/ প্রজ্ঞা বোধ ভালোবাসা'। 'হারিয়ে যায়' শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগে সব হারানোর এক সার্বিক ধ্বংসের রূপ তুলে ধরলেন যুগের প্রতিবিম্বে। একজন সমাজসচেতন কবি নেতিবাদী দৃষ্টিতে হলেও তিনি যেভাবে দেশকাল সমাজকে দেখেন তাতে তাঁর প্রজ্ঞাশাসিত চেতনাই প্রতিফলিত হয়। এখানেও তাই হয়েছে।

মার্কসবাদে দীক্ষিত এই কবি দার্শনিকভাবে কবিতাকে জগৎ ও জীবনকে পাল্টানোর সপক্ষে উন্নত চেতনার একটা শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই অবস্থান থেকে স্থানচ্যুতি কি এতই সহজ! বর্ণময় দশকের কবি 'বর্ণময় পৃথিবী'তে ফিরে এলেন' ২০১৩-তে। এতদিন তিনি যে বদলের জন্য সচেষ্ট ছিলেন তার একটা প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পেলেন এই কাব্যে—

'হঠাৎ হঠাৎ কেউ সকাল বেলায় কোনো সুন্দর বাগান হয়ে যায়।
লাফায় ঝাঁপায় নাচে শিস দেয় ডানায় ডানায় রূপকথা
এখনো মাটিতে শুয়ে পড়ি, ওকেলিয়া

বাগান জুড়েই কিছু কথকতা রূপটান লাল নীল হলুদ সবুজ
সুন্দর বাগনগুলি পৃথিবীতে দীর্ঘশ্বাস বিরহ বিষাদ।' (সুন্দর বাগান)

তিনি আরও দেখলেন—'এখনও অনেক কিছু স্বর্গে আর পৃথিবীতে রয়েছে উজ্জ্বল'। কবির এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মরমি হৃদয়ের উত্তাপে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে অণুকবিতাগুলিতে।

কবির দীর্ঘ কবিতার সাফল্য আমরা দেখেছি অনবদ্য 'খরা' কবিতায়ও তবে অণুকবিতায় তাঁর সিদ্ধিও যথেষ্ট। 'জীবনানন্দ' 'পড়ে থাকে', 'অনাথ', 'ঝরে', 'রোশনাই', 'স্বর প্রেমিকরা আজ', 'এ জীবনে', 'নির্যাস', 'মুহূর্তমঞ্জরি'র স্বল্প পঙক্তির কবিতাগুচ্ছ আমার অনুভূতির যথার্থতা প্রমাণ করবে। এই কাব্যে তিনি বাগবিস্তৃতির কাটছাঁট করেছেন, তাঁর বাচন হয়ে উঠেছে সংহত, রাজনীতির অভিঘাত তত তীব্র না হলেও, স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি ছড়িয়ে আছে মণিমুক্তার মত (ভালবাসা শেষ নিঃস্বাস ফেলে/বিয়ের পরে), (পৃথিবী টলিয়ে দেয়, পৃথিবী সুন্দর করে ভালোবাসা। অনুশোচনাও), ক্ষমতার কাছে গেলে কবি আর কবিই থাকে না।) ইত্যাদি। বদলে গেছে তাঁর বিষয় ভাবনা, গদ্যকবিতার পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে অনাস্বাদিতপূর্ব অন্ত্যমিল— 'কী করে আর এ-হাতে আমি ও হাত ধরে রাখি/এখন ভাবি স্বপ্ন বুনে ভুল করেছি না কি'। বলা যেতে পারে ইতিপূর্বে গণেশ বসুর কাব্যে এই ধরনের উচ্চারণ অপ্রকাশিত ছিল, তিনি এই কাব্যে নতুন এক পাঠ অভিজ্ঞতায় আমাদের সমৃদ্ধ করলেন। শুধু ষাট দশকের নয়, এই সময়ের এক প্রধান কবির সম্মান দিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

অপাত তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'বলগা হরিণের শিং': বেরিয়েছে মার্চ ২০১৫-তে, প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থটিতে অণুকবিতা, গীতিকবিতা ও দীর্ঘ কবিতা মিলিয়ে ২০০টির মতো কবিতায় কবিতার এক মহাভোজ পাঠকের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া গ্রন্থশেষে কবিতায় উল্লেখিত বেশ কিছু শব্দের টীকা, স্বীকৃতি ও মন্তব্য রয়েছে (যা আমরা এর আগে এজরা পাউন্ডের 'ক্যান্টোজ' এবং এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যে পেয়েছিলাম)। ফলে তাঁর কবিতা বোধ্যতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শুধু তাই নয়, এর থেকে কবির মন ও মননের ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করা যায়। তবে এইসব অনুষঙ্গের ব্যবহারে তিনি কবিতাকে নিয়ে গেছেন বৌদ্ধির স্তরে। কবির বাণী নিছকই কবিতা হয়ে থাকছে না, পাঠকের বোধবুদ্ধি যদি কবির অনুশীলনের উচ্চতায় পৌঁছতে না পারে তবে কবিতা দুর্বোধ্য হতে পারে; যেটা বিষ্ণু দে-র কবিতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাঙালি পাঠকের ঘটেছে।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকে কবি যে ছ'টি পর্বে ভাগ করেছেন আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তা দেখে নিতে পারি—

(ক) পর্ব ১, ৫ ও ৬— মানুষ ও রাজনীতি
(খ) পর্ব ২ — প্রেম
(গ) পর্ব ৩—দীর্ঘ কবিতা
(ঘ) পর্ব ৪—মৃতুচেতনার কবিতা

বিষয়ানুসারে পর্বগুলি সাজানো হলেও অন্যরকম ভাবনার কবিতাও এর মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি।

কাব্যের শুরুতে পর্ব ১-এ রয়েছে এক থেকে চার পঙক্তির মধ্যে লেখা উনিশটা অণুকবিতা। এই অণুকবিতাগুলি একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ভাবনাকে অবলম্বন করে স্বল্প পরিসরে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'অন্ন' কবিতায়—

'কবিতা আমার অন্ন
আর সে অন্ন প্রত্যহ চাই প্রতিটি লোকের জন্য'!

এইভাবে 'শান্তি', 'আমেরিকা', 'শাসকহৃদয়', 'সিবিআই', 'এ দেশ দুড়ে', 'উন্নয়ন', 'পুলিশ' ইত্যাদি কবিতায় বর্তমান জীবন সংগ্রাম পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রশাসন নিয়ে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে।

কবির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কবিতা পর্ব-১ এর বেশ কিছু রচনায় পেয়েছি, যেমন—

এখানে যাবার আগে বলেছিলে, কারও কথা নিষিদ্ধ হবে না,
অথচ তা হ'ল। ওখানে যাবার আগে বলেছিলে, মুক্তি দেবে স্বপ্নব্রতীদের!
অথচ হ'ল না। ওখানে যাবার আগে বলেছিলে, স্বচ্ছতাই তোমার প্রতীক।
অথচ কী হ'ল? ওখানে যাবার আগে বলেছিলে, রাস্তা শুধু তোমার ঈশ্বর।
অথচ কী হ'ল? সময় নির্মম বড়ো মানুষ পাথর নয়, অথবা খড়ের।
(মানুষ পাথর নয়)।

প্রশাসনের চ্যুতি দেখাবার জন্য গোটা একটা কবিতাই তুলে ধরতে হলো। বাক্‌স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ প্রশাসন, প্রশাসনে স্বচ্ছতা নিয়ে যে সমস্ত গালভরা কথা নির্বাচনের আগে নেতাদের মুখ থেকে শোনা যায় তা যে রক্ষিত হয় না কবি তা প্রকট করে তুলেছেন। কবির কাজ তো এটাই, আর একজন দায়বদ্ধ কবির কাছ থেকে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ক্ষমতা মানুষকে কীভাবে বিবর্তিত বা পরিবর্তন করে দেয় তার কিছু নিদর্শন আমরা এই পর্বের কবিতায় পেয়েছি— যেটা 'নির্বাচন এসে গেলে', 'সংবিধান', 'অনাথ পুতুল', 'সমাধান', 'স্বচ্ছতা বনাম চর্মরোগের আঁতুড়', 'শিরদাঁড়া'। তাছাড়া নির্বাচনে কারচুপি প্রশাসনের ভণ্ডতাকেও তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখান—

‘স্বপ্ন : ইভি মেশিনেরা শাসকের কথামত অনুগত থেকে যায় অথবা থাকে না। সুভাষণ দিতে দিতে ক্লান্ত হয় সোনার পাথরবাটি নিরপেক্ষ কীর্ণ কমিশন

রাজনীতি সচেতন এই কবির কাছে আর কিছুই গুপ্ত থাকে না, স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে নির্বাচনের কারচুপি এবং তা ঢাকতে ‘কীর্ণ কমিশন’ও কবির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। কবির ভাষা খোলা তরবারির মত ধারালো হয়ে আঘাত করে—

‘ভোট যুদ্ধ শব্দবন্ধ ক্লিশে হতে হতে আর তরঙ্গ তোলে না। গণতন্ত্র অন্ধকারে শুয়ে থাকে, বীজাধার শুকিয়ে গিয়েছে। বিশুদ্ধ গোলাপও আজ মন্থর মেঘের মতো আহত বেড়ার ধারে পড়ে। (নির্বাচন ২০১৪)

যে গণতন্ত্র নির্বাচনের নিরপেক্ষতার ওপর নির্ভর করে তার বীজাধার শুকিয়ে গেছে ফলে শুকনো গোলাপের মতো তা বেড়ার ধারে পড়ে থাকে। উপমাটি যথার্থ!

পর্ব ২-এর নামকরণ করেছিলাম ‘প্রেম’ পর্ব বলে। কবির প্রথম কাব্য ‘বনানীকে কবিতাগুচ্ছ’-তে রোমান্টিক প্রেমের যে উৎসরণ দেখেছিলাম তা এখানে নেই। তখন কবির বয়স ছিল চব্বিশ অর্থাৎ প্রথম যৌবনের প্রেমের কবিতায় যে আবেগ ও উন্মাদনা ছিল তা অন্তর্হিত। কবি এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁছেছেন; স্মৃতি ও অন্তরঙ্গ অনুভূতির সংবেদনার এই প্রেমের কবিতার সৃষ্টি; কত অনায়াসে তিনি বর্ণনা করেন প্রথম দেখার স্মৃতিকে—

‘পার্কে যখন প্রথম দেখি ভোরের শিশির ঘাসের ডগায় তুমি’

অর্থাৎ ঘাসের ডগায় ভোরের শিশিরের মত সেই দেখা দিল পবিত্র, নির্মল ও মালিন্যহীন; পরবর্তীকালে প্রেমের সেই বাগান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কবির হৃদয়ে—

‘তুমিই ঠিক আমার বুকে বাগান হয়ে আজও।’ কত সহজ সাবলীলভাবে প্রেমের আর্তিকে প্রকাশ করলেন কবি। এই প্রেম কবির একাকিত্বে ভরসা দিয়েছে, ডাইনে বাঁয়ে আলো দেখিয়েছে এবং তাতে বিষণ্ণতার ভাব গেছে কেটে, প্রেমের মুক্তিদায়িনী ঐশ্বর্যময় রূপের এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন কবি—

‘অন্ন, জল, গানের সুর যা কিছু পাই
তুমিই সেই;
অশ্রু, হাসি, মাতৃভাষা, তত্ত্বসার
তুমিই সেই’!

ভালবাসার ব্যাকুল আগ্রহে প্রেমিকার কাছে জীবন-মৃত্যুকে সমর্পণ করেছেন। প্রেমের এই আত্মবিস্মৃত রূপ থেকেই তিনি বলে ওঠেন—

‘আমার বাঁচা, মরণ, স্মৃতি সকল ভার
তুমিই বও
যেখানে তুমি যাও না কেন আমার পাশে
তুমিই রও (তোমার জন্য)’।

এই প্রেম ও নির্জনতার কবি অবশেষে এসে মিশলেন জনতার কল্লোলে; সমাজচেতনায় উত্তীর্ণ হলো তাঁর কবিতা। জীবন ও মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা তাঁর সত্তার শিকড়ে মিশে ছিল; পূর্বে উল্লেখিত ১,৫ ও ৬ পর্বে এসে আমরা গণেশ বসুর কবিতায় মানুষ ও রাজনীতির কথা বড় বেশি স্পষ্টভাবে পাই, এই রাজনীতি অবশ্যই বামপন্থী রাজনীতি; বাংলা কবিতায় এই রাজনীতির ধারাটি বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ এবং তরুণ সান্যালের কবিতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ক্রমশ শুষ্ক হয়ে আসছিল, গণেশ বসু তাকে উজ্জীবিত করলেন। তবে, তিনি শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্বের কথা বললেও পুরোদস্তুর পার্টিলাইনের কমিউনিস্ট নন। ‘রাজনীতির বাঁদিকের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে’ আত্মসচেতন কবি মানবতার জয়গান করেছেন; এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মার্কসীয় দর্শন—

‘শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্ব চিরকাল ছিল
থেকে যাবে ততদিন যতদিন মানুষ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়’।

তিনি সমাজসচেতন, তার সঙ্গে আত্মসচেতন কবিও। সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তাঁর কবিতার বহুমুখিনতা নিয়ে কবি নিজেই বলেছেন—

কেউ কেউ অভিযোগ এখনও করেন
আমার কবিতা নকি সময়ের অদ্ভুত খোরাস
ভাঙাচোরা কণ্ঠস্বর সমাজতন্ত্রের
ক্রুয়েল ভার্সন
অবশ্য এটাও জানি কবি ও কবিতা নিয়ে অনেকেরই
মাথাব্যথা নেই
এবং ভালোই জানি আমি
মেনে নিতে কেউ কেউ আমাকে পারেনি
অগ্রজেরা
অনুজেরা
কোনো কোনো সমান বয়সী’।

সমালোচক অরুণ সেনের মন্তব্যে আমরা এই উদ্ধৃতির সমর্থন পাই। ‘বিষ্ণু দে-র কথা’ বইটিতে অরুণ সেন বলেছেন, ‘এ তো সেই কবিতা, যা প্রত্যক্ষ

কথনের কবিতা নয়, অথচ সমাজসচেতনারই কবিতা।... এই দুই বিপরীতের মিলন যেখানে সত্য সেখানে পাঠক জোটা মুশকিল।... তাই মাঝামাঝি কোনো ভোক্তা প্রায় নেই।'

গণেশ বসুর কবিতার একটা মূল ব্যাপার হলো সমকালীন জীবনের সঙ্গে দেশ ও কালের রাজনীতি ও সমাজের প্রতিধ্বনি। তাঁর কবিতার সঙ্গে দেশকালের সংযোগ মাঝেমাঝে এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তা অনেক সময় বিদ্রুপাত্মক হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষের নিঃস্ব রাজনীতিকে ক্ষুরধার বক্তব্যে প্রকাশ করেন—

'তরতাজা ফলের মতো
আমাদের প্লেটে
সংসদের শোভা বাড়ে
সাংসদ মানেই
একালের রাজা-মহারাজা,—
বেতন আকাশ ছোঁয়
ভাতা
বহমান স্রোত;
অগণন তদন্ত কমিটি
কমিশন-ও ঢের।
মানুষ কি চিলে কোঠা শুধু?

কোনো আলোছায়ার প্রদোষ রাখেননি কবি; খুব স্পষ্ট ও রূঢ়ভাবে সাংসদদের রাজকীয় সম্মান এবং বহমান স্রোতের মত তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ভারতবর্ষের মত একটা গরিব দেশে, যার এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে— তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন কবি।

আমরা এমন একটা আশ্চর্য সময়ে বাস করছি যে কর্পোরেট পুঁজি এখন সব কিছুর নিয়ামক সংস্থা হয়ে উঠেছে। এই কর্পোরেট পুঁজি চারুকলা, কারুকলা থেকে শুরু করে গণতন্ত্র, সংবিধান, মন্ত্রী, আদলত সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্ষমতার সেই বহুরূপী মুখের অনুসন্ধানে কবি জানতে পারেন—

ক্ষমতার মুখ
বরাবর বহুরূপী, আদ্যোপান্ত অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতক।

শিকড় চারিয়ে গেলে ক্ষমতাই স্বেচ্ছাচারী আকাশগঙ্গায়।
শিকড় চারিয়ে গেলে একদা সুহৃদ যেন পুরনো পেরেক,
স্যাণ্ডেলের স্ট্রাপ।

দেশের এই রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটকে তিনি ব্যক্তিগত বোধে রূপান্তরিত করেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই সংকটের মধ্যেই তিনি আবিস্কার করলেন এক স্বতন্ত্র নিজস্ব উচ্চারণ, অনেকটা পুঁথির মতন আড়াআড়ি সাজানো; এর আগে বাংলা আধুনিক কবিতায় দেখা যায়নি। শুধু আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট নয়, ভাষাও সহজ, সরল ও মৌখিকভাবে উচ্চরিত; অনেকটা আক্ষেপ নিয়ে তিনি বলেন—

'কার জন্য লিখে যাবো? কারোর কাছেই কিছু বলার মতন নেই, অথবা করার মতো কিছু নেই দেশের জন্যেও।/ কিছু কি করার থাকে শীতল বন্ধুতা নিয়ে, অথবা যখন কেউ প্রত্যাখ্যান করে যায় বারেবারে রহস্যময়তায়?/ আমার কিছুই আর এখানে করার নেই তুষার চাদরে, ঝরা পাতাদের ভিড়ে, কিংবা ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান হানায়; কিছুই করার নেই জিমে, ব্যাঙ্কে, পোস্টাফিসে, রেস্তোরাঁয়, নাচের আগুনে, বারে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, শপিং মলেও / কিছুই করার নেই ব্যানারে পোস্টারে কিংবা ফেসবুকে, শিরোনামে শিরোনামে, ব্রেকিং নিউজে কিংবা সাঁঝের তরজায়।

'কিছুই করার নেই। কার জন্যে লিখে যাবো এ সময়? তুমি কি কখনো লেখা ভুলেও পড়েছো বলো পিত্তল প্রতিমা? / কিছু দুঃখ বরাবর ছিল বুকে, অনুযোগ-ও ছিল কিছু, দোষারোপ কখনো করিনি তবু, দুজনেই সময়ের চোখ।

লেখা ছাড়া কিছুই করার নেই নিরন্তর উপেক্ষায়, লিখে যাবো ততদিন যতদিন মৃত্যু এসে থাবা না বসায়!' (কিছুই করার নেই)

একজন কবির লেখা ছাড়া কিছুই করার নেই। তার অনুভব উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা এই লেখার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। 'লিখে যাবো ততদিন যতদিন মৃত্যু এসে থাবা না বাসায়' ক্রমশ মৃত্যুচেতনা ঘনিয়ে আসছে কবির মনে। বিদায় চাইছেন এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা থেকে। 'যেতে দাও'

কবিতায় এই বিদায়ের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

'এবার তুমি আমাকে খেতে দাও।
স্মৃতিই থাক, রবে না তুমি একা,
হতেও পারে তারার ভিড়ে দেখা
তাহলে প্রিয় বিদায় দিয়ে যাও
ভেবো না আর, হাতেতে হাত নাও।'

'তাহলে প্রিয় বিদায় দিয়ে যাও'—কবির এই স্বস্থচেতনা হতাশা জনিত নয়, বরঞ্চ জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি ও আমরণ থেকেই এসেছে।

এখন আমরা যে পর্বে এসে পৌঁছেছি সেই পর্বটির অধোনাম দিয়েছেন কবি মহাভাষ বৃদ্ধাশ্রম বিস্মৃতিই অজেয় আশ্রয়'। মধ্যবয়স অতিক্রম করে প্রৌঢ়দের

সঙ্গে সন্ধি করে তিনি এক নতুন পথের সন্ধান করছেন। দেখছেন 'মানুষের পরিচয়ে মানুষ এখানে বেঁচে নেই'; ভিড়ের ভিতরে আমি মিশে গেছি, পায়ে পায়ে মিছিলে মিছিলে সমাবেশে নানান পার্কের বেঞ্চে বসে বসে মেরে গেছি রাজা ও উজির,/রক্তিম এলাকা চুঁড়ে খেতে খেতে আচমকাই থালাপিটোনায়', কলকাতা শহর নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'নিজেকে উধাও করে দিতে কাজে লাগিয়েছি শহরের অলিগলি সমস্ত সড়ক/চৌষট্টি বছর ধরে লুকোচুরি, আসা-যাওয়া, গাজনের সঙ সাজি যখনতখন (কলকাতায়), 'বিদায়বেলায় এসে বন্ধুতার মর্ম বোঝে বয়স, পাথর- ও' 'এখনও বাড়ায় হাত কেউ কেউ, অন্ধকারে খুলে যায় চোখ'। (অবিনাশী উষ্ণতার স্মৃতি), 'মরেও মরে না আশা, এইখানে এই ঘরহারাদের মাঝে। আমাকে চেনে না কেউ, জানে না কোথায় আমি যেতে পারি, যাবো শীতের পাখির মতো।' (বসন্তে), 'ভারতে বেড়াতে এসে ক'জন মার্কিনি বন্ধু কানে কানে দাবি করেছিল/আদতে তারাও ভারতীয়/এদেশে শিকড় ছিল শ-দুয়েক বছরেরও আগে' (ক'জন মার্কিনি বন্ধু), 'বৃষ্টির ভিতরে গাছ হেঁটে যায় একা একা নিজের মেজাজে', 'ছায়ার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি একা একা কার্তিকের রাতে।'/লাশকাটা ঘর থেকে তিনিও এলেন ফের' (কবি)। 'শুভব্রত ঘুমোতে পারেনি সরারাত/ বান্ধবীও চলে গেছে বিগত দুপুরে (শুভব্রত), 'ঘুমিয়ে রয়েছে নদী, ছোট ছোট নদীগুলি বরফেই মুড়ে' (ঘুমিয়ে রয়েছে নদী), 'ঘুরে ফিরে বিষ্ণু দে'র দেখা পেলেন— 'কয়েক বছর আগেই যদি বাতাস হয়ে যান/রাতবিরেতে শিকড় তবু নাড়িয়ে দেন কে/ঘুম আসেনা, আড্ডা জোড়েন চিন্তা চেতনায়/মধ্যবুকে কবির কবি আছেন বিষ্ণু দে'— এইসব অবিনশ্বর পঙ্‌ক্তি ছাড়া পেয়ে গেলাম আরও কিছু যুগ্মকে কবির উচিত ছিল এই সব স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির অণুকবিতা নিয়ে আরও একটি পুস্তক প্রকাশ করা— 'এক মৃত্যু, একান্ন পাথুড়ি শিরোনামে—

(ক) 'ভালোবাসা মুহূর্তের মদ
মৃত্যুই ঈশ্বর যদি মৃত্যু ধ্রুবপদ' (১)
(খ) 'যাবার সময় এসে গেছে, যেতেই আমি চাই
মিথ্যে তো নয় ঘাসের চুড়োয় শিশির হয়ে যাই (৮)
(গ) 'বড়ো ভালোবাসে বড়ো কাছে এসে নিয়ে যায় শেষে
মৃত্যুর মহাদেশে' (৯)
(ঘ) 'কালের কলস পূর্ণ কখনো কি হয়?
প্রতিটি মৃত্যুই তাতে এক বিন্দু অশ্রু ছাড়া বেশি কিছু নয়' (১৩)
(ঙ) 'মৃত্যু ছাড়া সত্য কিছু নেই

ভবিতব্য পদ্মপাতাতেই। (৫০)

পরিশেষে আমরা দেখলাম, তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'নিজের মুখোমুখি' থেকে মধ্যপর্বের 'নীরব সন্ত্রাস' পর্যন্ত সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি কেমন ছাপ ফেলেছে। দেখলাম নাগরিক শিক্ষিত মানুষের ক্লিন্ন অস্তিত্ব ও দুঃস্থ মানসিকতার সংকট এবং সেই সংকট পেরিয়ে মার্কসবাদী আত্মসমীক্ষা ও মনের সক্রিয়তা। সাম্যবাদী চিন্তা যে সবসময় ঠিক পথ দেখায় তা নয়— চিন্তার যান্ত্রিকতাও বিভ্রান্ত করে মানুষকে। এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে গড়ে ওঠে কবির কবিতার ভাষা, তার স্বতন্ত্র শব্দ ও বাকপ্রতিমা। ভাষার নিজস্ব আধুনিকতায় পৌঁছোনোর এই নিশ্চয়তা সবচেয়ে প্রবল ও তীব্র হয়েছে 'অথ মেষতন্ত্রকথা', 'চো চোখ রেখে', 'দাঁড়াও পথিকপবর' এবং 'আলোকস্তম্ভের মতো' ইত্যাদি দীর্ঘ কবিতায়।

বলতে দ্বিধা নেই 'বল্‌গা হরিণের শিং' কবি গণেশ বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার বই এবং এই বইটি আধুনিক বাংলা কবিতায় পরীক্ষানিরীক্ষার অভিনব স্বর, মূল্যবান সংযোজন।

মনন ও আবেগের সমন্বয়

গোপা দত্ত ভৌমিক

'যা শিষ্ট গীতগোবিন্দে, তারই একরকম প্রাকৃতরূপ, বা চাষাভুষোর রূপসাধনা সহ কায়াসাধনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। তারপরেও তো বিদেশি আক্রমণ। লৌকিক শ্রীরাধাকৃষ্ণ ক্রমশই সুফি প্রেমিক-প্রেমিকা, শিরিন-ফিরহাদ, লায়লা-মজনু, জুলেখা-ইউসুফ ইত্যাদির লীলায় মিলেছে। হয়তো গেয় চর্যা কাওয়ালির চেহারা ধরেই একদিন অর্জন বর্জন করে বাংলা কীর্তনের রূপ পেয়েছে। রাগাত্মিকা লীলারঙ্গে বৈষ্ণব কাব্য তো আছেই। বৌদ্ধ নির্বাণতন্ত্র তিব্বতী দশমহাবিদ্যা আশ্রিত রূপ নিয়েছে কাপালিক তন্ত্রে। কালী উপাসনাও বিস্তার করল জাল। কিন্তু সেই ভয়ংকরীকেও রাজশক্তি ও ঠগি ডাকাত-লুঠেরা জমিদারের চণ্ডশক্তির বিপরীতে শ্যামামূর্তিতে গড়েছে বৈষ্ণব মিথস্ক্রিয়া। কালী ও কালা-র মধ্যে মিল পেয়েছে লৌকিক উপাসনা। বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পূজো পান মহানিশা ও রটন্তীতে শ্যামাদেবী। এরই পাশাপাশি বৌদ্ধচৈত্য বা স্তূপের স্মৃতিসহন অস্তিত্ব নিয়ে ঘটেছে পিরতন্ত্রী মাজার উপাসনা। লোক ভূমিকায়, পির রূপ পেয়ে যান বনবিবি ও তার ভাই জাঙ্গুলিতে।'

এই অনুচ্ছেদটি গণেশ বসুর চিন্তন বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলীর একটি ছোটো দৃষ্টান্ত রূপে উদ্ধৃত করলাম। লক্ষ্যণীয় তার পড়াশোনার ব্যাপ্তি, গভীরতা, চিন্তার মৌলিকতাকে প্রকাশ করার ধরনটি। পাণ্ডিত্যের গদাঘাত করা তাঁর স্বভাবে নেই, আবার জনপ্রিয় হবার তারল্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। এমন ভারসাম্যময় প্রবন্ধ খুব বেশি দেখা যায় না। আমাদের মিশ্রসংস্কৃতিকে তিনি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেন। সত্যনারায়ণ ও সত্যপিরের বদলাবদলির কাহিনি যেমন শোনান, বাঙালি হিন্দুবাড়ির মণ্ডপে ব্রাহ্মণের সংস্কৃত মন্ত্র আর বাড়ির মহিলাদের উঠোনের কোণে ব্রত উদযাপনে শূদ্রছন্দের ছড়া, ব্রতকথা পাঠের ছবি তুলে ধরেন। গণেশ বসুকে কবি হিসেবেই লোকে প্রধানত চেনে, কিন্তু কবিখ্যাতির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়। পদ্যরীতির মতোই গদ্যরীতিতে রয়েছে তাঁর জোরালো অধিকার। প্রবন্ধে সেই দিকটি তুলে ধরার সামান্য চেষ্টা রইল।

মতাদর্শে গণেশ বসু বামপন্থী, সেই তত্ত্বের ছাপ তাঁর রচনায় কোথাও অপ্রত্যক্ষ নয় কিন্তু শংসাযোগ্য এটিই যে, জবরদস্তি মত-ঘোষণা নয়, তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। ইতিহাসচেতনা ও কালচেতনা নিয়ে লিখতে বসে তিনি অনেকটা ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকদের পূর্বপক্ষ পরপক্ষের বিতর্কের ঢঙে প্রথম টয়েনবি, অসওয়ার্ল্ড কিংবা নিৎসের মতো আলোচনা করেন। সভ্যতা ও নগর এঁদের কারো কাছে সমার্থক, দাস ও শ্রমিকদের ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোই সভ্যতা। নগর ছাপিয়ে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রক্ষমতার চূড়ান্তে ইতিহাসস্রষ্টা পরাপুরুষ, সুপারম্যান। পশুসদৃশ মানুষরা তাদের সেবার জন্য দায়বদ্ধ, নারীও শুধু ভোগ্যবস্তু। এরপর একটি মর্মভেদী বাক্য উচ্চারণ করেন প্রাবন্ধিক, এই তত্ত্ব সমরতন্ত্র ও নাৎসি ফ্যাসিবাদকেও জন্ম দিয়েছিল।' কার্লাইলের অধিনায়কতত্ত্বকে তিনি পোস্টমডার্ন চিন্তকদের ভাবনায় দেখতে পান, 'কেউ কেউ ভেবেছেন প্রতিভাবান উন্মাদরাই ইতিহাসের সৃজন ঘটান। যেমন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ ইত্যাদি।'

বিপরীত মতকেও শ্রদ্ধা দিয়ে বিচার করেন গণেশ বসু! তারপর তিনি প্রবেশ করেন টাইমলেখ (সময় অতিরেক) এবং টেম্মোরাল (কালসম্পৃক্ত) এই দুটি দিক সাহিত্যে কীভাবে মিলে মিশে যায় সেই ব্যাখ্যায়। উল্লেখ করেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্ এর বিখ্যাত উক্তি, আমাদের ইতিহাস শুরুই হয়নি। বাস করছি ইতিহাস পূর্বকালে, প্রাক্ ইতিহাসে। যখন মানুষকে মানুষ শোষণ করতে পারবে না, তখনই ঘটবে ইতিহাসের শুরু।'

ঈশ্বর গুপ্তকে নিয়ে বাংলায় প্রবন্ধের অভাব নেই, কিন্তু গণেশ বসুর 'কবিতা ও সময়ের অঙ্গার' স্বাতন্ত্র্যে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। আমাদের সমালোচনার ধারার যে ক্লান্তিকর পণ্ডিতী রীতি— গণেশ বসু তাকে সাবধানে পাশ কাটিয়েছেন। তাই ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বৈদ্য সমাজের জীবিকাগত পার্থক্য লক্ষ্য করেন। হুতোম এবং গুপ্ত কবির ব্যঙ্গের আড়ালে আত্মধিক্কার তাঁর নজর এড়ায় না। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নক্সায় ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যেমন বলেছিলেন, ইংরাজের সহবাসে ভারতীয়রা আমেরিকানদের মতো হতে পারল না, মানে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই নিজেদের চিহ্নিত করেছেন, যাঁরা শিংটিও বাঁকাতে পারেন না।

গণেশ বসুর আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্তের একটি অন্য ধরণের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। ঠিক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তিনি নন, বরং চারদিকের ব্যাপার স্যাপার দেখে যাঁর মনে জেগে ওঠে পরিহাস রসিকতা। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে 'প্রভাকরে' তাঁর প্রগতিবাদী মতামত স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত, আবার তিনিই লেখেন 'যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে'

ইত্যাদি ব্যঙ্গ কবিতা। গণেশ বসু যথার্থ ধরেছেন ঈশ্বর গুপ্তের 'সাংবাদিম্মন্যতা'ই তাঁর মানসিকতার নির্ণায়ক। তাঁর স্ববিরোধিতাগুলিকে তাৎক্ষণিকতার দাবি দিয়ে দেখলে অনেকটা বোঝা যায়। অন্তরের গভীরে তিনি প্রাচীনের প্রতি টান অনুভব করেন, অসাধারণ এক-একটি কাজ রেখে যান ভবিষ্যতের জন্য— কবিওয়ালাদের জীবনী, ভারতচন্দ্রের বিষয়ে তথ্যগর্ভ রচনা, আবার নতুন যে যুগ আসছে তাকে স্বাগত জানাতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন। ইংরেজি শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তিনি প্রবল উৎসাহী ছিলেন। স্বদেশী ভাবনারও তিনি 'বলিষ্ঠ কলাকার'। দ্বিধা তো শুধু ঈশ্বরগুপ্তের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কি কম? একদিকে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে বলেন, 'খাঁটি বাঙ্গালি কথায়, খাঁটি বাঙ্গালির কবি'। অন্যদিকে ক্যালকাটা রিভিউতে ঈশ্বর গুপ্তকে শুধু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলে থেমে থাকেন না, অনায়াসে লেখেন, 'His work was extremely rude and uncultivated. His writings were generally disfigured by the grossest obscenity.' গণেশ বসু যখন এই পুরো ইতিহাসটি তুলে ধরেন, তখন তাঁর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের শ্রদ্ধা জাগায়। স্ত্রীশিক্ষা বা বিধবা বিবাহ নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতা আজও মুখে মুখে ফেরে। প্রাবন্ধিক পাশাপাশি তুলে আনেন কৌলিন্য প্রথার প্রতি গুপ্তকবির তীব্র আক্রমণ :

কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে।।
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে কত সেই।।
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু পাম যার।
পিতামহী সমনারী দারা হয় তার।।

গোটাটাই ঈশ্বর গুপ্তের কাছে ব্যভিচার। এক্ষেত্রে তিনি সহমর্মী, বিদ্রোহী। গণেশ বসু গুপ্তকবির কৌতুক রস সৃষ্টির মধ্যেও সহমর্মিতার কারুণ্য আবিষ্কার করেছেন, ছন্দের তালবাদ্যের মধ্যে :

দারা পুত্র হন্‌হনান্তি
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি
দিবে রাত্রি খেতে চান্তি
আমি ব্যাটা মরি খেটে।।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে গণেশ বসু আরেকটি বেদনা লক্ষ্য করেছেন, যা তাৎপর্যপূর্ণ, 'তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল জীবনযাপনে ও বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনায় গ্রাম শহরের বৈপরীত্য। এই বিরোধ তিনি মেনে নিতে চাইতেন না। বরং ভিতরে

ভিতরে কষ্ট পেতেন।...সামাজিক চৈতন্যে দীপিত কবির ইতিহাসবোধে নাগরিক মনস্কতার সঙ্গে অপসৃয়মান গ্রামীণ জীবনের যূথযাপনের জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল আজো অনেকে ঝরতে দেখেন, আর শোনেন লোক ঐতিহ্যের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ার নীরব শব্দ।' এই ব্যাখ্যার পটভূমিতে ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতারই একটা নতুনতর অর্থ পাঠক ধরতে পারে।

যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরাজি কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারি কি অন্ন পাবে।।

বস্তুত গণেশ বসুর এই প্রবন্ধটি প্রকৃত ঈশ্বর গুপ্তকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। নিজে কবি বলেই হয়তো কবির মনকে চিনতে তিনি পারঙ্গম, আমরা অন্য প্রবন্ধগুলিতেও তা দেখতে পাই। শুধু চণ্ডালিকা'র 'জল দাও' আর ঈশ্বর গুপ্তের 'দে জল দে জল বাবা'র ভাব সাদৃশ্য হয়তো একটু দূরকল্পনা।

'রবীন্দ্রনাথের কবিতার শিশু-ও বহু আলোচিত বিষয়, কিন্তু গণেশ বসুর প্রবন্ধে রয়েছে একান্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। প্রচলিত ভঙ্গিতে 'শিশু' দিয়ে নয়, তিনি আলোচনা শুরু করেন 'শিশুতীর্থ' কবিতার সূচনা 'The Child' দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের যীশুখ্রিস্ট বিষয়ক ধারণার পরিচয় দিতে বসে তাঁর মনে হয়, 'রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত এই যিশুই তাঁকে মানবশিশুর মহিমায় অভিষিক্ত করেছে। 'চলত চলত রামচন্দ্র, বাজত পায়জনিয়া'র তুলসীদাসও পেয়ে যাই 'তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া'য়। এক হিসাবে খ্রিস্ট ও রামচন্দ্র কি মিলে-মিশে 'রক্তকরবী'তে যায় না? ...আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁর আপন শিশুদের জন্য যা তিনি লিখেছিলেন সে সব তাঁর আপন শৈশব নিয়ে। এটিও খ্রিস্টিয় শিশুভাবনা। নির্মাণের বিশ্বে আছে সম্পদের ধারণা। শিশুই শিল্পের নিরিখে বালুর ঘর বানায়।'

রবীন্দ্রনাথের শিশু বিষয়ক কবিতাগুলি তিনি ঠিক কালানুক্রম মেনে আলোচনা করেননি। তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ কি ঠিক শিশুর চোখ দিয়ে শৈশবের পৃথিবীকে দেখেছিলেন? তিনি কি সেই জগৎকে দেখেননি পরিণত পরম বিকশিত ব্যক্তিত্বের অনুভূতি দিয়ে?' এই ধারণা সম্ভবত অনেকটা ঠিক। 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলির আলোচনা গণেশ বসুর কাছে প্রত্যাশিত ছিল। আমেরিকার বস্তুগ্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে কবির মনে যে গ্লানি জমে উঠেছিল, মনটাকে তার থেকে মুক্ত করতে তিনি স্নান করতে চেয়েছিলেন শিশুলীলা তরঙ্গে। এই স্নানের অভিজ্ঞতাই 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতা।

লক্ষ্যণীয়, গণেশ বসু 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলিতে পেয়েছেন শিশু ও কিশোরকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব। এই বিশ্লেষণ বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব জরুরি। বাঙালির শৈশব ও কৈশোরের ইতিহাসচেতনা ও মানবধর্মবোধ নির্মাণে 'কথা ও কাহিনী'র মূল্য অপরসীম। 'কথা ও কাহিনী'র প্রতি একধরণের তাচ্ছিল্য বুদ্ধিমানীমহলে লক্ষ্য করা যায়। গণেশ বসু এই ধরনের উন্নাসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

গানভঙ্গ, কবিতায় মেলে শিল্প অনুভবের শিক্ষা। তা শুধু শিল্পী নয়, শিল্প ভোক্তার সংযোগে এক বিশেষ দ্বন্দ্ব সমন্বয়েরও শিক্ষা। 'মস্তক বিক্রয়'-এ পেয়ে যাই গভীর মানবতায় উদ্বুদ্ধ রাজা যখন পরাস্ত হয় স্বৈরশাসকের কাছে, স্বৈরশাসকের আত্ম-অহংকারের দাক্ষিণ্যে সে-ও পরাজয় স্বীকার করে পরাজিতের মহিমার কাছে। এখানেই পেয়ে যাই মানুষের ভিতরের অন্তর্গত সত্য। এমনটা পাই, অন্যভাবে 'গানভঙ্গ'-এ। পাই 'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।' 'বন্দীবীর' কবিতাটির বহু স্মৃতিধার্য পঙ্‌ক্তির পর পেয়ে যাই এক বালকবীর 'গুরুজীর জয়' বলে পিতার হাতে ছুরিকাহত হয়ে, স্বৈরশাসকের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করে। এরকমই 'শ্রীমতী' স্বৈরশাসক ও তার অনুবর্তীদের প্রতিবাদে আত্মদান করে।'

আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে 'কথা ও কাহিনীর' চরিত্রগুলি কীভাবে প্রতিবাদ করেছে তার ব্যাখ্যা অসামান্য মনে হয় আমাদের।

নজরুলের ছোটোদের জন্য লেখা কবিতা আলোচনা করতে গিয়েও গণেশ বসু যথার্থভাবে লক্ষ্য করেছেন, বাঙালি শিশু সাহিত্যের উৎস মুখে ও রচনা চরিত্রে নগর-গ্রামের শ্রেণিবিভাজনও আছে। নজরুলের শিশু কবিতায় রয়েছে গ্রামীণ অ-ভিক্টোরীয় সহজ রুচির রচনা। 'একদা লেটোর দলে গান লিখিয়ে কবি নজরুল সহজ গ্রামীণ রুচিকে স্পর্শ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায় ছিলেন শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের। এক অর্থে অতি সাধারণ জীবন থেকে বিযুক্ত। এঁরা এক নতুন বাঙালি জীবন সৃষ্টি করে গেছেন। ... ল্যাং এর মতো শব্দ বা 'লিচু-চোর'-এর মতো দুরন্ত বালকের ছবি রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়-এ বিশেষ মিলবে না। এঁরা অনেক বেশি নাগরিক (আরবান) ও শিষ্ট (সফিসটিকেটেড্)। তাই, দু-ঘরানার শিশু কবিতায় আছে, দু-ধরনের সমাজের শিশুদের (এবং বড়োদের) কথা ও ছবি।'

মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে এক রিকশা চালক আমাকে একটি ছোটোখাটো পুষ্করিনী দেখিয়ে অবহিত করেছিল, এই পুকুর নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'বাবুদের তালপুকুরে' লেখা হয়েছে। সেদিন হেসেছিলাম। গণেশ বসুর আলোচনা পড়ে মনে হল, সেই সাধারণ গেঁয়ো মানুষটির কাছে

রবীন্দ্রকবিতা ঠিক সুবোধ্য হয়ে ওঠে না। বরং 'লিচু চোর' তার কাছে অনেক বেশি আনন্দদায়ক, তাই নজরুল-রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে প্রিয় কবিতাটির রচনার কৃতিত্ব বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতাকে দিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'কথা ও কাহিনী'র কবিতায় কিশোরমনের মাটিতে আদর্শের বীজগুলি সযত্নে পুঁতে দেন, তেমনি নজরুলও তাদের সাম্প্রদায়িকতার মুক্তমন্ত্রে দীক্ষিত করেন খুব সরল কথায়। গণেশ বসু 'পুতুলের বিয়ে' নাটিকাতে টুলি আর কম্‌লির চিরস্মরণীয় গানটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন।'

'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দুমুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবিশশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।'

ছোটোদের মনে মানবতাবোধ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন নজরুল, যাতে ভবিষ্যতে ধর্মের নামে কেউ তাদের বিভ্রান্ত না করতে পারে।

গণেশ বসু কীভাবে কবিতাকে দেখেন, জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধে তা স্পষ্টরেখ। সময়ের পটটিকে মেলে নেন কবি চৈতন্যের জন্মভূমি রূপে। কবিরা সময়ের সন্তান, নিজে কবি বলেই তিনি তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। জীবনানন্দ কি বারবার পালিয়ে গেছেন সমাজজীবন থেকে? তিনি কি আত্মহননেরই পথ দেখিয়েছেন আমাদের? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিংশশতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জীবনের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলিকে গণেশ বসু স্মরণ করেন। স্বচ্ছ ইতিহাসচেতনা তাঁর প্রবন্ধের মেরুদণ্ড তৈরি করে। জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :

'১৯৩২। প্রথম আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবি সম্মেলন ঘটে আমস্টারডামে—ফ্যাসিস্ত বিপদের প্রতিরোধকল্পে। ১৯৩৩। হিটলার হলেন জার্মানির চ্যান্সেলর। সন্ত্রাস সৃষ্টি। নাৎসিদের প্রতিবাদ করে ব্রেখ্‌টের স্বেচ্ছা নির্বাসন। এর দু-বছরের মাথায় প্যারিসে বুদ্ধিজীবিদের দ্বিতীয় সম্মেলন। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রাইটার্স ফর ডিফেন্স অফ কালচার এগেনস্ট ফ্যাসিজম্ গড়ে উঠল। ১৯৩৬। লন্ডনে বসল যেমন ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন, গ্রেফতার হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মাত্র ৩৭ বছরে লোরকার মৃত্যু, তেমনি নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকাশ। ১৯৩৭। ভারত থেকে বার্মা বিচ্ছিন্ন। বুখেনভাল্ডে নতুন বন্দিশিবিরের উদ্বোধন। সাংহাইতে জাপানের বোমা বর্ষণ। ১৯৩৮। কলকাতায় বসল নিখিল ভারত প্রগতি

লেখক সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৯৩৯। ইয়েটসের মৃত্যু। হিটলারের প্রাগ অভিযান, ফ্রাঙ্কোর মাদ্রিদ অধিকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ১৯৪০। হিটলারকে আশ্রয় করে চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিক্টেটার' চলচ্চিত্রায়ণ। লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ, জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফের জীবনাবসান। হিটলারের চুক্তিভঙ্গ, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ, যুদ্ধের মাত্রার পরিবর্তন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠিত। পার্ল হারবারে জাপানের বোমাবর্ষণ। ১৯৪২-এ ভারতছাড়ো আন্দোলন, সোমেন চন্দের শহিদত্ব, বনলতা সেন-এর প্রকাশ। ১৯৪৩। মহামন্বন্তর। দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধি! প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।'

এই তালিকাতে স্পষ্ট হবে লেখকের বিপুল ও গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক চেতনা এবং একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতি গভীর আস্থা। কিন্তু সেই আস্থা তাঁকে কখনো একদেশদর্শী করে না। কারণ তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন বিকশিত সমাজে, বিকশিত বামপন্থা যেমন দেখা যায়, তেমনি অবিকশিত সমাজে বামপন্থাও হয়ে ওঠে কখনো কখনো ক্যারিকেচার। একপেশে দলবল জনমনস্কতাকে বাতিল করে দেয়।

'তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাগিদে ইতিহাসের বিশেষ ব্যাখ্যাই যে সাহিত্য-শিল্প হওয়া উচিত, এমন দানবীর নির্দেশনামা বিশ্বপ্রগতিশীলতাকেও বহুমুখীনতাচ্যুত করেছে। জীবনানন্দকে ভিন্ন পক্ষে দেখাটাও ঐ নির্দেশনিষ্ঠারই ফল।'

এই মুক্তচিন্তার হাওয়াই গণেশ বসুর প্রবন্ধ পাঠের পুরস্কার। জীবনানন্দের কবিতায় কীভাবে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক ও অনিবার্য বিকাশ প্রখরতম মেধা ও বোধের সঙ্গে গভীরতম বোধে ও দার্শনিক আন্তরিকতায় মিলেছে, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন তিনি। যদিও 'বেলা অবেলা কালবেলা' তাঁর আলোচনার কেন্দ্রে, কিন্তু জীবনানন্দীয় কাব্যের সামগ্রিকতাও ফুটে ওঠে প্রবন্ধটিতে। আসলে ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে সময়ের নিষ্ঠুর ব্যাদানের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ যে আশ্চর্য উচ্চারণ করেছিলেন, তার সুরে কান পাততে গণেশ বসুর ভুল হয়নি।

'ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি।
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জল ঝর্ণার ধ্বনি।'

কবির লেখা প্রবন্ধের একটি বিশেষ ধারা রয়েছে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে। সবসময় যে তাঁরা কবিতারই আলোচনা করেছেন তা নয়। কথাসাহিত্য নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধাবলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু গণেশ বসু কবিতার আলোচনা করতেই ভালোবাসেন। সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও আসলে তাঁর

কবিসত্তাটিই প্রধান। সব সাহিত্যের সারাৎসার রূপে কবিতাকে তিনি আপন অনুভূতি ও বোধি দিয়ে পেয়েছেন। কীভাবে এই আশ্চর্য শিল্পরূপটি জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা। ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে'— তার রহস্যেই তিনি মগ্ন। কবিদের নিয়ে লেখা তাঁর সব প্রবন্ধই তাই আশ্চর্য সংবেদনশীল। তবে সেই গুচ্ছের মধ্যে তরুণ সান্যালেরর কবিতা নিয়ে লেখা 'বল্‌গায় রাবণরৌদ্র' অবিস্মরণীয়। একটি অনুচ্ছেদে তরুণ সান্যালের কবি-চারিত্র তিনি সংক্ষেপে প্রথমে ধরতে চেষ্টা করেছেন, কোথায় স্বাতন্ত্র্য তরুণ সান্যালের? 'কণ্ঠস্বরে কেবল নয়, জীবনদর্শনেও। স্বদেশ ও বিশ্ব, জীবন ও উত্তরণ তাঁর কবিতাকে করে তুলেছে ঋদ্ধ। রচনারীতিতেও রূপান্তর ঘটিয়েছেন বারবার।... কখনো নান্দনিক আনন্দে ঈশ্বরের মুখ দেখা, আবার পেয়ে যাই কখনো নারীকে শিষ্ট যৌনতা এবং সুন্দরকে। এসবও ছাড়িয়ে যায় তাঁর ইতিহাসবোধ, জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ, বিশ্বপ্রক্রিয়ায়ও অংশ নেওয়া। পাই মহাকথা, পুরাকথা, লোককথা, ধর্মগ্রন্থ, এপিক, শিল্প সাহিত্য অনুধাবন। তাঁর রচনায় দেখা যায় ছন্দের নানা পরীক্ষা, বাংলাভাষার তৎসম অভিব্যক্তির সঙ্গে লোকজ শব্দের স্বাভাবিক সহাবস্থান।'

এর সঙ্গে অবশ্যই গণেশ বসু উল্লেখ করেন তরুণ সান্যালের সংগ্রাম-মুখর প্রতিবাদী চরিত্রের। যে চরিত্রে দলীয়তার গণ্ডি টানা নেই। এস.এফ.আই-এর সঙ্গে যখন তিনি যুক্ত তখনই তিনি কবিতা লেখেন সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর। পার্টি নেতাদের অস্বস্তি জাগায় সেই নেতাজী-প্রীতি। জেলে গিয়ে যে কবিতা লিখেছেন তাতে ছিল 'পক্ষছিন্ন অতীতের হাজার মৈনাকে'র কথা। মিথের ব্যবহারে তরুণ সান্যালের যেমন, গণেশ বসুর নিজেরও বিশেষ ঝোঁক।

প্রবন্ধটিতে গবেষকের তথ্যনিষ্ঠায় তরুণ সান্যালের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি তুলে আনা হয়েছে। কীভাবে বারবার কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ হয়েছেন তিনি, কারাগারে অনশন করেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্মৃতিসত্তা উদযাপনের জন্য জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থায় আবার গ্রেফতার হয়েছেন। কৃষকফ্রন্টে পার্টির নির্দেশে তাঁর কাজ, এমনকি তাঁর প্রেমের কথাও। ১৯৫৬ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র মৃত্যু— তাঁর শব মিছিলে যোগ দেন তরুণ সান্যাল। তাঁকে আপ্লুত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি 'ফুলগুলি সরিয়ে নাও'। বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার কাজ থেকে রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বিবেচনায় বরখাস্ত হন পুলিশের গোপন রিপোর্ট অনুসারে। একদিকে এই ঝোড়ো রাজনৈতিক জীবন, অন্যদিকে উপনিষদপাঠ। রবীন্দ্রনাথকে ভদ্দরলোকি ঘেরাটোপে বেঁধে সংস্কৃতি ব্যবসায়ীদের কাছে লাভজনক পণ্য করে তোলা বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে তরুণ সান্যালের মনে। বিদ্রুপ ঝরে পড়ে তাঁর কবিতায় :

'ভিয়েতনামে বোমায় পুড়ছে ফসল শিশু ও ভদ্রাসন
—রবীন্দ্রনাথ নাম গেয়ে যায় বাবুর পোষা বোশেখ মাসে
মেয়ে শিখছে রবীন্দ্রগীত, রচনাবলী ঝাড়তে আসে
আলমারিতে ছয় ন মাসে জারডিন অ্যান্ড হেনডারসন।
গুরুদেবের নামে কিন্তু গলদশ্রু, মুক্ত দর্শন।'

তরুণ সান্যালের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত কবিসত্তার কথা লিখতে গিয়ে গণেশ বসু কিন্তু কবির আশ্চর্য সব চিত্রকল্প লক্ষ্য করতে কখনো ভোলেন না। নিজের কালো চুলের ভিতর একগাছি সাদা চুল যেন অদ্ভুত গতির ইশারা আনে :

কেশ তরঙ্গে ক্রুজার,
'দূর পর্বতের কোলে শাদা বাংলোর মাথায়,
দ্রুতরেখা বিদ্যুতের ধার, নাকি প্রথম বর্ষর মেঘে
দ্রুত বকবীথি।'

গণেশ বসু বাক্‌প্রতিমাগুলির প্রত্নরূপ উল্লেখ করে পাঠককে তাঁর অনুভূতির অংশীদার করে নিয়েছেন। 'সময়ের হাতে', নামে বহুমাত্রিক কবিতাটির শেষ দিকে 'ইম্যানুয়েল হাত ধরো' এই বিনতি পড়ে তাঁর মনে হয় ইম্যানুয়েল খ্রিস্টের নাম হলেও কবি কোনো ধর্মনেতাকে এখানে বোঝাননি। 'ইম্যানুয়েল এখানে হয়ে উঠেছে গরিব-গুর্বোদের প্রতিনিধি, মানুষের মুক্তিদাতা।' সময়ের জটিলতা, ষাটের দশকের হিংস্র আধিপত্যবাদ, কূটনীতির ধোঁয়াশা, পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব তরুণ সান্যালকে পীড়িত করেছে। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাননি :

'ব্রতগুলি ঘিরে আসে মায়ের চোখের মতো
পিতার বাহুর মতো
ভ্রাতার কাঁধের মতো
বিরুদ্ধ স্রোতের চলে ঠেলে দিতে ক্ষমায় ব্যথায়
নাটমণ্ডপের তলে আশ্বিন প্রভাতে দেখা
বলির রক্তের দৃশ্যে বালকের ভীত, তীব্র যন্ত্রণার মুখ।'

১৯৬৭-১৯৭২ পর্যন্ত তরুণ সান্যালের অস্থির জীবনের আলেখ্য তাঁর কবিতা-অনুভবের জন্য জরুরি মনে করেছেন গণেশ বসু। উল্লেখ করেছেন ১৯৬৪ সালেই হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধের পরে দলীয় রাজনীতি ত্যাগের কথা। 'তোমার জন্য বাংলাদেশ' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই তথ্যগুলি জানা একান্ত প্রয়োজনীয় যে, বাংলাদেশের সমর্থনে তিনি ভারতের নানা জায়গায় বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন, আহ্বায়ক হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংহতি উপসমিতির। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উড়িষ্যার

বেরহামপুর থেকে কয়েক ক্রেট আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছেন, কবিতা লিখেছেন, পাশাপাশি পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তরুণ সান্যালের মতো কবির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই কখনো শেষকথা হতে পারে না, গণেশ বসু তা পাঠককে যেন যথাবিধি সতর্কতাসহ জানিয়েছেন। নকশালবাড়িতে গুলিচালনায় যে কবি দেখতে পেয়েছেন স্বপ্ন সম্ভাবনার ছায়া, রক্তকরবীর বাস্তব, তাঁর কবিসত্তা ও রাজনৈতিক সত্তা তো কদাপি বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন 'নন্দিনী' কবিতাটি।

'কাদের হাতে কার হাতে।
কঙ্কণ পরাবে।
বর্শা ফলকের দপ চোখে যে
তোমার গলার কুন্দমালা
ওদিকে রঞ্জন শুয়ে নন্দিত শোণিতে
গুয়েভারা।'

রবীন্দ্রনাথ, লাতিন আমেরিকা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, কৃষ্ণ আফ্রিকা—চৈতন্যে মানুষের সংগ্রামকে স্থির জেনে কীভাবে তরুণ সান্যাল পথ হাঁটছেন—এই প্রবন্ধ তার বিশ্বস্ত ছবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বলি অসংখ্য সাহসী যুবককে নিয়ে লেখা তরুণ সান্যালের প্রবাদপ্রতিম পংক্তিগুলি গণেশ বসু মনে করিয়ে দিয়েছেন।

'খালের ঘাড়ের পরে ঝুঁকে পড়া মাদার-খোকসার ডালে
অলস ধুঁধুল
এমন বর্ষণ দিনে কোমরে লুঙ্গির শক্ত কষি, গায়ে টুটাফাটা গেঞ্জি
সবুজ স্বদেশে কোনো অচেনা গ্রামের পথে
মৃত্যুর সামান্য আগে পাটপচা জলে মুখ থুবড়ে পড়ে
মাতৃভূমি পাবে বলে।
চলে গেল উনিশ বছর।'

ইতিহাসচেতনা তরুণ সান্যালের কবিতার তন্তুতে তন্তুতে। গণেশ বসুর মনে হয়েছে 'অ-বিশুদ্ধ কবিতায় হুইটম্যান-নেরুদার বাঙালি উত্তরসূরি এই কবি। তাঁর কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধীর স্তুতিপুরাণ দেশের বিবেক জাগানোর স্বরে মিশে থাকে। তাঁর বিষয় হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার প্রতিবাদে বেরোনো মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত যুবক, গুজরাটের শ্রমিক মহল্লার দাঙ্গা (১৯৬৯), দিল্লিতে নিহত হরিজন কিশোরী আবার খ্রিস্টীয় মিথ। অসাধারণ 'বর্ণ পরিচয়' কবিতাটি নিয়ে খুব সংগতভাবে গণেশ বসু বিশদ আলোচনা করেছেন। কীভাবে ভারতবর্ষে উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষের বর্ণমালায় জেগে ওঠে সমাধানহীন এক দূরত্ব আর দ্বন্দ্ব :

'দেউড়ির সামনে টুলে মস্ত গোঁফ উর্দি ও নিষেধ
একটি-দুটি নীল বাস উড়ে আসছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে
হাওয়ায় শ্যাম্পুর হাল্কা গোলাপ বা ল্যাভেন্ডার, যুঁই,
এবং স্বর্গের ভাষা জলের উপরে জলপাতে
এবং মার্বেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে দ্রুত স্যাচেল টিফিন বাক্সে
মায়েদের স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে পরীদের শিশু
বাবাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যয় হয়ে
ভারতের ভাবী শাসকেরা।'

এর বিপরীতে থাকে নিঃস্ব মানুষের সন্তান সন্ততির বর্ণপরিচয় ও সাক্ষর হবার আকুল আগ্রহ, তারাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি। চরম বৈপরীত্যই এদেশের নির্মম বাস্তব। এই কবিতার নিহিত শ্রেণিসংগ্রামের বার্তা গণেশ বসু চিনে নিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য আমাদের কবিতাটির শক্তি নতুন করে চিনিয়ে দেয়। সমালোচক হিসেবে তার কৃত্য সম্পূর্ণভাবে পালন করেছেন তিনি।

'খোকা, তোর আরো ঢের মন দিয়ে বর্ণপরিচয় শেখা চাই
খোকা, তোর ভাঙা শ্লেটে, আঁকাবাঁকা অক্ষরের ঢঙে
মহাদেশ মহাসাগরের নক্সা
মহাবিশ্ব সৌরলোক,
ফসলে ও যন্ত্রে, পাখি, নদীর কাকলি নিয়ে
গোটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠা চাই।'

'চতুর্থ পেরেক' কাব্যগ্রন্থে আছে অসাধারণ একটি খ্রিস্টিয় মিথ! খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে চারটি পেরেক বানাতে যে কামারটিকে লোহা দেওয়া হয়েছিল তার একটি পেরেক তৈরির লোহা সে চুরি করে। ফলে যীশুর যন্ত্রণা আরো মারাত্মক হয়। সেই কামার তারপর প্রতিদিন স্বপ্ন দেখে একটি পেরেক তাকে তাড়া করছে। পরিণামে ঘরছাড়া হয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে সহসংগ্রামীদের সঙ্গে এভাবেই সংঘর্ষ, বিরোধ ঘনায়। কবির মনে হয়েছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন, স্বদেশে আদর্শরহিত সাংসদবৃত্তির জন্য সতীর্থ বর্জন, শেষ পর্যন্ত চতুর্থ পেরেকের মতোই বিশ্ব মানব মুক্তি আন্দোলনের বিভাজনদের তাড়া করে ফিরবে।

'সন্ত্রাসে সংলাপে' কাব্যগ্রন্থে সময়ের চাপে লেখা বিখ্যাত কবিতাগুলির আলোচনা বিস্তৃত পরিসর পেয়েছে গণেশ বসুর প্রবন্ধে। 'তাপসী মালিকের জন্য ব্যালাড' বা নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য কবিতা, মালকাটরার গাংটিকুলিতে কয়লা খাদানে ডুবে মরা, পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গার ভয়ঙ্করী ভাঙন, হরতুকি বাগানে শীতের

রাতে পথে পরিত্যক্ত শিশুকে কুকুরদের পাহারা— অজস্র সাম্প্রতিক যন্ত্রণা কেন্দ্রীভূত এই কবিতাসমূহে। 'বাউকুড়ানি ব্রহ্মডাঙায়' কাব্যনাট্যে আদিবাসী রক্তসম্ভূত অরণ্যবাসী যেন ঘটোৎকচ। স্পেনে যেমন জিপসী, পশ্চিমবাংলায় তেমনি অরণ্যবাসী। তরুণ সান্যালের কবি ব্যক্তিত্ব যে গণেশ বসুর আলোচনায় প্রার্থিত মহিমা লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সমকালীন বা সতীর্থ কবিদের কাব্যবিচার সহজ নয়। নানা কারণে ব্যক্তিগত ঝোঁক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে বাধা সৃষ্টি করে। সমালোচনায় সমতা থাকে না। গণেশ বসু নিজে একজন নামকরা কবি, কিন্তু 'কাল শুদ্ধ বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ে বিশদ আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন এবং বাঙালি পাঠকের পক্ষে তা এক অনবদ্য উপহার। এই প্রবন্ধে অগ্রজ বিখ্যাত কবিদের কাব্যপ্রসঙ্গও এসেছে। বিশেষ মূল্যবান মনে হয়েছে সমর সেন প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন।

'তিনি নিজেকে ডেকাডেন্সের কবি বলে চিহ্নিত করতে কসুর করেননি। তাঁর মতে, ডেকাডেন্সের কবিরা সৎ ও শুদ্ধ। যে বিপ্লব কবি নিজের চোখে দেখেননি, অভিজ্ঞতায় যুক্ত হতে পারেননি, তাঁর পক্ষে বিপ্লব বিষয়ে কবিতা লেখা ভ্রষ্টাচার মাত্র।... সংগীত যখন উচ্চগ্রামে ওঠে এবং সেই পর্যায়ে সম-ই হল cadence, আর সুরের সর্বনিম্ন পর্যায়ের সম বা প্রতিসমকে বলা যায় decadence. লাতিন decadenia থেকে আসা ফরাসি decadence বলতে বোঝায় অবক্ষয়, বিশেষভাবে of a period of art or literature after culsiration.

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক সময় ঊর্ধায়নের যুগে রোমান্টিক কবিতা গড়ে উঠেছিল সেই সমাজের আশাব্যঞ্জনায়। সেই ব্যবস্থার অধঃপতনের যুগে প্রকৃতি, নারী, প্রেম, স্বদেশিয়ানা সবই হয়ে পড়েছে বিকৃতির রূপ। এই সত্যকেই সমর সেন তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পার্টির সঙ্গে বিরোধের সূত্রে গণেশ বসু চীনা কবি আই চিঙ-এর তুলনা টেনেছেন। তাকে চীনে চার-চক্র শাসনের যুগে লালরক্ষীরা যোলো বছরের জন্য গ্রামাঞ্চলে নির্বাসনে পাঠায়। উদ্দেশ্য, গ্রামে শ্রমের মহিমা অনুগত হয়ে পরিশুদ্ধিলাভ। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্যে অন্তত এতটা আক্রমণ সহ্য করতে হয়নি।' তবে গণেশ বসুর একটি মন্তব্য নিয়ে আমার দ্বিমত থেকে গেল, তিনি লিখেছেন, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সময়বোধ আসলে পার্টির সময়বোধ।' এই সরলীকৃত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না।

দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বিখ্যাত কবিদের। কাব্য আলোচনার পাশাপাশি একেবারে তরুণ মন্দাক্রান্তা সেন, সেবন্তী ঘোষ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এতো সংক্ষেপে অব্যর্থ তীরন্দাজি, যে মুগ্ধ হতে হয় :

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব ভারতের দেবী অর্চনাকে কাব্যসাধনার শিকড়বাকড় ভেবেছেন। তন্ত্রে যেমন নারীই প্রধান, নারীই বিশ্বস্রষ্টা, ইতিহাসের অন্তসার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে সেই নারী সময়বিন্দু, সময়, ইতিহাস, মহাকাল গ্রন্থনা করেছে।'

ব্যক্তিগতভাবে খেদ থেকে গেল তুষার রায়ের কবিতার আলোচনা পেলাম না বলে।

মিথ গণেশ বসুর একটি প্রিয় বিষয়। 'বিষ্ণু দে-র কবিতায় মিথ' ও 'মিথ ও বাংলা কবিতা' প্রবন্ধ দুটি সুবেদী মননের ভরাট উদাহরণ। পাঠককে সঙ্গী করে নিয়ে তিনি 'দামিনী' কবিতার রহস্যলোক, 'মাঝরাতে বাপ ফেরে' বা 'প্রাকৃত কবিতা'র বৈদগ্ধ্য ও লোকায়তিক ভাববিশ্বে প্রবেশ করেন, পরিচয় করিয়ে দেন এবং উৎসুক্য বাড়িয়ে তোলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রাপ্ত একটি উদ্ধৃতি দিয়ে গণেশ বসুর দৃষ্টিভঙ্গির, তাঁর মননের তীক্ষ্ণতা ও বোধের প্রসারতা অনুভবের চেষ্টা করব।

'পুরাণপ্রতিমাকে বহুমাত্রিকতা দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। রাজনৈতিক ঘটনাকে তিনি মিথের চিরন্তনত্ব দেন অনায়াসেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কয়াধু' কবিতার ভঙ্গিটি (যেমন, 'কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস আনন্দে?/হাতির দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে।' বা, 'ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,/সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে।) আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলেও শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী' মিথের পর্যায়েই পৌঁছে গিয়েছে। ...অন্নপূর্ণাকে কবি আধুনিক জীবনের মধ্যে এনে যখন বলেন—

'ভিখারি বানাও, কিন্তু মনে মনে, জানোনি কখনও
তুমি তো তেমন গৌরী নও।'

তখন প্রত্ন-প্রতিমা নির্মাণে শঙ্খ ঘোষের অসামান্যতা আমাদের মুগ্ধ করে দেয়।

কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ধাপে ধাপে আমাদের পৌঁছে দেয় 'নর করোটিতে প্রজাপতি'র প্রখর চিন্তনে। এটি শুধু কবিতা নয়, সমান ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর ইতিহাসকে নিজের মতো করে ফিরে দেখা। সেই সঙ্গে বহুসংস্কৃতিতে বামপন্থার বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে ভাবনা। তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহারে আসি।

১৯৭৭ থেকে এ রাজ্যে বামপন্থীদের একাংশ শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রার্থিত ভূমিকা নিতে তো পারেনইনি, বরং কর্পোরেট হাউস মিডিয়া মালিকদের আশ্রিত কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠ কণ্ডুয়নে নিজেদের নিবেদিত রেখে আদর্শগত দিক থেকে প্রগতিশীলতারই বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

আর তৈরি করেন এমন একটি চক্র যাঁরা শুধু স্বজন পোষণের জন্যই দায়বদ্ধ। কখনো ব্যতিক্রম দেখা দিলেও সেটি আপতিক পত্র। সত্যিই এ এক দুঃসময়।'

কবি হিসেবে গণেশ বসু পাঠকের কাছে দীর্ঘকাল সমাদৃত, কিন্তু প্রবন্ধ লিখিয়ে হিসেবে তাঁর ক্ষমতা কিছুমাত্র কম নয়। তিনি নিজে প্রথম সত্তাটিকেই গুরুত্ব দেন এবং কবি ও প্রাবন্ধিক— এই দুটি সত্তার মধ্যে চৈতন্যের সেতু বেয়ে তাঁর অবিরাম আসা যাওয়া চলে সেটাও মানি। কিন্তু সেই কারণেই তাঁর প্রবন্ধ একটি নিজস্বতায় উজ্জ্বল কুলুঙ্গি তৈরি করে পাঠকের মনোলোকে। তাঁর কাছে আরো প্রবন্ধের দাবি জানাই।

গ্রন্থসূত্র :

নরকরোটিতে প্রজাপতি, গণেশ বসু, মনন প্রকাশনী, ৩০ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১১।
উৎস: অহর্নিশ / বর্ষ-১৯, ২৪ সংখ্যা, গ্রীষ্ম-১৪২২।

গণেশ বসুর কবিতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা মূলত ভাষার শিল্প। প্রশ্ন ওঠে, এই ভাষা কার? প্রত্যক্ষত কবির। কিন্তু কবি তো এই ভাষা অর্জন করেন তাঁর সমাজে, তাঁর শ্রেণিতে, আবার তাঁর পঠনপাঠনে, তাঁর সমাজও এই ভাষা নির্মাণে থাকে। আবার একজন কবির ভাষা পাঠকের, implide পাঠকের ভাষায় আরেক মেরুতে জেগে ওঠে, সেখানে পাঠকের পাঠ-শ্রেণি, সময় সম্পর্কে বোধ কাজ করে। মাঝে মাঝে মনে হয় কবিতার ভাষ্য,ব্যাখ্যা রচনা গদ্যে অসম্ভব। কবি কোন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁর মতাদর্শ ও মতামত কী, এসব নিয়ে কথা বলার পর দেখা যায় কবিতাটি পালিয়ে গেছে। ওই ভাষার শিল্পের কাছে পৌঁছাতে পারলাম না। কবিতাকে পড়াই কবিতার ভাষ্য, কবির ভাষা ও পাঠকের ভাষার দ্বন্দ্ব-সংযোগে এই ভাষ্য রচিত হয়।

গণেশ বসুর কবিতা পড়তে পড়তে এই সব কথাই স্পষ্ট ও আবছাভাবে মনে এলো আজ, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক যখন শেষ হতে চলেছে, তখন এই কবির, বিশ শতকের ষাটের দশকে ১৯৬৪-তে যাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত এবং যিনি একটি দ্বান্দ্বিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ, তাঁর কবিতা কীভাবে পড়বো, কেমন ভাবে এসমাজের বৃত্তে গ্রহণ করবো। যে আবেগ, যে স্বপ্ন, যে প্রত্যয় এই কবির মধ্যে, আজ নানাভাবে খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছে বর্হিবাস্তবে। লেনিন, হো-চি-মিন, কাস্ত্রো নিয়ে যে কবিতার আবেগ স্পন্দিত হয়েছে কখনও নাটকীয় উচ্চারণে, কখনও বা লিরিকের স্নিগ্ধতায়, তা কি আজ পাঠকের কবিতার গ্রহণে আসন পাতে? এক ভাবাদর্শহীন মুমূর্ষার মুহূর্ততত্ত্বে বেঁচে থাকা পাঠকের ভাষা কবিতার ভাষায় কি খুঁজে পায় তার প্রতিরূপ? স্বয়ং কবিও তো ক্রমশ তাঁর ১৯৯৯ থেকে ২০০৮এর গোড়ায় প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলিতে তৈরি করেছেন এক বিপ্রতীপ সংশয়, ধিক্কার। গণেশ বসুর কবিতা তাই পাঠকের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসে। যে আবেগ, যে প্রত্যয়, যে স্বপ্ন নষ্ট শশার মতো পরিত্যক্ত, সে সবই ভাষার শিল্পে কীভাবে যেন এসে যায় পাঠকের চৈতন্যে বা চৈতন্যহীনতায়। গণেশ বসু এটা প্রমাণ করেন, কবিতার আবেগ বিষয়নির্ভর নয়,

ভাষার, ফর্মের, উচ্চারণের নানা স্বরে ওই বিষয় পেরিয়ে যায়— নিজ বৃত্তে তারা যেন এক নতুন বাস্তব হয়ে ওঠে, হয়তো এসব আবেগের পুনর্জাগরণ ঘটে যায়। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩-র মধ্যে যে কবিতাগুচ্ছ গণেশ লেখেন, তাঁর ভাষায় গাঢ়বদ্ধ সনেটের ছায়ায়, তাঁর পূর্বসূরিদের অবশেষ, সাধুক্রিয়ার ব্যবহারে প্রাক-জীবনানন্দীয় আভা :

যতই ভুলিতে চাহি কোনোক্রমে পারিনা ভুলিতে
নিরবধিকাল ধরে জেগে আছো, জানি জেগে রবে
অসহ স্মৃতিকে নিয়ে বেদনায়, পরম নিভৃতে
রচিবে সমাধিভূমি পৃথিবীর। করুণ উৎসবে
এ দুটি নয়নে জাগে হাহাকার, সকল প্রহর
অশেষ শূন্যতা বহে অবিরল বিষাদে বিধুর
বিরহের, চারিধারে সংখ্যাতীত তোমার স্বাক্ষর
নীরবে জানায় কভু বাজিবে না বাঞ্ছিত নূপুর।

এ ভাষা ত্রিশ-পরবর্তী বাংলা কবিতার ভাষার যে প্রধান রাস্তা তা থেকে যেন আলাদা, হয়তো সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ছায়া, আবার কোথায় যেন বহুদূর মধুসূদন দত্তর স্মৃতিবাহী। সাঁইত্রিশটি তরঙ্গে দোল খাওয়া প্রেমের এই তীব্র আবেগের শেষে গণেশ, তাঁর প্রথম কবিতার গুচ্ছেই নিজ বীক্ষাকেও স্পষ্ট করে দেন শেষে। 'তুমি/তোমার এক ব্যক্তি-নারীর পরিধি ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে'— ওই ভাষাও মুক্তি পায়। পাঠক তার পাঠে বুঝতে পারে, এ কবিতার ভাষার যে তথাকথিত আধুনিকতা তা আসলে এই দেশের অন্তর্নিহিত সত্তা, এ ভাষা তাই আমাদের অস্তিত্ব। "তোমার অপ্রতিভতা, বিমূঢ়তা পাঠায় ইশারা।/অথবা তরঙ্গ তোলে, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে আমি/তোমাতেই শান্তি পাই, স্বপ্ন দেখি, দেবো তাতে সাড়া/তোমারই বিভায় হবো আলোকিত মুগ্ধ অনুগামী"— এই তুমি, এই বনানীকে কবিতাগুচ্ছ শেষ হচ্ছে এভাবে,

স্বদেশ ছেড়েছি কবে আপাতত উঞ্ছজীবী আমি
সন্ধ্যায় তোমার কাছে পেয়ে যাই অন্য পরিবেশ
এলাচের গন্ধ ওড়ে কাঁসার শরীর থেকে, দামি
জড়ানো শিল্পের শাড়ি, তুমি যেন সজ্ঞান স্বদেশ।
বাস্তুচ্যুত হতে ফের ভুলেও চাহিনা আমি, চাই
দীপাবলি হয়ে ওঠো, আমৃত্যু তোমারই গান গাই।

তুমি যেন স্বজ্ঞান স্বদেশ, তুমি এখন আর ব্যক্তিগত শুধু নয়। এ তুমি বাস্তুচ্যুতের নতুন অভিজ্ঞাত, অস্তিত্ব। "চাহি না অমি, চাই" চাহি ও চাই—এর দ্বন্দ্বে এ এক নতুন অর্থ।

১৯৬৪-থেকে ৬৬-এর মধ্যে কবিতাগুলিকে গণেশ সাজালেন "নিজের মুখোমুখি" এই শিরোনামে এ সময় তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তব রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্যে, "উঞ্ছজীবী আমি" অন্য পরিবেশে চঞ্চল, কিন্তু বর্হিবাস্তবের ওই দ্বন্দ্বে-সংঘাতে স্বপ্নের মধ্যে তিনি নিজের মুখোমুখি দাঁড়ান। কবিকে তো এই নিজের মুখোমুখিই দাঁড়াতে হয়। কেবল ঐ "নিজের" শব্দটির অর্থ বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন কারুর মনে হতে পারে। ওই "নিজের" একান্ত ব্যক্তিগত ও তাই পবিত্র, কারুর মনে হতে পারে। ওই "নিজের" আসলে সময় ইতিহাস, শ্রেণি মিলিয়ে এক বহুমাত্রিক অস্তিত্ব। আর কবির কাছে নিজের মুখোমুখি হওয়ার অর্থ নিজের ভাষার মুখোমুখি হওয়া, ওই ভাষা খুঁজে পাওয়াই তো কবির ঈপ্সিত। আর ওই ভাষাই তো নিজের মুখোমুখিকে পাঠকের কাছে নিয়ে যায়, পাঠকও নিজের মুখোমুখি হয়। গণেশ নিজের মুখোমুখি হয়ে ওই ভাষাই খোজেন "দ্বন্দ্বময় সত্তার সংকটে"। এক স্মৃতির ধূসর হয়ে যাওয়ার মধ্যে "পেছনের দিকে তাকাতে পারি না আর স্বাভাবিক প্রত্যয়ে।" স্বাভাবিক প্রত্যয়-শব্দ দুটি গণেশের বীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। ওই ৬৪-৬৬ তেই গণেশের মনে হয়েছিল "এতো অসময় পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এসেছিল ?" লক্ষণীয়, বনানীকে কবিতাগুচ্ছের ভাষা পালটে গেছে এসব উচ্চারণে। আর গণেশের কবিতার নিজের মুখোমুখি হবার অবৈকল্য ও নৈর্ব্যক্তিক আবেগ এমনই যে চল্লিশ বছর পরেও মনে হয় তিনি আজকের অন্ধকার সময়ের কথা বলেছেন।

প্রতিটি মুহূর্তে ভাবি বিষণ্ণ যুবারা সব কীভাবে এখন
বেঁচে আছে অন্ধকারে, নাস্তিময় শতাব্দীর বিষাক্ত বিবরে
.... আলোর প্রতিমা ভেঙে গেছে বিশ্বাসের
এখন যৌবন কাঁদে অন্ধকার সময়ের সাহারা সংকটে
চোখের কোটর জুড়ে অন্ধ অমা, বুকে আশা, আর্তনাদ বাজে।

এতো আজকের ছবি। ওই বিশ্বাসের আলোর প্রতিমা তো ভেঙে গেছে নানাভাবে যৌবনের। আর এক বিবর্ণ স্মৃতি, বিস্মরণ এসে গ্রাস করেছে। এখন সময়ের দাঁতে আমাদের উদ্বন্ধন। এখন অনেক কিছু ভুলে গেছি। জ্যোৎস্নাস্ফূরিত তোমার বাহুর বিশালতা, চক্ষুর চালচিত্র, ওষ্ঠের উষ্ণতায় বুকের স্নায়ুছেঁড়া তীব্রতা, সাপের মতো হিংস্র রক্তে অন্ধকারের চিৎকার, পাথরগুলোয় কিসের প্রতিধ্বনি, ঝড়,

এখন অনেক কিছু ভুলে গেছি। এখন
ভুলে যেতে হয়
অরণ্যের স্তব্ধ ঘাসের নৈঃশব্দ্য
সূর্যের জন্যে শিশিরের উদবিগ্নতা

চতুর্দিকে ক্ষুব্ধ ধ্বনির উৎসব
নদীর বুকে ভাঙা মাস্তুলের প্রতারণা।

গণেশ ওই '৬৪-৬৬"- তেই বুঝেছেন আমাদের একুশ শতকের নিজেকে। আমাদের কারুর বুকে সূর্যের সাহস নেই, কিংবা হৃদয়ে ভালোবাসার ঘনিষ্ঠ উত্তাপ। কিন্তু গণেশ যে দ্বান্দ্বিক স্বপ্নে নিজের ভাষাকে বেঁধেছেন তাতে তো এটাই শেষ কথা হতে পারে না ! জানেন, সময় নেই, সময় বদলে যায়, পার হয় পুরোনো সাঁকোর ভাঙাচোরা দাগগুলি। তাই বুকভরা নিঃশ্বাসের স্বপ্ন। এখন আগুন দ্রুত এসে লুফে নিক দক্ষিণের পাথুরে প্রান্তর, এ ভাঙাদেশের যন্ত্রণার সব চিহ্ন মুছে পাতায় পাতায় জাগুক দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা, জাগুক হৃদয় ভালোবাসা-তৃতীয় নয়ন। নিজের মুখোমুখি, গণেশের কাছে, আসলে দেশের মুখোমুখি। তাঁর তুমিও নিজের শরীরী আকাশে ওই দেশের আকাশ। শরীরী তীব্র আবেগেও দেশেরই প্রতিমা।

গণেশের কবিতা ও কবিতার ভাষায় থাকে এক পৌরুষের পেশল শক্তি। এ পৌরুষ পুরুষতন্ত্রের নয়-এ ক্রোধ-ঘৃণা-ভালোবাসার মানবিক পৌরুষ। তাঁর চিত্রকল্পে, প্রতীকে তাই আসে মহিষ।

মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সুমদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।
.....
এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।

মহিষ বা বুনো মহিষ একাধিকবার তাঁর কবিতার ভাষায় জেগে ওঠে। কিংবা মোরগের চিত্রকল্প। গণেশ বসুর কবিতার ভাষাও ওই দুরন্ত মহিষের মত। বুকের ভেতরে নয়, ভেতর বুকে ওই মহিষের প্রচন্ড টানই তাঁর কবিতার ভাষাকে করে তোলে স্বতন্ত্র। প্রেমের কবিতাও এরকম হয়।

আবার সময় এল। আজ তারাঘন অন্ধকারে।
মাতালের মতো, বুনো মহিষের মতো,
সব তছনছ, যেন
বেলুনের রঙে ওদের নেশা, ভালোবাসা
প্রাগৈতিহাসিক, গির্জায়
স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস।

এই প্রাগৈতিহাসিক ভালোবাসার ভাষাই তাঁর কবিতায়।

‘১৯৬৭ থেকে ৭০’-এর মধ্যেকার কবিতায় আসে রক্তের রৌদ্র ও অধিকার। ওই রৌদ্র ও অধিকারের এক আলোড়ন এসময়ে ‘৬৪-৬৬’-র থেকে অলোড়ন আলাদা। বাইরের বাস্তবে স্বপ্নের নতুন চলাচল। গণেশের ভাষাও পালটায়;

এখন যদি সময় হল
লক্ষ ধাতুর প্রাণের শিসে
তারায় ভরা মুখোশ আমার
হিঁচড়ে টেনে বদলে ফেলো
বদলে ফেলো
দুঃখ ক্ষোভের পরাজয়ের পরিতাপও।

অন্ধকার সময়ের জাল যেন কেটে যায় কবিতার ভাষায়, কিন্তু ওই বদলে ফেলার স্বপ্নের মধ্যেও তিনি নিজের মুখোমুখি, একলা। সারাটা রাত একলা হাঁটি।

শুনি বিপুল চতুর্দিকে
কঙ্কালেরও ফিসফিসানি,
বিধানসভার কার্পেটেতে
অপরাধের কান্না আজো
মাইল মাইল,
দুঃখে ঘৃণায় বুকের হাড়ও ঝলসে যায়
ঝলসে যায়।
আমার মাটির রূপকথাও।

ওই রাতে একলা হাঁটা, বিধানসভার কার্পেটেতে অপরাধের কান্না অবশ্যই বাজে যে ছন্দে, তা কোন শিথিল অবসন্নতায় থাকে না। লাফিয়ে ওঠে। ‘সারাটা দিন/ একলা হাঁটির ছন্দে।’ আর বাইরের ওই অন্ধকারের মধ্যেও এক ‘অথচ’ এসে যায়। “লড়াই হল মুখোমুখি রক্তের গভীরে দুঃখের শিকলগুলো বেজে ওঠে।” ওই আলোড়নকে গণেশ চিহ্নিত করেন শিকড়হীন মানুষের আলোড়নে। আজ কি মনে হয় না ৬৭-৬৯-এর স্বপ্নের আন্দোলন, দুলে যাওয়া বা সাতাত্তরের প্রত্যাশা ওই শিকড়হীন মানুষেরই আলোড়ন ছিল? এও তো “আজ কোনো সেতু নেই।” ভোরের রৌদ্রে “কালচে রক্তের স্মৃতি, তোবড়ানো স্বপ্নগুলি মুক্তি পেতে চায় শ্রমে স্বেদে অস্তিত্ব, প্রতিমা।” কবিতার ভাষাও এক দ্রাবিড়কেশরে কেঁপে ওঠে। কবিতার গাড়ি যেন লাইচ্যুত হতে চায় ডানদিকে সরে সরে গিয়ে। দুটি শব্দ বা একটি জড়াজড়ি করা বানানো দীর্ঘ শদ ছিটকে যাওয়া কামরার মত, পড়ে না, উদ্যত, দাঁড়িয়ে থাকে। “উদ্ধত খড়গের মুখে উচ্ছাস উল্লাস।”

বাঘবন্দি, ওমনি হঠাৎ
অধিকারের খড়্গ তুলি
কাঠগোলাপে, অন্ধকারের
তুবড়ে যাওয়া মুখের রেখায়
সর্বনাশের ঝুঁটি নেড়ে,
ধানের স্বাদে
তপ্ত বুকের বর্শা তুলি
টুকরো দেশের পাঁজর থেকে।

এই টুকরো দেশের যন্ত্রণা, বেদনা গণেশ বসুর কবিতায় অন্তহীন এক বাস্তব। কেন যেন মনে হয় গণেশ এখনকার কথাই বলেছেন, কেবল সালটা পালটেছে; দুরন্ত দৌড়ের উনসত্তরের দিনগুলি, লাশ ঠেলে ঠেলে এক একটা স্ফুলিঙ্গ দেখি ছবি হয়ে বসে থাকে কবন্ধের ঘাড়। গণেশ তাঁর কবিতা “পুরুষ ছিলাম” ইতিহাসের ক্রোধে স্মৃতি বিস্ফোরণে মুঠি তুলে দাড়াতে চান। কিন্তু বহিরাশ্রয় পাননা। অবশ্যই দীর্ঘ কবিতার গায়ত্রীতে নিজেকেই কবিতায় আনেন; তাঁর স্বপ্নের স্মৃতি-মাখা ভবিষ্যতের আবেগে। শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসার লেনিন, কথ বলেন গদ্যপদ্য মিলিয়ে। লেনিন কি নয় এই সভ্যতার সমগ্র কবিতা? এই ধ্বস্ত বাস্তবে, স্বপ্নহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায়, লেনিন কেনো ব্যক্তি থাকেন না।

এ ভাঙা ঘরের দাহে তবু
ব্যর্থতারও ঘূর্ণি ঘিরে স্মৃতিগুলি
ঝিকিমিকি তরঙ্গে চঞ্চল
প্রতিটি তরঙ্গচূড়া হয়ে যায় লেনিন লেনিন
প্রতিটি বাঁকের মুখে মলিন মানুষ যেন লেনিন লেনিন
অজস্র সূর্যের কণা।
আমার দুচোখ ফেটে জল।

ভাঙাঘরের দাহে এতো কবিতাকে বাঁচাবার আবেগ। কবিতার ভাষা এখন একই শব্দের পুনরাবৃত্তিতে যেন লাফিয়ে চলে,

সংগ্রাম অধিকার
অধিকার রক্তের, কবিতার,
ইতিহাস গড়বার অধিকার, মুক্তির
অধিকার
যৌবন সূর্যের
অধিকার অধিকার।

বহিরাশ্রয়ে যে প্রত্যয় ও স্বপ্নের মুখ থুবড়ে পড়া কবি দেখেন তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই লেনিন (কিংবা হোচিমিন বা কাস্ত্রো) একটা প্রতীকের অবলম্বন হয়ে ওঠেন। ব্যক্তি এখানে পালটে যায়, নচেৎ একথা বলা যায় না। সঙ্গী আমার কৃষক ভি.আই.লেনিন। আর 'অধিকার' শব্দটির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে যা নেই বাস্তবে তাকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করা।

১৯৭০-৭১-এ গণেশ বসুর মতো কবি যে অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশের কথা বলেছেন, সেটাতো প্রত্যাশিতই। স্বপ্নের ভিতরে তবু বেঁচে আছি। তবু কথাটা অর্থের মতোই তাৎপর্যপুর্ণ। নিজের অথবা বাবা ভায়ের মুখ দেখা। এ এক সময় দামাল সময়, হিরন্ময়, আবার হে সময়, জরাসন্ধ কঠিন সময়, কবন্ধ সময়। সেই বনানীকে কবিতাগুচ্ছর স্মৃতি; তোমার চোখে স্বদেশ কাঁপে আরেক চেতনা। স্বপ্ন, স্মৃতি দুলিয়ে দেখা সেই ভূমি, শেকল থেকে এক বিদীর্ণ অস্তিত্বে একদিন চলে আসতে হয়েছিল। স্বপ্ন জাগে টুকরো দেশের স্বাধীন স্বর। "লড়ছি কারণ শহিদ আমার ভাষায় কথা কয়"- এই ভাষার সন্ধান করতে থাকেন গণেশ। ওই ভাষায় প্রত্যয় জাগে, নিবিড় বিশ্বাসে উচ্চারিত হয় "কমরেড", যদিও তিনি জানেন "কমরেড মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়"। গণেশ যেন তাঁর প্রত্যহকে, তাঁর স্বপ্নকে আবার গুছিয়ে নেবার বহিরাশ্রয় পেলেন বাংলাদেশের জাগরণে। দীর্ঘ কবিতার আবেগে, ভাষার উল্লম্ফনে তাকে স্থায়ী করতে চাইলেন রৌদ্রহাতিয়ারে। কখনও গদ্যে আত্মস্থ করলেন আবেগকে। পূর্বদিগন্ত তাঁকে অবসাদ থেকে মুক্তি দিতে চায়। এপার তো স্বাধীন, আহারে। আসলে "দেয়ালে সভায় বিপ্লবের খোকারোগ মোচা ফুল। উঞ্ছজীবী অস্তিত্বের চতুর্দিকে বিরোধ যন্ত্রণা। "পশ্চিমের ঘিরে আসা অন্ধকার।" গাঢ় অন্ধকার, ডানা মেলা অন্ধকারে বিদ্রোহিণী পুবের তটিনী। মজা ডোবা। বাঁশঝাড়। পোড়া মাঠ মানুষ। মানুষ।"

১৯৭১-এর পর গণেশ বসুর কবিতাসংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৮২-তে, ১৯৭২ থেকে, ৮২ এই দশবছরে লেখা কবিতার। সেই সময়, যখন স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন, শ্বেত সন্ত্রাসে বিপন্ন, জরুরি অবস্থা আবার এসব ভেঙে এক সাংসদীয় পালাবদল 'বাঘের থাবার নীচে সময়'। "কিন্তু আমার স্বরে ভাসে গরাদভাঙা আওয়াজ / ভুল বাইরে বেরোও, দেখবে তোমার গলায় উকুনমারা ধ্বনি।" দিন কাল কেমন বদলে গেছে, কেমন যেন সব চলে গেল মাফিয়াদের আখড়ায়, মস্তানদের খপ্পরে। "আমার চারিদিকে এখন মরাডালের ছায়া" কবিতার শকটের লাইনচ্যুতি থেকে যায়, শব্দের পুনরুচ্চারও, কিন্তু তা স্বপ্নজমির। সে এক দামাল সময়, দ্রোহের সময়। এখন তো স্বপ্ন বুনতে বুনতে জ্বলতে জ্বলতে দেখতে দেখতে সকলেই লাশ হয়ে গেছে। এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও গণেশ একথাই বলতে

পারতেন। সত্তর এক অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের ক্রিয়ায় ফিরে আসে। স্বপ্নভূমির ইউটোপিয়ার মধ্যেই ক্রান্তি বাজে, দিনকাল কেমন বদলে গেছে। ভিয়েৎনামের হয়ে এই বার্তা আসে "দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুই বড়ো"। কিন্তু তার বাস্তব তো বাঘের থাবারও নীচে। কবি ডানাভাঙা পাখি।

সতেরো বছর পরে ১৯৯৯-এ প্রকাশিত হল গণেশ বসুর পরবর্তী কবিতাসংকলন 'নীরব সন্ত্রাস'। প্রশ্ন জাগে এত দেরি কেন? আগের কবিতা সংকলনও দশবছরেরও বেশি সময় নিয়েছিল। এসময় কি তিনি কবিতা কম লিখেছেন? নাকি কবিতা সংগ্রহ-১-এ মাঝখানের কোনো সংকলন বাদ গেছে? নির্বাচিত কবিতা নিশ্চয়ই পুরোনো কবিতার সংগ্রহ। ১৯৯৯- অর্থাৎ যে কমিউনিস্ট আদর্শে ও রাজনীতিতে উদ্‌বোধন তাঁর, তার নানা সংকট প্রবল। ১৯৬৪ তে, ১৯৬৮-৬৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন তিনি আগেই দেখেছেন। তাঁর বীক্ষায় এই সাম্যবাদী ভাবনা ও স্বপ্ন তাঁর কবিতার জগৎকেও বহন করতে হয়েছে। ১৯৮০-র দশকের শেষে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির করুণ দশা, ভেঙে চুরে তৈরি করেছে এক শূন্যতা। এলোমেলো হযে যায় সব কিছু। তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তবের স্বপ্নের নিদারুণ হত্যার সময়কে ১৯৭০-এর দশকের পরের সময়কে মনে হয়েছে "নীরব সন্ত্রাস"। একটা ব্যঙ্গই এসে যায় উচ্চারণে; "উলঙ্গ মুকুট নিয়ে মুখোমুখি শুয়োরেরা আমার বাগানে।" ছেঁড়া-ভেড়া এখন আমার দুই হাঁটু তোলা ধুতিগুলো। 'আমার বাগানে আমি ছায়া হই খরার বাঁকুড়া'/ 'ক্ষমতার স্বাদ পেলে কেউ কেউ হয়ে ওঠে মাতাল গন্ডার। অথচ এর মধ্যেও 'এখনও তোমার গানে এবুকে বেদনা জাগে ঘুম ভেঙে যায়'/ যদিও সেখানে শকুনে আজ ছিঁড়ে খায় মজ্জা মাংস চেতনার ঘিলু'/ আর সবাই কে জিজ্ঞেস করলে, 'বলব তারা বলবে।' "ক্ষমতায় যারা থাকে তারা কি শান্তি দেয় ? 'সন্ত্রাস থেকে ফের জন্ম নেয় আরেক সন্ত্রাস। নীরব সন্ত্রাস আজো বর্ণময় খরার দাপটে।" ১৯৮২ থেকে ৯৯ র মধ্যে 'নীরব সন্ত্রাসে' কবিতা দীর্ঘ হয়। খানিকটা সংলাপের মতো। 'তুমি' যে তুমি স্বপ্ন এনেছে একদা, তাকে এখন ভয়।

ভয় পাই
এখন তোমাকে ঘিরে খালি ভয়, তুমি বিভীষিকা
এখন তোমাকে ঘিরে অবসাদ, কঠিন শরীর
ক্লান্তি নামে, মৃত্যু জাগে মৃত্যুই সুন্দর।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো তুমি।

পলাতক স্মৃতি, স্মৃতিরা ধাবমান আমিও হতমান। এক সর্বগ্রাসী খরায় সত্তা তার স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ দুইই হারায়।

১৯৯৯-এর পর ছ'বছরের মধ্যেই গণেশ বসুর পরবর্তী কবিতাসংকলন প্রকাশিত হল— 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'। নীরব সন্ত্রাস পেরিয়ে যেতে চান তিনি; 'পাগল ছাড়া কেই বা তুলবে জাহাজ? কেউকি ছুঁতে পারে স্বপ্ন।' কবিতার ভাষায় ও ছন্দের দোলায় কবিতার আকারও হ্রস্ব। শ্মশান উৎসব, কবন্ধ অন্ধকারের মধ্যে গণেশ বোঝেন, ভাষারও রয়েছে বড়ো সীমাবদ্ধতা, শব্দেরা মৃত, শব্দ নির্রথক। তবুও রক্তের ভেতরের সেই রৌদ্রই যেন বলে ওঠে,

থাকব না চুপ, মৃত্যু নিপাত যাক।
শেষ হোক এই ধ্বংসের কেনাবেচা।
ঘুরে দাঁড়াবোই। লজ্জাও থমকাক।
করতে দেবনা এ দেশ কসাইখানা।

এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকেই দীর্ঘ 'বেঁচে আছি'তে চলে আসেন গণেশ। কবিতার ভাষাও ওই বেঁচে আছি-র নাছোড় ঘোষণায় পালটে যায় 'চ ছ জ জ ঞ'-য়। বিশ্বায়ন প্রযুক্তি ঘূর্ণি কবিতার ভিসুখায়ে আসে। আর এই ঘোষণা-"ফুলের শিকড়ে আমি আগুনের মাঝ-বরাবর। স্বপ্নেরা মরে না।" এই স্বপ্নই গণেশ বসুর কবিতায় বেঁচে আছি'র বহুস্বরের জাগরণকে ধরে রাখে। ছন্দের অর্কেষ্ট্রায় গদ্যর ছন্দস্পন্দে বেজে ওঠে সময়ের মন্দিরা আমার, দুদিকে ডানার দ্বান্দ্বিক মাত্রা। ২০০৮-এর কবিতাসংকলন—'ভাসানদরিয়া'। এই স্বপ্নেই মুক্তি খোঁজেন কবি। ২০০৬-এ চেগুয়ে ভারার স্মৃতিতে বলেন; আমার কিছুই নেই, অপরাধ ছিঁড়ে খায়, তোমার স্বপ্নেই শান্তি খুঁজি, শান্তি ছাড়া আমাদের কারো কিছু নেই। আবার, স্বপ্নেই বেলুন ওড়ে। এ স্বপ্ন ভাঁড়েরা ওড়ায় শুভময় রোদ ছাই করে দেয়। অন্ধকারে কবন্ধ বহির্বাস্তবে মনে হয়, " তাহলে সাহিত্য হল মাথার ওপরে ছাদ, স্বাগত আশ্রয়।" আবার ওই সাহিত্যও তো হয়ে যায় পাঠ্য;

ঝলসে দেয় বাতাস আমার বাড়ির চৌহদ্দি
ঘিরে রেখো, অনেক ত্যাগের অশ্রু জমা আছে।
অর্থকরী লেখার দায়ে ঘুমকাড়া-রাতগুলি
চকডুংরি মেঝেয় কাঁদে, সিঁড়ির মোজেইকে
ছন্দ ঝিমোয়, নিজেই নিজের সুখ
খুঁজতে গিয়ে খুন করেছি ভালোবাসার মুখ।
রোমান্স মেদুজ্ঞার ডানা বাতাস তোলে ঝড়।

অবশ্যই সেই সমুদ্রমহিষ আর থাকে না, আসে নতুন শব্দ-খচ্চর। মানে যে খচ্চরের পিঠে দেশ। "উজ্জ্বল খচ্চর কটি লন্ডভন্ড করে দেয় মানবাধিকার/ উজ্জ্বল খচ্চর কটি গৃহস্থকল্যাণে শুধু/ মহার্ঘ জোকার। "প্রশ্ন", তাহলে কি গণতন্ত্র চিকেন তন্দুরি?

গণেশ বসুর এই কবিতা পড়া একজন পাঠকের। অন্য পাঠক অন্যভাবে পড়বেন। আমরা দেখেছি, গণেশ বসু বহির্বাস্তবের চেতনাকে বারবার নিজের মুখোমুখি, রক্তের গহন অস্তিত্বে নিয়ে আসতে চান। চতুর্দিকে বিনষ্টির চেতনা তাঁর প্রখর, আবার স্বপ্নের আকাশকেও ছাড়েন না। বাইরের শুকনো ডালের হাহাকারের মধ্যে স্বপ্নকে অপরিসীম রাখেননা। এক তুমি/তোমার/তোমাকের সম্বোধনে তিনি "আমাকেও" চিনে নিতে চান। তোমাকে তিনি চেনেননি, নিজেকেই নিজে ঘায়েল করেছেন, আজকের বিশ্বময়, প্রযুক্তির জীবন- নিরপেক্ষ অতিকায় হয়ে ওঠায়, কর্পোরেটে শুধু তাঁর 'তুমি' আক্রান্ত তাই নয়, আমিও আমির ভাষায় বলা, তোমারই মতন এটা জেনেটিক দুর্ঘটনা এক। এই নিজের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাঁর রাজনীতিতে একরৈখিক হয়না। অবশ্যই এই কবি রাজনৈতিক ভাষ্য প্রত্যক্ষে-প্রচ্ছন্নে রচনা করেন, তা যে এক অলীক আশায় বা ছেঁদো উচ্চারণে পরিণত হয়না, তার কারণ নিজেকে দেখা, আর তিনি জানেন অন্ধকারের শব-ব্যবচ্ছেদও তো রাজনৈতিক স্বপ্নের পক্ষে জরুরি।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই ১৯৩০-এর দশকেই বাংলা কবিতায় যে আরেক পর্যায় দেখা দেয় তার দুটি মুখ; একটি জীবনানন্দ দাশ, অন্যটি বিষ্ণু দে। এর পাশাপাশি ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙালি মধ্যবিত্তর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়, ইতিহাস-ইতিহাসহীনতায় জীবনানন্দ গৃহীত হয়েছেন অনেক বেশি, যদিও এই গ্রহণ মনীষাদীপ্ত এক নতুন রোমান্টিক কবিকে যথার্থ বোঝায় বাদ সেধেছে। আর কবিতাই যে কবির ক্রিয়ার সময় হয়ে উঠেছে, সময় কবিতা, সেই বিষ্ণু দে সেতুলনায় অনেক কম গৃহীত। গণেশ বসু এই পরম্পরার কবি। বিষ্ণু দেকে তিনি যে কবিতা-সংকলন উৎসর্গ করেছেন বা বিষ্ণু দে-ই তাঁর একটি কবিতায় প্রণোদিত হয়েছেন, শুধু একারণেই নন তাঁর বীক্ষাকেই তিনি গুছিয়ে নিতে চেয়েছেন ওই পরম্পরায়। সময়ের চেতনায় আবার ওই হিংস্র চোরাবালির ফাঁসে সূর্য তারা সময়ের মধ্যে যখন তাঁর মনে যে— প্রশ্ন কোরো না কেউ, এখন প্রশ্ন কোরো না কোথায় গেল শিকড়বাকড়, কোথায় গেল মা, তখনও তারা মনে হয়—

"আগুনের ডানা ওড়ে ভাষণে মিছিলে কিংবা মেঘে মেঘে রোদে ও বর্ষায়।
আগুনের ডানা ওড়ে শব্দে শব্দে, রাস্তা কাঁপে মননে মেধায় চেতনায়।
আগুনের ডানা ওড়ে। ভাঙনের নকশিকাঁথা দিন রাত, তবু চলে শিকড়
সন্ধান
আগুনেই পুড়ে পুড়ে আজো আছো আগুনের গান।"

এই আগুনের ডানা ও শিকড়ের সন্ধান তাঁর সময় চেতনাকেও দ্বান্দ্বিক করেছে। নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। পাঠককে তাঁর ভাষার সামনে এনেছে।

"নিজের সঙ্গে নিজের কীসের লুকোচুরি? দায় কি নেই?
যাই, যাচ্ছি বলে কেবল চোখ ঠেরেছি দীর্ঘ দিন
আর্ত মানুষ, দুঃখী মানুষ ডাক দিয়ে রোজ যায় আমায়
বুকের ভিতর থরে থরেই ওদের ভালোবাসার ঋণ।

মানুষ কেন পাথর হবে? দুই চোখে তার থাকুক জল।
মানুষ কেন আমরা-ওরায় ভাগ হয়ে যায়? অর্থহীন।
মানুষ এখন উষ্ণতা চায় মানুষ একটু ভালোবাসা
মানুষ তোমার জন্যে আমি, তোমার কাছেই আমার ঋণ।"

উৎস : সময় তোমাকে/উৎসব সংখ্যা-২০১০

কবি গণেশ বসু

গৈরিকা ঘোষ

পাঁজর কাঁপানো একটি দশক—ষাটের দশক। জীবনের সকল দিশায় দুর্দহনের জ্বালা। তরুণ প্রজন্মের শিরায় শিরায়, শিকড়ে শিকড়ে সর্বশূন্যতার হাহাকার। আপোষ, মুখোশ, মেকীর আড়াল নিয়ে চলা জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তরুণ কবিরা কখনো যৌথ আন্দোলনে, কখনো বা ব্যক্তি প্রয়াসে কবিতায় আশ্রয় খুঁজেছেন, খুলতে চেয়েছেন নতুন কোন দিগন্ত। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের কবিতা তখনও অজস্র ধারায় বিচ্ছুরিত। তারই পাশে দাঁড়িয়ে ষাটের কবি নিজের স্বতন্ত্র অবস্থানকে খুঁজেছেন, অন্তরানুভবকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

এই সময়-পটে কবিতায় এলেন কবি গণেশ বসু। গণেশ বসু সে-ই কবি যিনি সময়ের স্রোতে আপন্ন হ'য়েও তৃণের মতো শুধু ভেসে যান না, সেই স্রোতের প্রতিটি ওঠা-পড়াকে আস্বাদন করেন, বিশ্লেষণ করেন, গড়ে তোলেন আপন অভিজ্ঞতার জগৎ, আর সেই অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান ক'রে সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতা।

একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা নিয়ে কাব্যজগতে পা রাখলেন এ-কবি। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' নামক কাব্যগ্রন্থটিতে বিভিন্ন কবিতার শরীরে, আত্মায় ছড়িয়ে আছে প্রেম, প্রেমের স্মৃতি, প্রেমের নানা রূপ-রঙ। বাসনার রঙ আছে, কামনার তাপও আছে, কিন্তু দেহ নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই—তেমন সমারোহও নয়। তবু দেহও আছে আর আছে বহুতলবিশিষ্ট মন।

প্রথম কবিতার প্রথম পংক্তি 'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'। গ্রন্থনামে একটি নারীর নাম 'বনানী' ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রথম পংক্তির এই 'সে' শব্দ এর মধ্য দিয়ে একটি নারী অবয়বী হতে চায়। সে নারী কবির বাস্তব জীবনের না কল্পনায় গড়া, জীবনানন্দের বনলতা না সুনীলের 'নীরা'র অনুরূপ এ আলোচনার অবকাশ হয়তো আছে। কিন্তু আমার আলোচনার বিষয় এটা নয়—কবির প্রেমভাবনা-ই আমার আলোচনার লক্ষ্য বস্তু।

চারদিকে তখন সমকালের ছবি আঁকার দুরন্ত প্রবণতা। সমসময়কে তুলে ধরার সব প্রয়াসই যে অকৃত্রিম ছিল এমনও নয়। আর গণেশ বসু নিজেও যুগের একজন

উৎসুক দর্শক। তবুও তিনি প্রেমের কবিতাই লিখলেন। কেননা কবির আন্তরসত্তা তখন প্রেমেই আত্মপ্রকাশ খুঁজছে। এ-কবি কৃত্রিম অনুভবে কবিতা রচনায় আগ্রহী নন—প্রচলিতের স্রোতে গা ভাসাতেও চান না। যা ভেতর থেকে আসে তাকেই কবিতায় রূপ দেন। তাই প্রেমের কবিতাই লিখলেন—আর সে প্রেম তো বায়বীয় জগতের নয়, রূপকথাও নয়, এই বাস্তব সময় থেকে ক্রম জায়মান এক অনুভব।

তবে একথা বলে নেওয়া ভালো যে প্রথম কাব্যের বহু কবিতার প্রেমানুভবে আবেগ তারল্যের অপরিপক্কতা আছে। তারুণ্য-যৌবনের আবেগ-বাহুল্য, স্মৃতিভাবাতুরতার প্রাবল্য, অতি সারল্যে বিবৃতিদান কবিতার শিল্পব্যঞ্জনাকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু এ-কাব্য গণেশ বসুর অন্তর্লোককে পাঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি উৎস, কবির কাব্যজীবনের প্রারম্ভ পদক্ষেপ। আর এ-কাব্যে কবির প্রেমভাবনা ব্যক্তিভাবনার গণ্ডী পেরিয়ে ক্রম-প্রসার লাভ করেছে, প্রেমের বহুমাত্রিক অর্থ ধ্বনিত হ'য়েছে কোনো কোনো কবিতায়।

স্মৃতি এ-কাব্যের ধ্রুবপদ। 'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার' প্রথম কবিতার প্রথম পংক্তিতে কবি জানালেন 'স্মরণের পটে তিনি আমরণ ধরে রাখবেন তাঁর প্রেম বা প্রেমিকাকে'। সুধীন্দ্রনাথের 'শাশ্বতী' কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তি— ''সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে আমি কভু ভুলিব না', সেখানেও স্মৃতিতে ধরে রাখার এক দুর্মর প্রতিজ্ঞা আমরা শুনেছি। গণেশ বসু আলাদা এখানেই যে তিনি জানালেন তাঁর স্মরণে থাকবে নিয়ত অশ্রুপাত। ব্যক্তিক হৃদয়ের স্মৃতিময়তা তাঁর বহু কবিতার একটি বিষাদম্লান পরিমণ্ডল তৈরী করে। বিষণ্ণ কবির অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস—

'তুমিহীন কাটেনা সময়' (১ নং)।

বিগত মিলন— দিন আর ফিরে আসবে না, বিরহ কবিকে শূন্যতায় পৌঁছে দেয়—কবির আকুলতা প্রকাশ পায়—

আর কোনদিন দেখব না আমি তাঁবুর মতো
আকাশও মাথা ঝুঁকিয়ে আমার বুকে।
আর কোনদিন পাবো না সেদিন তোমার কাছে (৩ নং)

স্মৃতি ও স্মৃতিতাড়িত অনুভবের এ জাতীয় অজস্র পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে এ-কাব্যের নানা কবিতা থেকে। স্মৃতির ক্রন্দন কবির সহনীয়তার সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন কবিকে বলতে হয়—

..... তবুও আমায়
তোমাকে ভুলিতে হবে। অসম্ভব। তবু প্রয়োজন
কেননা অসংখ্য স্মৃতি অবিরল করিছে ক্রন্দন। (১১নং)

স্মৃতির মায়ামমতার চৌম্বক আকর্ষণ পেরিয়ে কবি শুদ্ধতম ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হ'য়েছেন। প্রেম-ভাবনা অন্তরের গভীরতর স্তরের সঙ্গে অন্বিত হয়ে ক্রমে ব্যাপক ও গভীরতর হ'য়ে উঠেছে। কবি উপলব্ধি করছেন ভালবাসা পেলে জগতের সব পাওয়াকে তুচ্ছ করা যায়—

ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা ?
কুবেরের কামকুণ্ড—রাজ্যপাট—সম্মান ইত্যাদি
অথবা প্রভূত যশ, কবিখ্যাতি বিষাদ প্রতিমা
কিছুই চাহিনা আমি। রচে যাবো বিষণ্ণ সমাধি
পবিত্র শিল্পের বুকে যদি পাই ঘৃণিত শোণিতে
শুদ্ধতম ভালবাসা কোনদিন। (১২ নং)

অবশ্য মাঝে মাঝেই কবি ফিরে যান ব্যক্তিভাবনামূলক প্রেমের জগতে। কবি তাঁর প্রেমের একনিষ্ঠতা দেখাতে উচ্চারণ করেন—

তোমার হৃদয় ভিন্ন আর কোন হৃদয় ভাবিতে
কখনো পারিনা আমি (১৪ নং)

তিরিশের কবি বলেছিলেন—"সুরঞ্জনা, ঐখানে যেও নাকো তুমি/বোলনাকো কথা ঐ যুবকের সাথে", আর ষাটের কবি নিজের নিষ্ঠার কথাই জ্ঞাপন করেছেন।

তবে এ কাব্যে প্রেমের ভাবনা অনেক সময়েই অত্যন্ত ব্যক্তিসীমানায় আবদ্ধ হ'য়ে যায়। কখনো কখনো মনে হয় জীবনঅভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফ তুলেছেন কবি। তবে স্মৃতির আবেশ ভিন্নতর একটি আস্বাদ্যতা তৈরী করে দেয় বলে সার্বিক ব্যর্থতা থেকে কোন কোন কবিতা মুক্ত হ'তে পারে। গভীরতর উপলব্ধিতে প্রেম কখনো কখনো শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে—

অনিন্দ্য শিল্পের খোঁজ যদি পাই এইখানে বলিব তাহারে
কিছুই চাহি না আমি, চাহি শুধু ভালবাসা, বনানী তোমারে (৮ নং)

প্রেম, প্রেমের আধার নারী এই নিয়েই বুঝি কবির শিল্পের অর্ঘ্য রচনা করতে চান। 'বনানী' ব্যক্তিসীমানা ছাড়িয়ে প্রসারিত প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। জীবনের শূন্যতা থেকে উঠে আসার জন্য নারীর প্রেম অবলম্বন হ'য়ে ওঠে কবির কাছে।

এই প্রেমভাবনা স্বদেশের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে এক হয়ে যায়—

সৃজনে আবেগে ধ্বংসে বারুদের গন্ধে দৃশ্যে কার মুখ, কার?
জন্মভূমি? অথবা বনানী! (১৮ নং)

প্রেম, নারী, স্বদেশানুরাগ কবির চেতনায় একাত্ম হ'য়ে ধরা পড়েছে।

সমকালের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কবিকে কখনো কখনো ভাবতে হয় প্রেম 'বিষের আধার', 'মুমূর্ষ সঙ্গীত'। চারদিকে অপ্রেমের ভয়ঙ্কর উৎসব। অথচ কবি

তার মন, মনন, বোধ দিয়ে জানেন এই অনিশ্চয়তায় ঘেরা বোবা পৃথিবীতে ভালবাসার আশ্রয় ছাড়া জীবন বাঁচবে না—সৃষ্টি হবে না। তাই আহ্বান—

বরং জুলিয়া ওঠো, জ্বলে ওঠো, মশাল জ্বালাও
প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে, কোষে কোষে শ্রুতিতে শ্রুতিতে
তোমার সৃষ্টির বীজ, জেগে ওঠো আমাকে জাগাও
বনানী বাঁচাও তুমি দুর্নিবার মাধবী সঙ্গীতে। (২৪ নং)

এ কবি উপলব্ধি করেন প্রেম ছাড়া সমাজের নীড় নষ্ট হয়ে যায়। প্রেম এক সার্বিক শুভ উপলব্ধি হয়ে ওঠে। প্রেম 'প্রজ্ঞাময় বাতায়ন, আলো জল মুক্তির সরণি'।— 'দীপাবলি হ'য়ে ওঠো আমৃত্যু তোমারই গান গাই' এ প্রশান্ত উপলব্ধির বাণী কবি শোনালেন ৩৭ নং কবিতায়।

পরবর্তী কাব্যইতিহাসে কবির পদচারণা জীবনের বিচিত্র এবং বিস্তারিত ক্ষেত্রে। কিন্তু সেখানেও প্রেম, প্রেমের স্মৃতি, নারী এসেছে মাঝে মাঝেই। সময়ের স্রোত যখন কর্দমাক্ত, অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর তখন কবি বললেন—

..... দুর্মর
এ জীবনে আলো চাই, (তুমি
সেই আলো; স্নিগ্ধ পটভূমি।। (তুমি/নিজের মুখোমুখি)

এই অসুস্থ, মূল্যবোধহীন পৃথিবীকে নীরোগ করার জন্য কবি চেয়েছেন—

পাতায় পাতায়
দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা, জাগুক হৃদয়
ভালবাসা
তৃতীয় নয়ন। (দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা/নিজের মুখোমুখি)

ভালবাসা তার কাছে এক 'শাশ্বত বিস্ময়' তার রূপ বদলায়, অর্থ বদলায়। প্রেমের স্মৃতি অনেক বস্তুঘেঁষা চেতনায় জেগে ওঠে। কবি ক্রমে ক্রমে সোচ্চার হ'য়েছে। সমাজ, সময় ও জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার চিত্রাঙ্কনে। কবির প্রেমের অর্থ তখন জীবনের সুস্থতা, আলোকময়তা, চেতনা ও প্রজ্ঞা। কিন্তু 'বাঘের থাবার নিচে' কাব্যগ্রন্থে আবার ফিরে এল প্রেমের স্মরণচিত্র—

তার ঠোঁটের মতো সুন্দর সঙ্গীত আমি কখনো শুনিনি
তার চোখের মতো শান্তির আকাশ আমি একটিও দেখিনি
(আকাশ/বাঘের থাবার নিচে)

'সে' কবিতায় কবি বলছেন—

অথচ তার বয়স ঘুমোয় আমার বুকে
আমার শিরায় ঘুমোয় তার স্বপ্ন

এ প্রেম বাস্তবে হারিয়ে গেলেও স্মৃতি হ'য়ে অন্তরে থাকে, ঘুমোয় কিন্তু মরে না। প্রেমের দিগন্ত এখন অনেক ব্যাপ্ত, ব্যক্তিসীমানায় আবদ্ধ নয়—

তোমার গানই দুঃসাহসী সন্নিহিত সুখ
বাইরে যাওয়া আসা,
সারাটা দেশ তোমারই মুখ, তোমারই ঘন মুখ
মুখর ভালবাসা। (তোমাকে/বাঘের থাবার নিচে)

কবি গণেশ বসু সমাজ, সংসার, জীবনের উৎসুক মনোযোগী দর্শক। সেই দেখা কবিতায় কথা বলে। সমকাল চিহ্নিত হয় কবিতায়। কিন্তু সমকালের কথা, চিরকালের বোঝাটিকে কাঁধে না নিলে তো তা শেষ পর্যন্ত কবিতা হয় না। গণেশ বসু সম্পর্কে প্রচলিত মূল্যায়ন তিনি সমাজসচেতন। অবশ্যই সত্য এ উক্তি— কিন্তু এ যেন সব নয়, যেন আরও কিছু আছে বলার। গণেশ আসলে সমাজের উপরিতলের কথা বলেন না, বলেন সমাজের অন্তর্নিহিত জীবনস্রোতের কথা, যেখানে মানুষ তার দারিদ্র্য, বঞ্চনা, পীড়ন নিয়ে থাকে, থাকে আপোষ, স্বার্থপরতা, লোভ নিয়ে। আবার থাকে প্রেম-প্রীতি বেদনা-বিষাদ নিয়েও। নানা সরল, জটিল অনুভবের আবেগ বোধ বুদ্ধি ধরা পড়ে সেখানে, যুক্তি বুদ্ধি মননে গড়ে নেওয়া এই সামগ্রিক দৃষ্টি তাঁকে অনেক ক্ষেত্রেই সময়-সীমার খণ্ডতা থেকে তুলে আনে। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে এর অভাবও আছে— সমকালের চাপ কবিকে দিয়ে শুধু ক্ষণকালের কথাও বলিয়ে নেয়। কিন্তু সেখানেও কবির আন্তরিকতা, উপস্থাপনের দৃঢ়তা পাঠককে আলোড়িত করে।

এই কবির বালক-স্মৃতির আলোছায়ায় মেশানো আছে স্বাধীনতালাভের রক্তভেজা স্মৃতি, আছে শিকড়-ওপড়ানো উদ্বাস্তু মানুষগুলির বিপর্যয়, অপমানের নানা ঘটনা অনুষঙ্গ। এই স্মৃতিকে বুকে নিয়ে কবি পায়ে পায়ে জীবনের পথে এগিয়েছেন, বয়স বেড়েছে তাঁর এবং স্বাধীনতারও। কিন্তু কবি দেখেছেন লোভ, স্বার্থপরতার অবাধ নির্লজ্জ চর্চা, দেখেছেন বিবেকহীন যান্ত্রিকতার বিপুল আয়োজন, রাজনীতিতে অহঙ্কারের কর্ষণ। কবি পীড়িত হ'য়েছেন, বিষণ্ণ হয়েছেন—প্রতিবাদে এগিয়ে গেছেন।

তাঁর অধিকাংশ কবিতা দাঁড়িয়ে আছে জীবননিষ্ঠ কাল সজাগতার ওপর। অধীতবিদ্যা, রাজনৈতিক আদর্শ, স্বদেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ, বিভিন্ন, বিচিত্র মানব-কর্মশালার সঙ্গে সম্পৃক্তি তাঁর বোধ ও মননের জগৎ তৈরী করেছে। যে জগৎ প্রগতিশীল চেতনায় নিষ্ঠ, মানবিক ভাবনায় জাগ্রত। অনুশীলিত চেতনা ও অন্তরস্থিত প্রেরণা। আবেগ এই দুই-এর অন্বয়ে গড়ে ওঠে কবিতা। প্রগতিচেতনা, রাজনৈতিক আদর্শ, মানবিক ভাবনা, সামাজিক ঘটনা তাঁর কবিতার সংবাদ তৈরী

করে। কিন্তু একমুখী দৃষ্টি নিয়ে জীবনের সামগ্রিকতাকে সীমিত করতে চান না কবি। প্রগতিশীল চিন্তার একটি বিকাশকে তিনি ধরতে চান। একটি সামাজিক বিবেক থেকে তিনি গোটা জীবনের অর্থ খোজেন, খণ্ড সময়ের পটভূমিতে। এই বিবেকই তাঁকে কাদায়, হাসায়, ক্রুদ্ধ করে, প্রতিবাদী করে। তবুও গণেশের কোন কোন কবিতা যে প্রচার বার্তা হয়ে দাঁড়ায় না এমন নয়। তবে কবি সজাগ, তাই সমকালীনতা থেকে উঠে এসে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে কথা বলায় প্রয়াসী থাকেন।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ" কাব্যগ্রন্থের '২৩ নং' কবিতায় কবি বললেন, 'বাস্তব কঠিন বড়ো, নিষ্ঠুর সময় ধাবমান।' এই কঠিন বাস্তব ও নিষ্ঠুর সময়কে সঙ্গী করে পথ চলতে চলতে কবি আঁকেন নিমর্ম সময়ের ছবি, কঠিন বাস্তবের রূপ। কিন্তু বিবৃতিকার হলেই তো কবির কাজ শেষ নয়, নিজেকে যাচাই করতে হয়—বস্তুর প্রাত্যহিকতার রঙকে, চিরকালের বর্ণে পরিণত করতে গেলে কবিকে বসতে হয় 'নিজের মুখোমুখি'।

'নিজের মুখোমুখি' গণেশ বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। আত্মমুকুরে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বৈতরূপ, দেখতে চেয়েছেন আত্মসুখী আপোষী ব্যক্তিমানুষ ও অন্তরের গভীরে গুমরে ওঠা সামাজিক প্রতিবাদী সত্তা উভয়ের মুখোমুখি অবস্থান। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিসত্তায় নিজের সত্তাকে সঞ্চারিত করে দিয়ে সমাজসত্তার উদ্বোধনের পথ খুঁজেছেন। ক্রমে ক্রমে আত্মসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তৃতি ঘটতে থাকে। বহির্জগতের ঝড়, কালের সঙ্কট কবিচিত্তকে মথিত করতে থাকে। 'আমারো যৌবন কাঁদে কালের সঙ্কটে'। কবি উপলব্ধি করেন—

নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালে প্রতারণা
অন্ধতা আরো গভীরতর।
(নিজের মুখোমুখি/নিজের মুখোমুখি)

ইতি-নেতির আবর্তসঙ্কুলতায় জীবনের চলমান স্রোতকে কবি তুলে ধরতে চান। এ যুগে স্বপ্ন বিচূর্ণিত, শূন্যতাই মনের সঙ্গী, সমুদ্র আর আকাশের মুক্তিকে আহত করতে চায় নির্জনতার রিক্ততা। কিন্তু কবি আবিষ্কার করতে পারেন যে জীবনের গতিময় অগ্রসরণে কোথাও আছে প্রাণের উত্তাপ—

সূর্যের দেশে আমদের যাত্রা অব্যাহত, এবং
আকাশ তার পটভূমি। (যদিও জলের গভীরে/নিজের মুখোমুখি)

কিন্তু যুগে যুগে মানুষের প্রতি যে নির্মমতা, বঞ্চনা, প্রভুত্বের অত্যাচার বর্ষিত হ'য়েছে তার স্মৃতি মরে না। সেই স্মৃতির আর্ত হাহাকার কবির চোখে আকাশ ও সমুদ্রের মাধুর্যকে আবৃত করে দেয়—

বুকের তলদেশে
হাজার হাজার বছরের প্রাচীন হাহাকার—
তীক্ষ্ণতর হ'য়ে সমুদ্র আর আকাশকে ঢেকে দায়
আকাশ আর সমুদ্রকে। (যদিও জলের গভীরে/নিজের মুখোমুখি)

যদিও আমরা জানি এ কবি হতাশার কবি নন, তাঁর বুকে স্বপ্ন আছে, তাঁর চোখে আঁকা আছে লক্ষ্যভূমির চিত্রপট। তবুও আধুনিক কবি তো কল্পনার ফানুসে চড়ে স্বপ্নপূরণের মায়া-মন্ত্র জপ করেন না, তাই প্রশান্ত ভঙ্গিতে তাঁকে যুগের সত্যবাণী উচ্চারণ করতে হয়—

সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌঁছন গেলনা
পৌঁছন যাবেনা বুঝি কোনোদিন
(সোনালি গির্জার মোরগচূড়া/নিজের মুখোমুখি)

কবি জানেন আলোর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে দুর্জয় পাহাড় ডিঙোতে হয়, মৃত্যু, দুঃখ ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়, সেই আলোকভুবনের স্বর্ণালি রূপও কবির অজানা নয়। সেখানে প্রেম আছে, প্রাণ আছে, সুর আছে। কিন্তু তবু কবি বেদনার সঙ্গে জানেন— সোনালি গির্জার মোরগচূড়ায় পৌঁছন গেল না। কবির কণ্ঠে কি হতাশা? শেষ পংক্তিতে প্রশ্নবোধক চিহ্নে কবির জ্ঞাপন "সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় কেউ পৌঁছতে পারে না?" ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কবি কি বলতে চাইছেন যে আজ না হ'লেও একদিন কি পৌছন যাবে না?

এতো অসময় মানুষের ইতিহাসে
কখনো কি এসেছিলো? (এ বুকে)

এ প্রশ্ন কবিকে তাড়িত করে। কবি দেখছেন একদিন যে মহামানবরা সভ্যতাকে মানবিকতার মন্ত্রে উদ্ভাসিত করেছিল আজ এই স্বার্থান্ধতায় নিশ্চয়ই—

এবং নিভৃতে তাই অসহায় সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল
তথাগত বুদ্ধ, খ্রিস্ট, কনফুসিয়াস মৌন যন্ত্রণায়
কেঁদে যায় অবিরল শুন্য হ'তে মহাশূন্যতায়
(চব্বিশ হ'লনা শুরু/এ বুকে)

চারদিকে সময় উত্তাল। যুবশক্তি দীর্ঘকাল অবসাদে থাকেনা। তাই প্রতিবাদ ফুঁসে উঠছে। শুরু হ'য়েছে রক্তের অভিযান। দেশ জুড়ে মরণপণ সংগ্রাম। কলকাতা কেঁপে উঠেছে খাদ্য-আন্দোলনের জোয়ারে। বিদ্রোহী যৌবন মরণের সঙ্গে যেন পাঞ্জা কষা লড়াই-এ নেমেছে। সংগ্রামের অনলরেখা মানুষের শিরায় শিরায়, রোমে রোমে গুমরে গুমরে ধূমায়িত ছিল আজ তা জ্বলে উঠেছে। কিছু একটা করার অস্থির উত্তেজনায় রক্তের গভীরে উত্তাল তরঙ্গ। কবির নিজের রক্তের দোলায় দুরন্ত মহিষের দাপদাপানি। স্বাভাবিক জীবনের মূলে টান পড়ে। 'খ্যাপা', 'সমুদ্র মহিষ' প্রাত্যহিকতার স্রোতকে ছত্রখান করে দেয়—

মাঝে মাঝে খেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্র মহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে বাহুর পারদে
ভয়ঙ্কর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল। (সমুদ্র মহিষ/এ বুকে)

পাঠকের 'ভেতর বুকে'ও জ্বলে ওঠে ফসফরাস, ভয়ঙ্কর অস্থিরতা। নিজের বৃত্তে ঘোরার, যে আত্মসুখ তার গোড়ায় টান লাগে, অপরাধবোধ জেগে ওঠে। প্রতারণা, ছলনা, হিংসা, সন্ত্রাস, ভোগ আর স্বার্থান্ধতা, মৃত্যু আর দারিদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির দুর্বার ক্ষ্যাপা মহিষের দুরন্ত শ্বাস আজও যেন আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। এ কবিতা তাই সাময়িক এবং শাশ্বতিক উভয় মূল্যে মূল্যবান। কবি যেন নিজেকে শান্ত করতে পারছেন না। এত মিথ্যা, এত মেকীর মধ্যে প্রতিবাদও যেন দানা বাঁধতে পারছে না। আত্মনির্মোহে বসে থাকা ছাড়া পথের দিশা নেই। অথচ কবি উপলব্ধি করেন এখনো নীরোগ হবার সময় আছে। এখনও স্বপ্ন আছে, মৃত্তিকার টান আছে, মিলন প্রত্যাশা আছে, কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই থাকে যদি না তাকে সাকার করার প্রয়াস বা সংগ্রাম থাকে। তাই

..... চাই
এখন আগুন
দ্রুত এসে লুফে নিক দক্ষিণের পাথুরে প্রান্তর
মৃত গোলাপের চারা উঠুক উঠুক
ভ'রে দশ দিক, মুছে এ ভাঙা দেশের
যন্ত্রণার চিহ্ন সব, পাতায় পাতায়
দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা, জাগুক হৃদয়
ভালবাসা।
তৃতীয় নয়ন।। (দুরন্ত আলোর তৃষ্ণা/এ বুকে)

পরবর্তী কাব্য 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'। প্রতিবাদী কণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রকাশ এ কাব্যে। 'ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে' (সিংহ : রক্তের ভিতরে রৌদ্র)। এই পংক্তিতে কবি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে রৌদ্রের উত্তাপ, রক্ত যেন ফুঁসছে, ফুটছে। জীবনের অনেক অপচয় বহুদিন ধরে, শ্রমিক মূল্য পায় না, মানবিকতার স্থান নেই জীবনে। এক অমোঘ আহ্বানের অনিবার্যতায় জেগে ওঠা চাই—

তাহলে, তাহলে কই কোন্‌খানে সমুদ্র ঝাপট
চূড়ায় চূড়ায় যার সোনা ঝুলে

উথাল পাতাল বুকে টান ধরে
থরো থরো কেঁপে ওঠে আকাশ পাতাল
জ্বল জ্বল পাঁজরের অন্ধকার, আশায় মাতাল।
(সমুদ্র ঝাপট : রক্তের ভিতরে রৌদ্র)

'রক্তাক্ত জটায়ু' ডানা ঝাড়ছে, ঘৃণা, ধিক্কার, প্রতিহিংসা, 'দীপ্র অভিযান'-এ জেগে উঠেছে। ইতিহাস কবিকে প্রেরণা দেয়—

ডানা ঝাপটায় রক্তকণায় জন্মখ্যাপার কাল
স্বপ্ন আমার জঙ্গল সাঁওতাল।
.....
জঙ্গল সাঁওতাল
কালের কলসে রৌদ্রকরোটি উজ্জ্বল উত্তাল
(জঙ্গল সাঁওতাল/রক্তের ভিতরে রৌদ্র)

কবি জানেন 'স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে না' তার রক্তেও স্বপ্নের পক্ষ বিস্তার। কিছু তাজা ছেলে মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞায় টান টান মরিয়া। নকশাল আন্দোলনের সেই টগবগে যৌবন আত্মসুখকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, প্রচলিত সমাজ সভ্যতার হাড়গোড় কাঁপিয়ে দেয়। দুঃসাহসী আর আন্তরিক এই অভিযান কবিকে আলোড়িত করে। এই তারুণ্য ও যৌবনকে দমিত করতে বয়ে যায় রক্তের ধারা, জল্লাদের খড়্গ নেমে আসে। তবু এদের মৃত্যু নেই। তাদের স্বপ্ন কথা বলে রক্তের ভিতরে।

"রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন, অভিমন্যু আমার অনুজ!"
(রক্তের ভিতরে স্বপ্ন/রক্তের ভিতরে রৌদ্র)

কবি দেখেন—

সময়ের বুকে কিছু হাড়গোড়, ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা পড়ে, তৃতীয় পুরুষ উঠে আছে, হিংসার জবাবে হিংসা, মধ্যবিত্ত ত্রস্ত মেঘ উঁকি মারে লাশ ঠেলে ঠেলে।
.....
দুরন্ত দৌড়য় ঊনসত্তরের দিনগুলি, লাশ ঠেলে ঠেলে
এক একটা স্ফুলিঙ্গ দেখি ছবি হয়ে বসে থাকে কবন্ধের ঘাড়ে।
(ছবি/রক্তের ভিতরে রৌদ্র)

এই ফুঁসে ওঠা প্রতিরোধ সমাজ বদলের অভিযাত্রা কবির অন্তরে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তৈরী করে—কবি চাইছেন ঘুম থেকে জেগে উঠুক সবাই—

তাহলে এবার মুঠি তুলে ধরা যাক
পুরুষ ছিলাম, অভিযানে

ইতিহাস ক্রোধের চরায় লাঙলে-মেশিনে-গঞ্জে
দাঁতে দাঁত কঙ্কালে কঙ্কালে;
অহল্যা অনড় স্মৃতি বিস্ফোরণ।
সূর্যের দাপটে।
(রক্তের ভিতরে রৌদ্র/রক্তের ভিতরে রৌদ্র)

কবি গণেশ বসুর সমাজভাবনা এক তাত্ত্বিক রূপ নিয়েছে 'অধিকার-রক্তের-কবিতার' (১৯৭০ প্রথম সংস্করণ) নামক দীর্ঘ একটি কবিতায় গঠিত কাব্যগ্রন্থে। উনিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ একটি কবিতা 'অধিকার-রক্তের-কবিতার'। দীর্ঘ কবিতার নিজস্ব একটি প্রকরণ বিন্যাস থাকে। শুধু পংক্তি সংখ্যার আধিক্যই নয়—দীর্ঘ কবিতায় থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তার। এ বিস্তার পাঠককে বক্তব্যের অণু পরমাণুতে পৌঁছে দেয়। আবেগ, সংঘাত, নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে একটি ক্রমবিকশমান বিস্তার পাঠককে কবিতার পরতে পরতে পৌঁছে দেয়।

কবিতার মূল কথা লেনিনবাদ। সকল অন্ধকার পেরনোর পথে লেনিনের বাণীই মানস সঙ্গী। প্রতিদিনের যাপনে, সামাজিক পরিমণ্ডলে এমনকি মানুষের বোধের জগতেও অন্ধকারের বন্যা। এই অন্ধকারের ভেতর থেকেই জন্ম নেয় প্রতিবাদ, জেগে ওঠে বিদ্রোহ, সামনে থাকে স্বপ্ন—যার উৎসে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাম 'লেনিন।' ভারতবর্ষের চারদিকে তখন দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচার, হিংসার অন্ধকার। সমাজজীবনে দিকে দিকে যা ঘটছে সেই বহুমুখী বস্তুজগত-ঘটনাকে গণেশ বসু দীর্ঘ কবিতার শরীরে ধরেছেন সৎ এবং সংযত ভাবনায়। এবং এই চিত্রপটে সংস্থাপিত হ'য়েছে লেনিনবাদের সারাৎসার।

চারদিকে সময় কেমন?
ধর্ম ছিঁড়ে খায় মানুষকে, জাত ছিঁড়ে খায় মানুষকে, মানুষকে ছিঁড়ে খায় মানুষ।
তখন সঙ্গী কে?
আগুনের অন্য নাম লেনিন, ইলিচ লেনিন
.....
স্বপ্নের নাম লেনিন, অগ্নিকণ্ঠ ইলিচ লেনিন।
অন্ধকার, নিপীড়ন, প্রবঞ্চনা, থেকে জন্ম নিচ্ছে মিলিত প্রতিবাদ, যৌথ সংগ্রাম—
মিছিলে মিছিলে আলোড়ন অবিরাম
.....
যৌবন লাল, হৃদয়ে একটি নাম
লেনিন, লেনিন, শাশ্বত সংগ্রাম।

এই সংগ্রামের অধিকার আছে রক্তকণিকায়, কবিতায়, মুক্তি আর ফসলের স্বপ্নে। আর এই সংগ্রামের সার্থকতা, ব্যর্থতায় জড়িয়ে আছে সংগ্রাম আর স্বপ্নের প্রতীক লেনিন—

প্রতিটি বাঁকের মুখে মলিন মানুষ যেন
লেনিন লেনিন
অজস্র সূর্যের কণা!

সমসময়ের নানা ওঠা-পড়ার জটিল স্রোত পেরোতে পেরোতে লেনিনের স্মরণ, বিশ্লেষণ ও লেনিনবাদের মর্মর্সত্যকে তুলে ধরা এভাবেই কবিতাটি এগিয়েছে। বারবার কবি ফিরে ফিরে এসেছেন লেনিনে—জীবনের অস্তিত্বের মর্মনির্যাসে।

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' (প্রথম সংস্করণ জুন, ১৯৭১)—
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রাণময়তা ও মরণপণ দৃঢ়তা কবি গণশ বসুকে আলোড়িত করে। যেহেতু এ কবির কাছে কবিতাই সংগ্রাম, প্রেম, জীবন তাই সংগ্রামের, প্রেমের অভিযাত্রী হন তিনি কবিতার মধ্য দিয়েই। মানবিকচেতনা, গণমানসের সঙ্গে সংযুক্তি, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম ও প্রেমের সুরসৃষ্টি কবিতার মূল প্রেরণা নিহিত আছে এরই মধ্যে। গণেশ বসু সে-ই কবিতারই রূপকার হ'তে চেয়েছেন এ কাব্যে। গণশক্তির অভ্যুত্থানে তিনি দেখতে পান মানুষের বেঁচে থাকার অবিরাম প্রয়াসের ফসল। তাঁর মতে "বস্তুত কবিতা হল এমন এক শব্দশিল্প যা চিত্র ও সঙ্গীতের নিহিত মাধুর্যে, শ্রমের নান্দনিকতায় সময়-সমাজ, আবেগ-মনন, বোধবোধি, অভিজ্ঞতা-অনুভূতির মিশেলে বহুতর ব্যঞ্জনায় দীপ্ত, বহুমাত্রিকতায় ঋদ্ধ আলো অন্ধকারের জীবনচৈতন্য। তা তথাকথিত শ্লোগান নয়, আবার শ্লোগানবিরোধী ঐতিহ্য অস্বীকারে উদ্দীপক পলায়নী আত্মকণ্ডুয়নও নয়।" 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' মরণহীন মরণের গান। যে মৃত্যু অমৃতকে আস্বাদন করে সে মৃত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণে উদ্ভাসিত। কবি সেই অমর মৃত্যুর আবেগে মথিত—

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা।
চে গুয়েভারার গিটারেই খোঁজে প্রত্যাঘাতের দোলা।
এ এক সময়, দামাল সময়, হিরন্ময়!

একদিন বাংলাদেশকে মেনে নিতে হ'য়েছে রক্তক্ষয়ী বিচ্ছেদ। বুকের মধ্যে আগুন থাকলেও প্রকাশের পথ ছিল না। কিন্তু আজ প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে—

এখন নক্ষত্রে মুখ শহিদের, জন্ম সহোদর, জ্বলে আরক্ত অতীত উত্তরার
চরে ক্ষোভের করবী ফোটে, স্বদেশসূর্যের স্তবে, লক্ষ লাশ অভিমন্যু

দুরন্ত আবেগে ঋণী বাংলাদেশ, কণ্ঠ কাঁপে, স্বপ্ন ভাষা কাঁদে,
স্বাদে জীবনের, জীবন গড়ার স্বপ্নে মুক্ত অস্থিরতা। (বাঙলাদেশ।)

কবি গণেশ বসুর বুকে স্বদেশ কথা বলে। কবি দেখছেন পূববাংলায় লড়াকু যুবনেত্রী মোতিয়া চৌধুরীর মুক্তিসংগ্রামের অমেয় প্রাণশক্তি। সেই লড়াই মানুষের রক্তে জাগায় সংগ্রামের ঢেউ। ব্যক্তিমানুষ প্রাত্যহিকতার সুখ আরামে হারিয়ে ফেলে প্রতিবাদের শক্তি। কিন্তু অন্তরের গভীরে থাকে ক্ষোভ, প্রতিবাদ। অন্তরের সেই প্রতিবাদ যখন কোনো সংগ্রামের কথা বলে ওঠে তখন ব্যক্তিমানুষের সজ্ঞান সত্তায় প্রতিবাদের ভাষা মুখর হয়ে উঠতে চায়। তখন—

লড়ছি কারণ শহিদ আমার ভাষায় কথা কয়
লড়ছি আমি লড়াই জ্বলে প্রাণের অঙ্গীকার

তখন আত্মলোপী আরামের সুখশয্যা ছেড়ে সত্তা বেরিয়ে আসতে চায়—

লড়াই আমার দোটান বোধে আরেক ভাসানে
লড়ছি আমি রক্তে আমার রৌদ্র অধিকার। (রৌদ্র অধিকার)

একটি রাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণে জীবনকে দেখেন কবি। সে আদর্শ তাঁকে যে মানবিক ভাবনা দেয়, যে সহমর্মী চেতনা দেয়, যে প্রতিবাদ দেয় তাকে শিল্পিত করে কবিতায় তুলে ধরতে চান কবি। কিন্তু কবি বেদনাবিদ্ধ হন যখন দেখেন একই রাজনৈতিক বিশ্বাসের সহযাত্রী যোদ্ধাদের মধ্যে দেখা দেয় বিভাজন রেখা। মানুষের এত যন্ত্রণা, এত পীড়ন যা নিয়ে লড়াই করার, প্রতিবাদ জানানোর দায় দায়িত্ব আছে সেগুলি বিস্মৃত হ'য়ে আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত প্রগতিচিন্তাপুষ্ট 'কমরেড'গণ। কবি ক্রোধে ফেটে পড়তে চান। কখনো জাগে হতাশা, কখনো তিনি প্রশ্নে তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠেন—

কে তবে কাদের পথ বলে দেবে সোনালি গির্জার। (কমরেড)

কবি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন না—

পা থরথর টলছে সময়, দলনেতাদের কি?
লোক মরছে, পেট ধুঁকছে দুঃখ কিসের? ছিঃ। (সময়)

বিদ্রুপের লঘুভঙ্গি ধীরে ধীরে গভীর ও গম্ভীর সুরে বেজে উঠতে থাকে একই কবিতায়—

কী আর ফিরিয়ে দেবে, বজ্রগর্ভ দুরন্ত সময়
ফিরিয়ে কি দিতে পারো উন্মাদনা ষাটের পৃথিবী?
ফিরিয়ে কি দিতে পারো সত্তরের দ্রোহের আগুন? (সময়)

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' নামক কবিতায় এ কাব্যের মূল কথাটি ব্যক্ত। যে বাংলার যৌবন আজ স্বাধীনতা আর মুক্তির লক্ষ্যে জেগে উঠেছে সে বাংলার স্মৃতি এপার বাংলার অনেকের স্মৃতিতে আজও ঢেউ তোলে—কবিরও। এপার

ওপারের তুলনায় কবি তুলে ধরতে চান ওপার বাংলার যুদ্ধের মৌল প্রাণসত্তা। বাহান্নর স্মৃতি অমর একুশ, ফেব্রুয়ারী শহিদের' প্রেরণা কবিকে যন্ত্রণা দেয়, স্মৃতিময় করে। এপারের মেকী স্বাধীনতার রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেছে। আর ওপার বাংলার লড়াই তাঁকে বিস্মিত করে—

এ এক ভৈরবী বাঙলা, আশ্চর্য জাদুর।
টাঙ্কের ফিতায় নরমুণ্ডমালা দোলে,
জ্বলে মাঠ, পুড়ে যায় নব নীপবন,
জ্বলে বুক, পুড়ে যায় খর ইচ্ছাগুলি।
নদীতে লাশের ভেলা বেহুলার আরেক ভাসান। (বাঘের থাবার নীচে)

গণেশ বসুর সমাজবোধ, মানবিক চেতনা, প্রতিবাদী সত্তা এভাবেই অগ্রসর হ'য়ে গেছে। দেশ বিদেশের প্রতিবাদী আন্দোলনের মানসসঙ্গী হ'য়ে বিবেকের ইচ্ছা পূরণে অগ্রসর হয়েছেন। বাঘের থাবার নীচে'র বিভিন্ন কবিতায় কবি প্রেম, সংগ্রাম, জীবননিষ্ঠতা বলিষ্ঠ বক্তব্যে আমাদের নাড়া দিয়েছে। কবির বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বক্তব্যে ও আঙ্গিকে নতুন মাত্রা এনেছে। কবি তাঁর উৎসুক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে জেনেছেন যে আজ পৃথিবীর সময় ও জীবন যেন বাঘের থাবার নিচে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছটফট করে চলেছে। শুধু শারীরিক নয়, গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কায় কবি জেনেছেন মানুষের বোধ, বুদ্ধি, বিবেক আজ আক্রান্ত। হিংস্র শ্বাপদের থাবার নিচে আজ অস্তিত্ব, সত্তা, হৃদয়, ভালবাসা।

এ কাব্যে গণেশ তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে সাহসী বক্তব্য রেখেছেন খোলাখুলি বাকৃভঙ্গিতে। যেমন—

দিনকাল কেমন যেন বদলে গেছে
কেমন যেন সব চলে গেল মাফিয়াদের আখড়ায়
মস্তানদের খপ্পরে
কেমন যেন বদলে গেল সব কিছু
কেমন যেন বদলে যায় দিনকাল। (স্বপ্নভূমি)

কবির স্বপ্নের স্বদেশ, স্বপ্নের প্রত্যয় আজ দূর থেকে দূরে। দেশে খাদ্য নেই, গণতন্ত্র নেই, মানবতা নেই, আছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা—

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতোই আমার স্বপ্নমন্দির স্বদেশ
শ্যামাঘাসের দানাও সোনার চেয়ে দামি। (স্বপ্নভূমি)

এ অন্ধকার শুধু যে আজকের তা তো নয়—অনতিঅতীতেও ছিল হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচারের জমাট অন্ধকার। কিন্তু সেখানে একটা ইতিবাচক সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই সঙ্ঘবদ্ধ

আন্দোলনে ফাটল ধরেছে—তাই জীবন আজ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে, তাই জীবনে আজ আর স্বপ্ন নেই, তাই স্বপ্নকে নিয়ে নেই কবিতা। 'স্বপ্নভূমি' নামক দীর্ঘ কবিতায় কবির এই মানসিকতারই উন্মোচন। আকাশে, বাতাসে, হৃদয়ে যে বারুদ একদিন প্রতিবাদে ঝলসে উঠেছিল—চেয়েছিল সময়কে বদলে দিতে— সাঁওতাল, তেভাগা, নকশালবাড়ি, ভিয়েতনাম আজ আর ফিরে আসে না।

কিন্তু তবু কেউ কেউ থাকেন, এই কবিরই মতো কেউ, যাঁর কণ্ঠে বাজে

আমি পিগমিদের মাঝে পিগমি নই,
পিশাচের মতো অন্ধ নই
দলনেতার মতো নুলো নই,
নই।
.....
বইছি আমি মানুষের ইতিহাস
সাহসের ইতিহাস
রোদুরের ইতিহাস ..... (স্বপ্নভূমি)

কবি গণেশ বসুর সমাজভাবনার এক আন্তরিকতাপ্রদীপ্ত নির্ভীক উচ্চারণ আছে 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যে। সমাজের সর্বস্তরের বাইরের ছবি এবং মর্মশায়ী রূপকে তুলে ধরেছেন কবি। ব্যক্তি-কবির সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলার ব্যক্তি-ইতিহাসের চালচিত্রে যেন ফুটে উঠেছে সমাজের নানা ছবি। আমরা লক্ষ্য করেছি গণেশ বসু তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাকে কবিতা নির্মিতিতে সুন্দরভাবে কাজে লাগান। এ লক্ষণ আধুনিক কবিতার। একজন আধুনিক কবির মতোই গণেশ বসু জীবনঅভিজ্ঞতাকে পটভূমি করেছেন কখনো, কখনো বা বক্তব্যও। শুধু এ কাব্যে কেন এর আগেও।

জীবন-অভিজ্ঞ কবি সত্রাসে দেখেছেন আজ গোটা দেশ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত— এ সন্ত্রাস শিরায় শিরায়, পরতে পরতে ঘুণ-ধরানো এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সঞ্চারিত। জীবনের প্রতি ভালবাসা আছে এ কবির—আছে দেখার চোখ। তাই নীতি, মূল্যবোধ ও মানবিকতার বিনাশ দেখে ক্ষুব্ধ হন—"এ কোন কালো দিঘির থেকে উঠলে জেগে ঢেউ/ মাথায় জ্বলে চিতা (প্রার্থনা : নীরব সন্ত্রাস)। এরই মধ্যে কবি খুঁজে বেড়ান সহমর্মী মানুষকে, মুখোশহীন মানুষকে—

কার কাছে যাই, কার কাছে যাই, কার কাছে যাই
কথা বলার মতন মানুষ কোনখানে পাই।
কোন্‌খানে পাই,
কোন্‌খানে পাই, আজকে বলো। (কাকে বলি/নীরব সন্ত্রাস)

কবির এ প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন নয়— এক আর্ত কাতরতা—প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত যে উত্তর তা আমাদেরও কাতর করে। কবি অবশ্যই পাঠকের ওপর তাঁর বক্তব্য চাপিয়ে দিতে চান না, কিন্তু দৃঢ়, আন্তরিক সুরে এমনভাবে বিষয়কে উপস্থাপিত করেন যা পাঠককে ঐ বক্তব্যের সঙ্গে অন্বিত করে দেয়। 'সমীক্ষা' কবিতায় 'নীরব সন্ত্রাস'-এর শঙ্কাকে আঁকছেন। কবি সমীক্ষায় বসেছেন। সত্য পরিচয়ে সমাজের কোন স্তরের মানুষই জীবন যাপন করছে না। আপাতভাবে যে প্রতিষ্ঠিত সুখী, তার মনের মধ্যে অসুখের তীব্র কামড়, তীব্র তৃষ্ণা সুস্থতার। কোথাও ইতিমূলকতা নেই, আছে— 'যুদ্ধহীন মৃত্যু আছে, দাঙ্গাহীন খুন, প্রেমহীন প্রেম আছে অশ্রুভরা তৃণ।' (সমীক্ষা/নীরব সন্ত্রাস)

'রঙ বেরঙের মুখোশ পরে' সমাজ যেন 'আত্মঘাতী' হ'য়ে উঠেছে। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার অহঙ্কারে স্ফীত হ'য়ে একদল মানুষ মেতে উঠেছে 'তিমির বিলাসে'।

জীবনদর্শক, জীবনবিশ্লেষক এক কবির বেদনাগূঢ় অথচ অমোঘ সত্যবাণীর বলিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা গেল 'বলবে তারা বলবে' কবিতায়। জীবনের সকল স্তরের মানুষের প্রতি তিনি আঙুল তুলেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ের দৃপ্ততায়। একজন 'প্রোফেট'-এর মতো তিনি ঘোষণা করছেন— 'বলবে তারা বলবে'। প্রত্যেককে বলছেন 'জিজ্ঞেস করো' আবার সকলের সম্পর্কেই বললেন—'বলবে তারা বলবে', কি বলবে কবি নিজেই জানালেন—

বলবে তারা বলবে
সন্ত্রাসের থেকে ফের জন্ম নেয় আরেক সন্ত্রাস
বলবে তারা বলবে
নীরব সন্ত্রাস আজো বর্ণময় খরার দাপটে।
(বলবে তারা বলবে/নীরব সন্ত্রাস)

শুষ্ক, নীরস, সৃষ্টিহীন খরা সন্ত্রাসকে প্রাণ দেয়, এমনও তো বলা যায় নীরব সন্ত্রাসের ঘুণপোকা জীবনকে খরা-দগ্ধ করে।

জীবনের সজীবতা হারানো রূপ অর্থাৎ সেই খরার কথাই আসে 'এলোমেলো' কবিতায় ছোট ছোট স্তবক বিন্যাসে। বক্তব্যে কোথাও এলোমেলো নয় এ কবিতা, ভেঙে-পড়া মূল্যবোধের কথাই বলেছেন অভিনব আঙ্গিক বিন্যাসে।

'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যের মর্মবাণী 'খ' নামক দীর্ঘ কবিতাটি।

'খরার ভিতরে আমি খরা হ'য়ে এখন ঝিমোই।'

'আমি' নামক ব্যক্তি-কবির উপস্থিতি প্রথম পংক্তিতেই। কিন্তু তারপেরই পটভূমি বিস্তৃত। স্বাধীনতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তুর মিছিল এসব

অভিজ্ঞতা অবশ্যই কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত প্রাত্যহিকতায় জড়ানো শৈশব স্মৃতি! এই স্মৃতির সূত্রে আসে—ওপার বাংলায় জীবনযাপনের নিজস্ব কিছু প্রসঙ্গ—ঠাকুর্দা, জেঠামশায়, বাবা—তাঁদের সমৃদ্ধি, প্রতাপ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। আসে পূর্ববাংলার নদী, ফুল, ফল, পাখী, আসে হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থানের সাবলীল জীবনছন্দ। এই জীবন চিত্র হয়তো গণেশ বসুর ব্যক্তিজীবনের বাস্তবচিত্র—কিন্তু এ কবিতার মূল্যায়নে সে প্রসঙ্গে খুব বড়ো ভূমিকা নেয় না। 'আত্মজৈবনিক'-এ অভিধা এ কবিতার ক্ষুদ্র একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। এ জীবনচিত্র তো স্বাধীনতালাভের সময়পর্বের যে কোন শিশু, কিশোরের। পুববাংলার প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের এক সমাজচিত্র মূর্ত হয় কবির ব্যক্তিজীবনের পটে। ব্যক্তিপ্রসঙ্গের ভূমিকার গুরুত্ব সেটুকুই। কবিতার মূলকথা দাঁড়িয়ে আছে সময়, ইতিহাসের চলমান স্রোতে সমসময়ের ধ্বস্ত জীবনমূল্যে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ জীবনকে প্রীতিহীনতার শুষ্কতায় ঠেলে দিয়েছে। সমাজ, জীবন খণ্ডতায়, ক্ষুদ্রতায় নিজেকে প্রতিমুহূর্তে সীমিত করেছে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে বহু সংগ্রামে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুন মাড়িয়ে এসে খুঁজেছে নিরাপত্তা, পরিচয়, বাসস্থান। বুকে দুলেছে কান্নার ঢেউ—স্মৃতির আতুরতা, চোখে ভাসে দুর্গাপূজা, বিজয়া, স্কুলবাড়ি, নাটমন্দির। কিন্তু এর পরেও কি শিকড় হ'ল প্রোথিত? মিলল কি মিলনের গান, মানবতার মন্ত্র ? কবি জানালেন—

সব এখন স্মৃতি
ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন ইকবাল
ডুকরে ডুকরে বোবা হ'য়ে যান রবীন্দ্রনাথ

হারিয়ে গেল স্বদেশপ্রেম, হারিয়ে গেল মানুষে মানুষে ভালবাসা, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হল মন। এটাই তো খরা—কোথাও প্রাণ নেই, সজীবতা নেই, সরসতা নেই—গোটা দেশ ডুবে যায় মর্গের ভিতর।' কবিতা, গান, বোধ, প্রজ্ঞা, ভালবাসা সবই প্রাণহীন। কবি কোথাও প্রেম খুঁজে পাচ্ছেন না। জীবনের এই বিশুষ্ক ছবি পাঠককে আলোড়িত করে। শেষ পংক্তির প্রথম অংশে কবির প্রশ্ন—

খরার ভিতরে আমি খরা কেন?

ঐ পংক্তিরই শেষ অংশ—

দেশজোড়া খরা!
প্রশ্ন নয় বিস্ময়।

এ কবিতা কি হতাশার? গোটা কবিতা জীবনের নেতির চিত্রে ভরা। স্বভাবতই মনে হবে কবি জীবনের এক সর্বশূন্যতার কথাই বলছেন। অবশ্যই বলেছেন। কবি যখন প্রশ্ন করেন 'খরার ভিতরে আমি খরা কেন?' এই আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমীক্ষা

পাঠককে অর্থাৎ এ যুগের মানুষকে আত্মসমীক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। মিথ্যে আশার বাণী কবি শোনাননি। কিন্তু কবি সবার মধ্যে এ ভাবনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন—'খরার ভিতরে আমি খরা কেন?' কেননা এ ভাবনাই কেবলমাত্র বেঁচে ওঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ দিতে পারে। 'দেশজোড়া খরা'র বিস্ময়চমকিত শূন্যতায় এই আত্মজিজ্ঞাসাই কেবল ইতিময়তার দিকে জীবনকে অগ্রসরমানতা দিতে পারে। এ কবিতাকে তাই হতাশার কবিতা বা আশার কবিতা এমন কোন নির্দিষ্ট চিহ্নের ছাপ দেওয়া যাবে না। এ কবিতা এ কালের দর্পণ— এ কবিতা স্বাধীনতালাভের পর থেকে সমকাল পর্যন্ত যে ইতিহাস তার গভীর বিশ্লেষণ, এ কবিতা আজকের ঘৃণধরা জীবনপটে দাঁড়িয়ে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের এক অমোঘ নির্দেশিকা।

প্রেমচেতনা, স্মৃতিময়তা ও সমাজভাবনা এ তিন বৈশিষ্ট্যের আলোকে গণেশ বসুর কবিতাকে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও আছে নানা বক্তব্যের কবিতা। সেখানে একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাকে— থাকে স্ত্রী, সন্তান, প্রেমিকা, বন্ধুর কথা। থাকে বিদেশের অভিজ্ঞতা, স্বদেশের অনুষঙ্গ, থাকে কবির স্বপ্ন।

কবির স্বপ্ন কবিকে জীবনকে দেখার চোখ দেয়। সে-স্বপ্ন কবিকে নিয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। সন্তান কৌস্তভ তাঁর কাছে নব প্রজন্মের প্রতীক হয়ে ওঠে। তখন কবি বলতে পারেন—

তোর ভিতর আমিই খুঁজে পাই
হারানো শৈশব
.....
তোর ভিতরে সমুদ্রকে পাই
হারানো যৌবন
তোর ভিতর একটু পেতে চাই
আমার জাগরণ (চিরজীবিতেষু : নীরব সন্ত্রাস)

ভালবাসা এবং ভালবাসার স্বপ্ন মানুষকে বাঁচায়। অথচ ভালবাসা খুঁজে পাওয়া তো সহজসাধ্য নয়। তবুও রবীন্দ্রনাথ আছেন—যিনি স্বপ্নের, বিশ্বাসের—

তিনি মুক্তির পথ নির্দেশ
তিনি চলমান সুন্দর (রবীন্দ্রনাথ : নীরব সন্ত্রাস)

তবু শম্ভু মিত্র আছেন—

তোমারই ভিতর যেন নিজেকেই চিরে চিরে দেখা (শম্ভু মিত্র)

এখনও আছেন বুকের পাশে অমিতাভ দাশগুপ্ত, যাঁকে কবি জানান—

একদিন ছিল আমাদের দিন অলঙ্কার (একদিন ছিল)

ক্ষোভ, বেদনা, অভিমান, ক্রোধ বুকের মধ্যে পাহাড় হ'য়ে আছে, 'চারদিকে এখন অবিশ্বাসের আলোছায়া' চারদিকে বিরুদ্ধতা, কিন্তু তারই মধ্যে জাগল সৃষ্টির সুষমা। এল নবপ্রজন্ম—কবির ইচ্ছার আকাশে সৃষ্টি ডানা মেলল—এই নবজন্মের প্রাণমতায় কবি মেলে ধরেন তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাঁর কন্যার মধ্যে—

আমার স্রোতস্বিনী, তোমার কচি হাতের মুঠোয় এখন ঝড়ের ঝুঁটি, তোমার
কচি হাতের মুঠোয় এখন মশালমুখী দিন

ঐ কচি হাত শুধু কবির কন্যার নয়, নতুন প্রজন্মের। যাদের হাতে আছে নতুন পৃথিবী গড়ার শক্তি।

ছন্দ গণেশ বসুর হাতে খুব ভাল বাজে। বক্তব্য কখনো কখনো একঘেঁয়ে হয় তাঁর কবিতায়, কিন্তু ছন্দের সুর, তাল, লয় কবিতাকে বৈচিত্র্য এনে দেয়। পংক্তি সজ্জায় আনেন অভিনবত্ব, দৃষ্টিগ্রাহ্য কবিতার আঙ্গিকে পংক্তি বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

হাতে হাতে সেখানে নাকি ঝলসে ওঠে তরবারি
বল্লম
সড়কি
লাঠি ...।

এক শব্দের এই ঋজু পংক্তিবিন্যাস হিংসার তীব্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছে—সময়ের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে।

শব্দচয়ন, শব্দগ্রন্থনে অভিনবত্বের সন্ধান যেমন আছে, তেমনি আছে শব্দের মধ্য দিয়ে নিহিত গভীর অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টির প্রয়াস। যেমন, 'স্মরণচাপা', শশাফুলের মাধুরী', 'ভৈরবী বাংলা', 'ঠোঁটের মতো সুন্দর সঙ্গীত', 'জলপাই-রাঙা', 'রক্তকরোটি' এরকম অজস্র শব্দের ব্যবহার হ'য়েছে নতুন মাত্রায়। আবার অনায়াসে বাংলা, ইংরেজি অজস্র চলতি শব্দ ব্যবহার করেন স্মার্টলি।

কবির কলম এখনও অজস্রধারায় সৃষ্টিশীল। সুন্দরকে কুরে খাওয়া এই সময়পর্বে কবির সৃষ্টি কোন বোধ, বোধি, মননে আমাদের নব নব উন্মাদনায় প্রাণিত করে তারই প্রতীক্ষা আমাদের। যাবতীয় অপ্রাপ্তিকে বুঝে নেওয়া এবং তার ওপারে যাওয়ার নিজস্ব দায়িত্ববোধ আমাদের জাগ্রত করার কোন্ দিশা কবি আমাদের দেখাবেন জীবন-দেখা কবির কাছে সেটাই আমাদের পাবার আকাঙ্ক্ষা।

উৎস : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎসও বিবর্তন/গৈরিকা ঘোষ

সময়ের তরঙ্গে কবি গণেশ বসু

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

পশ্চিমবাংলার সমাজ-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসে ষাটের দশক এক অগ্নিগর্ভ দশক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক করাল গ্রাসের ছায়া, নিরাপত্তাহীন জীবন-বলয়ে শুধুই এক হাহাকার আর খণ্ড-বিখণ্ড উল্কাপাত। সময়ের তরঙ্গে দিশাহীন সবুজ প্রাণ নানা মুণ্ডহীন ধড়ের পাশাপাশি থাকে; কখনো কেউ নতুন আলোর খেলায় মাতে, কেউ বা চায় আলাপ-আলোচনার পথে যেতে, আবার কেউ বা রক্তপতাকায় স্বপ্ন দেখে নতুন উপত্যকার। 'রক্ত মাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি'র দান যত্রতত্র ভ্রাম্যমান। এ যেন এক বিরূপ বিশ্ব যেখানে মানুষ নিয়ত একাকী। তবুও কেউ কেউ নতুন দিগন্তের প্রত্যাশী — যৌথ-আন্দোলনে, কেউ বা কবিতার আঙিনায়, কেউ বা অন্তরানুভবকে উন্মোচিত করতে চাইছেন রুদ্র বীণার অন্তরালে। সময়ের এমনই এক তরঙ্গে গণেশ বসুর আবির্ভাব (১৯৪০) কবিরূপে ষাটের দশকে। আবির্ভাব কাল থেকেই গণেশ বসু সমাজ সচেতনতার সঙ্গে কালসচেতন। তাঁর কবিতায় বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতাও আছে, তবে তা প্রত্যক্ষগম্য না হলেও অনুভবগম্য। অসহায় মানুষের আর্তি তাঁকে ব্যথিত করার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনায় প্রাণিত করেছে। গণেশ বসুর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে — 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৪), 'নিজের মুখোমুখি' (১৯৬৭), 'সমুদ্র মহিষ' (১৯৬৯), 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' (১৯৬৯), 'অধিকার রক্তের কবিতার' (১৯৭০), 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' (১৯৭১), 'বাঘের থাবার নীচে' (১৯৮২), 'গণেশ বসুর নির্বাচিত কবিতা' (১৯৯০) ইত্যাদি। তাছাড়া 'লেনিনের যুগ' নামে লেনিনকে নিয়ে লেখা কবিতার একটি সংকলন যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলেন লেনিনের জন্মশতবর্ষে। কবিতার জগতে গণেশ বসুর আবির্ভাব 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়, তার শরীরে, আত্মায় ছড়িয়ে আছে প্রেমের স্মৃতি, প্রেমের নানা রূপ — রঙের বিভা; কামনার তাপ, বাসনার রঙ থাকলেও দেহ নিয়ে তিনি নিরাসক্ত। দেহের কথা থাকলেও সেখানে সমারোহ নেই, দেহের সঙ্গে আছে

মনের মননের কথা। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম পংক্তি 'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার।' গ্রন্থনামে 'বনানী' একটি নারীর নাম ব্যবহৃত হলেও 'সে' সর্বনামের মাধ্যমে নারী অবয়বী হতে চায়। সে নারী বাস্তব না কল্পনায় গড়া, সে নারী জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' না সুনীলের 'নীরা' তা নিয়ে আলোচনা হলেও একথা অবিতর্কিত যে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থে কবির মূল বিষয় হল কবির প্রেমভাবনা।

কবি গণেশ বসু তাঁর সমকালীন চারিদিকের দুরন্ত ছবি আঁকার প্রয়াসী। সময়কে তিনি যেমন কবিতার চিত্রপটে তুলে ধরতে চান, তেমনি তিনি আবার যুগের উৎসুক দর্শকও বটে। তবুও তিনি প্রেমের কথা লিখলেন, কেননা এ প্রেম বাস্তব অবস্থার জায়মান অনুভব; বায়বীয় বা রূপকথার জগৎ থেকে আহৃত নয়। তবে একথা যথার্থ যে তাঁর প্রেমের বহু কবিতায় আবেগ তরলতা আছে, বাহুল্য আছে, স্মৃতিভারাতুরতার প্রাবল্য আছে, আছে বিবৃতিদানের সারল্যের ফলে শিল্পব্যঞ্জনার ব্যাহত দুর্বলতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শাশ্বতী' কবিতায় বলেছিলেন — 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে/ ভুলিব না আমি, আমি কভু ভুলিব না' — এখানে আছে স্মৃতিতে ধরে রাখার এক দুর্মর প্রতিজ্ঞা। আর গণেশ বসুর কাব্যের ধ্রুবপদ হল স্মৃতি। কবির অশ্রুময় স্মৃতির চালচিত্রে প্রেম বা প্রেমিকাকে ধরে রাখার কথা। গণেশ বসু জানালেন, তাঁর স্মরণে থাকবে নিয়ত অশ্রুপাত। ব্যক্তিহৃদয়ের স্মৃতিময়তায় তাঁর কবিতায় বিষাদম্লান আবহমণ্ডল রচিত হয়। বিষণ্ণ কবির দীর্ঘশ্বাস— 'তুমিহীন কাটে না সময়।' বিগত মিলনের দিন আর প্রত্যাবর্তন করবে না বলে বিরহ কবিকে শূন্যতায় উপনীত করায় —কবির কলমে প্রকাশিত আকুলতার স্বরূপ —

আর কোনদিন দেখব না আমি তাঁবুর মতো
আকাশ মেলেছো ও-মাথা ঝুঁকিয়ে আমার বুকে
আর কোনদিন পাবো না সেদিন তোমার কাছে।

স্মৃতি ও স্মৃতিতাড়িত অনুভবের বহু পংক্তি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা গেলেও স্মৃতির ক্রন্দন সহনীয়তার সীমা অতিক্রম করলে কবিকে বলতে হয় —

.....তবুও আমায়
তোমাকে ভুলিতে হবে। অসম্ভব। তবু প্রয়োজন
কেননা অসংখ্য স্মৃতি অবিরল করিছে ক্রন্দন।

স্মৃতির মায়ামেদুর আকর্ষণ অতিক্রম করে কবি শুদ্ধতম ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হওয়ায় তাঁর অন্তরের গভীরতম অন্তঃস্থলে প্রেমভাবনা ব্যাপক ও গভীরতর হয়ে ওঠায় কবির উপলব্ধি এইরকম যে, ভালোবাসা পেলে জগতের সব পাওয়া তুচ্ছ হয়ে যায় —

ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা?
কুবেরের কামকুণ্ড — রাজ্যপাট — সম্মান ইত্যাদি
অথবা প্রভূত যশ, কবিখ্যাতি বিষাদ প্রতিমা
কিছুই চাহি না আমি। রচে যাবো বিষণ্ণ সমাধি
পবিত্র শিল্পের বুকে যদি পাই ঘৃণিত শোণিতে
শুদ্ধতম ভালোবাসা কোনদিন।

আলোচ্য কাব্যে কবির প্রেমভাবনা ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ থাকলেও কখনো কখনো তা গভীরভাবে শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় —

'অনিন্দ্য শিল্পের খোঁজ মেলে যদি কোনোদিন বলিব তাহারে
'কিছুই চাহি না আমি, চাহি শুধু ভালোবাসা বনানী তোমারে।'

অবশেষে প্রেম ব্যক্তিসীমানা অতিক্রম করে জীবনের প্রসারিত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে। প্রেম, নারী, স্বদেশানুরাগ কবির চেতনায় একাত্ম হয়ে যায়। সমকালের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কবি লক্ষ করেন চতুর্দিকে অপ্রেমের ভয়ংকর উৎসব; অথচ কবি তাঁর মনন ও বোধে উপলব্ধি করেন যে পৃথিবীতে ভালোবাসার আশ্রয় ব্যতীত মানুষ বাঁচবে না, সৃষ্টি হবে না। তাই তাঁর আহ্বান —

বরং জ্বলিয়া ওঠো, জ্বলে ওঠো, মশাল জ্বালাও
প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে, কোষে কোষে, শ্রুতিতে শ্রুতিতে
তোমার সৃষ্টির বীজ, জেগে ওঠো, আমাকে জাগাও
বনানী বাঁচাও তুমি দুর্নিবার মাধবী সঙ্গীতে।

প্রেম এক সার্বিক শুভ উপলব্ধি, প্রেম 'প্রজ্ঞাময় বাতায়ন', প্রেম ব্যতীত সমাজ বাঁচে না বলে ঘনতর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কবি বললেন —

..... দুর্মর
এ জীবনে আলো চাই, (তুমি
সেই আলো); স্নিগ্ধ পটভূমি।

কবির কাছে ভালোবাসা এক শাশ্বত বিস্ময়। প্রেমের স্মৃতি অনেক বস্তুঘেঁষা চেতনায় জেগে ওঠে। কবি ক্রমে ক্রমে সোচ্চার হয়েছেন সমাজ, সময় ও জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার চিত্রাঙ্কনে। কবির কাছে প্রেমের অর্থ তখন জীবনের সুস্থতা, আলোকময়তা, চেতনা ও প্রজ্ঞা। 'নিজের মুখোমুখি' কাব্যগ্রন্থে এটাই কবির বক্তব্য।

'নিজের মুখোমুখি' গণেশ বসুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। আত্মমুকুরে ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বৈতরূপ, আত্মসুখী আপসি ব্যক্তি মানুষ ও অন্তরের গভীরে গুমরে ওঠা প্রতিবাদী সত্তা উভয়ের মুখোমুখি অবস্থান, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিসত্তায় স্বীয় সত্তাকে সঞ্চারিত করে দিয়ে কবি সমাজসত্তার উদ্বোধনের পথ অন্বেষণ করেছেন।

আত্মসমীক্ষণের মাধ্যমে আত্মবিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। বহির্জগতের ঝড়, কালের সংকট কবিচিত্তকে মন্থিত করে তোলে। কবির উচ্চারণ —

'আমারো যৌবন কাঁদে কালের সঙ্কটে।'

কবি উপলব্ধি করেন — 'নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালে প্রতারণা
অন্ধতা আরো গভীরতর'

কবি জীবনের চলমানতার স্রোতকে তুলে ধরতে চান অস্তি-নাস্তির আবর্তসংকুলতায়। এ যুগে সব স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ, মনের সঙ্গী শূন্যতা, নির্জনতার রিক্ততা সমুদ্র আর আকাশের মুক্তিকে আবৃত করতে প্রয়াসী। কিন্তু কবির উপলব্ধি — জীবনের গতিময় অগ্রহায়ণে কোথাও আছে প্রাণের উত্তাপ —

সূর্যের দেশে আমাদের যাত্রা অব্যাহত, এবং
আকাশ তার পটভূমি।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রতি যে নির্মমতা, বঞ্চনা, প্রভুত্বের অত্যাচার বর্ষিত হয়েছে তার স্মৃতি লুপ্ত হয় না। কবির বাল্যস্মৃতির আলোকছায়ায় মেশানো আছে স্বাধীনতা লাভের রক্তভেজা স্মৃতি, শিকড়-ওপড়ানো উদ্বাস্তু মানুষগুলির বিপর্যয়, অপমানের নানা ঘটনার অনুষঙ্গ। এই স্মৃতিকে বুকে নিয়ে কবি পায়ে পায়ে জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছেন, বয়স বেড়েছে কবির, স্বাধীনতার পরও তিনি দেখেছেন লোভ, স্বার্থপরতার বাধাহীন নির্লজ্জ চর্চা, দেখেছেন বিবেকহীন যান্ত্রিকতার বিপুল আয়োজন, রাজনীতিতে অহংকারের কর্ষণা। কবি পীড়িত হয়েছেন, বিষণ্ণ হয়েছেন — প্রতিবাদে এগিয়ে গেছেন। সেই স্মৃতির আর্ত হাহাকার কবির চোখে আকাশ আর সমুদ্রের মাধুর্যকে আবৃত করে দেয় —

বুকের তলদেশে
হাজার হাজার বছরের প্রাচীন হাহাকার —
তীক্ষ্ণতর হয়ে সমুদ্র আর আকাশকে ঢেকে দ্যায়
আকাশ আর সমুদ্রকে।

কবি কিন্তু হতাশার কবি নন, তাঁর বুকে স্বপ্ন আছে, চোখে আঁকা আছে লক্ষ্যভূমির চিত্রপট। তিনি স্বপ্নপূরণের মায়ামন্ত্র জপ না করে প্রশান্ত ভঙ্গিতে তাঁকে যুগের সত্যবাণী উচ্চারণ করতে হয় —

সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌঁছনো গেল না
পৌঁছনো যাবে না বুঝি কোনো দিন।

কবি জানেন যে, আলোর লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে দুর্জয় পাহাড় ডিঙোতে হয়, মৃত্যু-দুঃখ ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়, সেই আলোক ভুবনের রূপও কবির অজানা নয়। সেখানে প্রাণ-প্রেম-সুর আছে। কবি তবুও বেদনার সঙ্গে জানেন— 'সোনালি

গির্জার সেই মোরগ চূড়ায় আর পৌঁছনো গেল না।' কবির কণ্ঠের হতাশা জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয় — 'এত অসময় মানুষের ইতিহাসে/ কখনো কি এসেছিল?' কবি এই প্রশ্নের দ্বারা তাড়িত হন। একদিন যে মহামানবরা সভ্যতাকে মানবিকতার মন্ত্রে উদ্ভাসিত করেছিল আজ এই স্বার্থান্ধতায় তাঁরা —

এবং নিভৃতে তাই অসহায় সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল
তথাগত বুদ্ধ, খ্রিস্ট, কনফুসিয়াস মৌন যন্ত্রণায়
কেঁদে যায় অবিরল শূন্য হতে মহাশূন্যতায়।

'সমুদ্র মহিষ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ১৯৬৯। কবির চতুষ্পার্শ্বের সময় উত্তাল। যুবশক্তি দীর্ঘকাল অবসাদে থাকে না। প্রতিবাদী যুবসমাজ ফুঁসে উঠেছে। দেশ জুড়ে মরণপণ সংগ্রাম, খাদ্য আন্দোলনের সংগ্রামী জোয়ারে কলকাতা কেঁপে উঠেছে। বিদ্রোহী যৌবন মরণের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ায় রত। মানুষের শিরায় শিরায় বহমান রক্তে অনলরেখা, রোমে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। একটা কিছু করার অস্থির উত্তেজনায় রক্তের গভীরে উত্তাল তরঙ্গ। কবির নিজের রক্তের দোলায় দুরন্ত অস্থিরতা — সমুদ্রমহিষের দুরন্ত দাপাদাপি। স্বাভাবিক জীবনচিত্র পরিবর্তিত হয়, প্রাত্যহিকতার দর্পণ খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে —

মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।

আসলে 'সমুদ্রমহিষ' একটি প্রতীকী কবিতা। মহিষ বিরাট প্রকৃতির একগুঁয়ে স্বভাবের প্রাণী। সমুদ্রের মতো মহিষও স্বভাবে চঞ্চল এবং গোঁয়ার প্রকৃতির। কবি তাঁর হৃদয়বিক্ষোভকে প্রকাশের জন্য আলোচ্য শব্দদুটিকে ব্যবহার করেছেন। কবির মনের উত্তেজনা সমুদ্র তরঙ্গের আঘাত এবং মহিষের রূপকে প্রকাশিত। সেই উত্তেজনা সূত্রেই 'ফস্‌ফরাস' এর শব্দচিত্রকল্প। কবির সংকল্প শত্রুকে ধ্বংস করা। 'রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন' — এখানে 'বিস্ফোরণ' শব্দটি ফস্‌ফরাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। একদিকে 'রক্তে টান' অন্য দিকে ভয়ঙ্কর অস্থিরতা মানুষকে মুক্তির ডাক শোনায়। ষাটের দশকে ভারতবর্ষ ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি। ১৯৬০-এ সারাভারত ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট, ১০ হাজার রেলকর্মী সাসপেন্ড, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কলকাতায় আন্দোলন; ১৯৬১-তে ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন আক্রমণের প্রচণ্ডতা, কাছাড় ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ, ১৯৬৪-তে চীনের পারমাণবিক বোমা

বিস্ফোরণ, ১৯৬৫-তে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ, ১৯৬৭-তে 'সারাভারত নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি স্থাপন', ১৯৬৯-এ পাকিস্তানে আয়ুব খানের অপসারণ এবং ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন, সি. পি. আই (এম. এল.) দল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এমনই এক সংকটের সময় কবি তাঁর রক্তে খুঁজে পেয়েছেন 'সমুদ্রমহিষ'কে — 'এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।' সমুদ্রের ঢেউকে যেমন রোধ করা যায় না, বুনো জেদি মহিষকে যেমন বশ মানানো যায় না, কবির রক্তের মধ্যেও তেমনি রাগ দুরন্ত মহিষের মতো ছুটে বেড়ায়। পুঁজিবাদী সমাজকে ধ্বংস করে সাম্যবাদী সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা পর্যন্ত কবির শান্তি নেই। কবির বিশ্বাস একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই মানবতার জয় সম্ভব, কবির হৃদয়ে বাসা-বেঁধে-থাকা সমুদ্রমহিষের মতো রাগ ও ক্ষোভ ভোগবাদীদের ধনতান্ত্রিক সমাজকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চায়। কবিতায় ১৯৬৪-র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের কথা এবং দেশের অভ্যন্তর সমস্যার কথা প্রতিফলিত হয়েছে :

তখন নিজেকে বড়ো অপরাধ, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
সব চেনা মুখে তাই ধ্বংসের স্যাবার
ছুটে চলে, কেউ খোঁজে কংকালের কঠিন বিবর
বিমিশ্র হৃদয়ে শুধু অসহায় আর্তনাদে, আর
ঊর্ণাজাল উত্তরে দক্ষিণে।
এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ॥

[১৯৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের স্থলবাহিনী সেনাদের সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে দেবার জন্যে গোপনে ভারতের মাটিতে ছত্রীসেনা নামানো হয়েছিল। উক্ত যুদ্ধে পাকিস্তান আমেরিকা থেকে পাওয়া 'স্যাবার জেট' নামক যুদ্ধ বিমানকে কাজে লাগিয়েছিল। তাকেই কবি 'স্যাবার' বলেছেন।]

মানুষের সৃষ্ট 'কংকালের কঠিন বিবর' মানুষ এখন খুঁজে চলেছে। এ তো কল্পনার অতীত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ তো বড়ো কলঙ্ক। এ যেমন সভ্যতার কংকালের কঠিন বিবর, তেমনি আবার সভ্য মানুষেরও। পাঠকের বুকের ভেতরেও জ্বলে ওঠে ফসফরাস, ভয়ঙ্কর অস্থিরতা নিজের বৃত্তে ঘোরার যে আত্মসুখ তার মূলে টান লাগে, অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। প্রতারণা, ছলনা, হিংসা, সন্ত্রাস, ভোগ আর স্বার্থান্ধতা, মৃত্যু আর দারিদ্র্যের মাঝখানে কবির দুর্বার ক্ষ্যাপা

মহিষের দুরন্ত শ্বাস আজও যেন মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। এ কবিতা তাই সাময়িক এবং শাশ্বতিক উভয় মূল্যে মূল্যবান।

কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'। এ কাব্যে প্রতিবাদী কণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। আলোচ্য কাব্যের 'সিংহ' কবিতায় 'ধমনীনিদ্রিতসিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে'। কবির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে রক্তের উত্তাপ, রক্ত যেন ফুঁসছে, ফুটছে। বহুদিন ধরে জীবনের অনেক অপচয়, শ্রমিক মূল্য পায় না, জীবনে মানবিকতার স্থান নেই। এক অমোঘ আহ্বানের অনিবার্যতায় জেগে ওঠা চাই —

তাহলে, তাহলে কই কোন্‌খানে সমুদ্র ঝাপট
চুড়ায় চুড়ায় যার সোনা ঝলে
উথালপাতাল বুকে টান ধরে
থরো থরো কেঁপে ওঠে আকাশ পাতাল।
জ্বল জ্বল পাঁজরের অন্ধকার, আশায় মাতাল।

'রক্তাক্ত জটায়ু' ডানা ঝাড়ছে, ঘৃণা, ধিক্কার, প্রতিহিংসা 'দীপ্র অভিযানে' জেগে উঠেছে। ইতিহাস কবিকে অনুপ্রাণিত করে —

ডানা ঝাপটায় রক্তকণায় জন্মখ্যাপার কাল
স্বপ্ন আমার জঙ্গল সাঁওতাল।
** ** ** **
জঙ্গল সাঁওতাল
কালের কলসে রৌদ্রকরোটি উজ্জ্বল উত্তাল।

'স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে না' — একথা কবি জানেন। তাঁর রক্তের স্বপ্নের পক্ষ বিস্তার। কিছু তরুণ প্রাণ মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞায় মরিয়া। নকশাল আন্দোলনের সেই টগবগে যৌবন আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে প্রচলিত সমাজ-সভ্যতার মূল্যবোধ কাঁপিয়ে দেয়। দুঃসাহসিক আন্তরিক অভিযান কবিকে আলোড়িত করে। এই তারুণ্য আর যৌবনকে দমিত করে বয়ে যায় রক্তের ধারা, জল্লাদের খড়্গ নেমে আসে। তবু তারা মৃত্যুহীন। তাদের স্বপ্ন কথা বলে রক্তের ভিতরে — 'রক্তের, ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন, অভিমন্যু আমার অনুজ।'

কবি দেখেন —

'সময়ের বুকে কিছু হাড়গোড়, ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা পড়ে, তৃতীয় পুরুষ উঠে আসে,
হিংসার জবাবে হিংসা, মধ্যবিত্ত ত্রস্ত মেঘ উঁকি মারে লাশ ঠেলে ঠেলে।'
'দুরন্ত দৌড়োয় ঊনসত্তরের দিনগুলি, লাশ ঠেলে ঠেলে
এক একটা স্ফুলিঙ্গ দেখি ছবি হয়ে বসে থাকে কবন্ধের ঘাড়ে।'

এই ফুঁসে-ওঠা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সমাজ বদলের অভিযাত্রা কবির অন্তরে সংকল্পের দৃঢ়তা তৈরি করে; কবি চাইছেন ঘুম থেকে জেগে উঠুক সবাই —

'তাহলে এবার মুঠি তুলে ধরা যাক
পরুষ ছিলায়, অভিযানে
ইতিহাস ক্রোধের চরায় লাঙলে-মেশিনে-গঞ্জে
দাঁতে দাঁত কঙ্কালে কঙ্কালে;
অহল্যা অনড় স্মৃতি বিস্ফোরণ
সূর্যের দাপটে।'

এরপর প্রকাশিত হয় কবির দীর্ঘ কবিতার বই 'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার' (মার্চ ১৯৭০)। প্রকাশক দীপেন রায়, সীমান্ত প্রকাশনী। তাঁর 'লেনিনের যুগ' নামে সম্পাদিত একটি কাব্যসংকলন আছে। তাছাড়া তিনি পরবর্তীকালে পৃথা দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মনন' সৃজন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'প্রেরণার উৎস' (১৯৯১) নামে লেনিন কেন্দ্রিক সংকলনে 'পিতা' নামকরণে ৩২ পংক্তির একটি কবিতা লিখেছিলেন। সংকলনটিতে লিখেছিলেন অন্নদাশংকর রায়, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবি।

'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার' একটি দীর্ঘ কবিতার কাব্যগ্রন্থ। কবিতাটি প্রায় ২১ পাতার। কবি গণেশ বসুর সমাজভাবনা আলোচ্য দীর্ঘ কবিতার একটি নিজস্ব প্রকরণ বিন্যাস থাকে। যেখানে পংক্তি সংখ্যার আধিক্যের সঙ্গে থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তার। আবেগ, সংঘাত নাটকীয়তার মাধ্যমে ক্রমবিকাশমান বিস্তার পাঠককে কবিতার পরতে পরতে পৌঁছে দেয়। সমালোচ্য দীর্ঘ কবিতার মূলকথা লেনিনবাদ। সমস্ত অন্ধকার পথ পার হওয়ার মানসসঙ্গী লেনিনের বাণী। প্রতিদিনের যাপনে, সামাজিক আবহমণ্ডলে, এমনকি মানবিক বোধের জগতেও অন্ধকারের প্লাবন। এই অন্ধকারের ভেতর থেকেই জন্ম নেয় প্রতিবাদ, জেগে ওঠে বিদ্রোহ, আর সামনে থাকে স্বপ্নের সূর্য — যার উৎসে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাম লেনিন। কবিতাটি রচনার সমকালীন ভারতবর্ষ দুঃখে, দারিদ্র্যে, অত্যাচারে জীর্ণ, দীর্ণ— হিংসার অন্ধকারে ইতিহাস উজ্জ্বলতাহীন। সমাজজীবনের দিকে দিকে যা ঘটেছে বা ঘটছে সেই বহুমুখী বস্তুজগতের ঘটনাকে কবি গণেশ বসু দীর্ঘ কবিতার অবয়বে ধরেছেন সংযত ভাবনায়। আর এই চিত্রপটে সংস্থাপিত হয়েছে লেনিনবাদের সারাৎসর।

কবি আলোচ্য দীর্ঘ কবিতার মুখবন্ধে বলেছেন — "গত বছরই 'লেনিনের যুগ' কাব্যসংকলন সম্পাদনার সময়ে মাথায় এসেছিল এক ঝোঁক। দীর্ঘ কবিতা লিখবার রোখ চাপে। তবে এর মাশুলও কম গুণতে হয়নি। লেনিন, আর লেনিনবাদের সারাৎসারে নিজের অক্ষমতার সান্ত্বনা নেই।"

'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার' সূচনায় একটি ছত্র 'শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসা লেনিন লেনিন।' তারপর শুরু হয় বক্তব্যধর্মী মূল কবিতাটি।

অন্ধকার, দুঃখের পাঁচিল, সুতোছেঁড়া যৌবন ঘুড়ি, পায়ে চলার পথে রক্ত, গাছের চূড়ায় চূড়ায় অন্ধকার ইত্যাদি অতিক্রম করে 'লেনিন তোমার ঠিকানায় মুক্তিবীজ'। তারপর 'হাতের তালুতে নদী শতমুখ, উদ্ভাসিত ছবি।' তারপর কবির উপলব্ধি 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন'-এর নামে থ্যাঁতলানো পলাশেরা জাগে, 'পায়ে পায়ে সমুদ্র হাঁকছে' 'মিছিলেই আমাদের মুক্তি'। কবি জনতাকে জানান —

এ লড়াই চলছেই, চলবেই
মেকঙের গঙ্গার ভোল্‌গার
চলবেই এ লড়াই চলবেই
মার-খাওয়া বিশ্বের জনতার
লেনিনের রক্তের জনতার।'

ইতিহাসের চলমান মিছিলের স্রোতে 'মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে/দাপায় কাঁপায়/চম্পারণ/মুশাহরি/ শ্রীকাকুলাম/এ পোড়া বাঙলাও।/এ পোড়া বাংলার মাঝ-বুকে/সঙিন উঁচিয়ে দুঃখ কাঁটার পাঁচিল/এক নদী রক্ত বয়ে গেছে।'

কবি যেদিকেই তাকান সেদিকেই 'সময়ের বাঁকা ফণা/সাজানো শিবির তছনছ/ মানবতা/ক্রান্তিকালের মুখোমুখি।' আর সেইজন্যই— 'কমরেড/ভালোবাসা জনতার/সন্ধানে তাই ক্রিসানথিয়াম আজ/জ্বলে ওঠে বারবার।/বুকের ভিতর/ক্রেমলিন, ক্রেমলিন/স্বপ্নের সংসার।' কবি সমাজ সচেতন বলেই বিশ্বাস করেন, 'লোভ ঘৃণা পুঁজিবাদ/সামাজিক ক্যান্সার।' কবির হৃদয়ে একটি নাম চিরদিন আছে ও থাকবে, আর তা হলো লেনিন, যার অন্য নাম 'শাশ্বত সংগ্রাম'। কারণ লেনিন মানুষকে দিয়েছে সংগ্রামের অধিকার, মুক্তির অধিকার, ফসলের স্বপ্নের অবিরাম অধিকার, যৌবন সূর্যের অধিকার।

'সমুদ্রমহিষ' গ্রন্থ থেকেই কবি নিজের পথ ঠিক করে নিয়েছেন। ভাষার মধ্যে ছলনা জাল বিস্তার করেননি, বক্তব্যকে তিনি ঋজুভাবে, কখনো বা প্রতীকের আড়ালে প্রকাশ করেছেন। তাঁর চর্চা মানবকেন্দ্রিক, ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি ভাবালুতা মুক্ত। তাঁর প্রতিবাদের কবিতা হলো সমাজ সচেতন কবির প্রতিবাদ। তাঁর কবিতা ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী কবির প্রতিবাদ নয়। কবির ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত

আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' (জুন ১৯৭১)। এ কাব্যে কবি গণেশ বসু আলোড়িত হয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রাণময়তা ও মরণপণ দৃঢ়তায়। আলোচ্য কাব্যের পটভূমিকা ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। কবির কাছে কবিতাই সংগ্রাম, প্রেম ও জীবন। তাই কবিতার মাধ্যমেই তিনি এ সমস্তের অভিযাত্রী হন। মানবিক চেতনা, গণমানসের সঙ্গে সংযুক্তি, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম ও প্রেমের সুরসৃষ্টি কবিতার মূল প্রেরণা নিহিত আছে এরই মধ্যে। গণশক্তির অভ্যুত্থানে মানুষের বেঁচে থাকার অবিরাম প্রয়াসের ফসল কবি দেখতে পান। তাঁর মতে, 'কবিতা হলো এমন এক শব্দশিল্প যা চিত্র ও সঙ্গীতের নিহিত মাধুর্যে, শ্রমের নান্দনিকতায় সময়-সমাজ, আবেগ-মনন, বোধ ও বোধি, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মিশেলে বহুতর ব্যঞ্জনায় দীপ্ত, বহুমাত্রিকতায় ঋদ্ধ আলো-অন্ধকারের জীবনচৈতন্য।' তাঁর 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' মৃত্যুহীন মরণের গান। যে মৃত্যু অমৃতকে আস্বাদন করে সে মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণে উদ্ভাসিত। কবি সেই অমর মৃত্যুর আবেগে মথিত—

স্বপ্নের ফেরিওলা
চে-গুয়েভারার গিটারেই খোঁজে প্রত্যাঘাতের দোলা
এ এক সময়, দামাল সময়, হিরণ্ময়।

বাংলাদেশকেও একদিন রক্তক্ষয়ী বিচ্ছেদ মেনে নিতে হয়েছে। বুকের মধ্যে আগুন থাকলেও প্রকাশের পথ ছিল না; কিন্তু আজ প্রতিবাদ ভাষা মুখরিত—

এখন নক্ষত্রে মুখ শহিদের, জন্ম-সহোদর, জ্বলে আরক্ত অতীত
ক্ষোভের করবী ফোটে, স্বদেশসূর্যের স্তবে লক্ষ লাশ অভিমন্যু উত্তরার চরে
দুরন্ত আবেগে ঋণী বাঙলাদেশ, কণ্ঠ কাঁপে, স্বপ্ন ভাষা কাঁদে,
স্বাদে জীবনের, জীবন গড়ার স্বপ্নে মুক্ত অস্থিরতা।

স্বদেশ কথা বলে গণেশ বসুর হৃদয়ের কলমে। পূর্ববাংলার লড়াকু যুবনেত্রীর মুক্তি সংগ্রামের অমেয় প্রাণশক্তি। সেই লড়াই সংগ্রামের ঢেউ জাগায় মানুষের রক্তে। ব্যক্তিমানুষ প্রাত্যহিকতার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে-বিলাসে প্রতিবাদের শক্তি হারিয়ে ফেললেও অন্তরের গভীরে থাকে ক্ষোভ, প্রতিবাদ। অন্তরের সেই প্রতিবাদ যখন কোনো সংগ্রামের কথা উচ্চারণ করে তখন ব্যক্তিমানুষের সজ্ঞান সত্তায় প্রতিবাদের ভাষা মুখর হয়ে উঠতে চায়। তখন আত্মবিলোপী আরামের সুখশয্যা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়—

'লড়ছি কারণ শহিদ আমার ভাষায় কথা কয়
লড়ছি আমি লড়াই জ্বলে প্রাণের অঙ্গীকার'

... ...
'লড়াই আমার দোটান বোধে আরেক ভাসানে
লড়ছি আমি রক্তে আমার রৌদ্র অধিকার।'

কবি জীবনকে দেখেন রাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে আদর্শ তাঁকে যে মানবিক ভাবনা দেয়, যে সহমর্মী চেতনা দেয়, যে প্রতিবাদ দেয় তাকে শিল্পিত করে কবিতায় তুলে ধরতে চান কবি। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসের সহযোদ্ধাদের মধ্যে বিভাজন দেখলে কবি মর্মাহত হন। মানুষের এত যন্ত্রণা, পীড়ন যা নিয়ে লড়াই করার, প্রতিবাদ জানানোর দায়দায়িত্ব আছে, সে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে প্রগতিচিন্তাপুষ্ট কমরেডগণ যখন আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তখন কবি ক্রোধে ফেটে পড়তে চান। হতাশা জাগে, কখনো বা তিনি প্রশ্নে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেন—

'কে তবে কাদের পথ বলে দেবে সোনালি গির্জার।'

কবি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন না —

'পা থরথর টল্‌ছে সময়, দলনেতাদের কি?
লোক মরছে, পেট ধুঁকছে দুঃখ কিসের? ছিঃ!'

বিদ্রূপের লঘুভঙ্গি ধীরে ধীরে গভীর ও গম্ভীর সুরে বেজে ওঠে ওই একই কবিতায় —

'কী আর ফিরিয়ে দেবে, হে সময়, বজ্রগর্ভ দুরন্ত সময়
ফিরিয়ে কি দিতে পারো উন্মাদনা ষাটের পৃথিবী?
ফিরিয়ে কি দিতে পারো সত্তরের দ্রোহের আগুন?'

আলোচ্য কাব্যের মূল কথাটি ব্যক্ত হয়েছে 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' শীর্ষক কবিতায়। যে বাংলার যৌবন আজ স্বাধীনতা আর মুক্তির লক্ষ্যে জেগে উঠেছে সে বাংলার স্মৃতি অনেকের স্মৃতিতে আজও ঢেউ তোলে।

কবিও তা থেকে বাদ যান না। এপার বাংলা ওপার বাংলার তুলনায় কবি তুলে ধরতে চান ওপার বাংলার সংগ্রামের মৌল প্রাণসত্তা। 'বাহান্নর স্মৃতি', অমর একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদের প্রেরণা কবিকে যন্ত্রণা দেয়, স্মৃতিভারাতুরতায় কবি আচ্ছন্ন হন। ওপার বাঙলার লড়াই তাঁকে বিস্মিত করে —

'এ এক ভৈরবী বাঙলা, আশ্চর্য জাদুর।
ট্যাঙ্কের ফিতায় নরমুণ্ড মালা দোলে,
জ্বলে মাঠ, পুড়ে যায় নবনীপবন,
জ্বলে বুক, পুড়ে যায় খর ইচ্ছাগুলি।
নদীতে লাশের ভেলা বেহুলার আরেক ভাসান।'

কবির সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবার নিচে' (১৯৮২)। এই কাব্যগ্রন্থে কবি কিছুটা বাঁক নিয়েছেন। তাঁর পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণের প্রভাব আছে অনেক কবিতায়। স্বীয় ব্যর্থতা আর বেদনার কথাও আছে বেশ কিছু কবিতায়। বিদেশিনী নারীর অনিবার্য প্রেমের স্মৃতিও অনেক কবিতায় এসেছে। স্বদেশকে ও রাজনৈতিক নেতাদের তিনি মুক্তমন নিয়ে দেখেছেন। কবিতাগুলিতে উপমার প্রয়োগ, ভাবের ব্যাপকতা ও কাব্যিক মেজাজ পাঠকমনে রসসঞ্চার করে। আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলিতে আক্রমণ, বিদ্রুপ, শুষ্কতার পরিবর্তে আছে অবসাদবোধ, ব্যর্থতা, ক্লান্তি। কবির মনে হয়, তাঁর অনেক কিছু পাওয়ার আছে, কিন্তু তিনি তা পাননি। বাঘের অর্থাৎ মৃত্যুর থাবার নিচে অমোঘ পরিসমাপ্তি, অন্যান্য মানুষের মতো, কবিরও ভাগ্যফল। সমগ্র কাব্যগ্রন্থে রিন্‌রিনে বেদনার সুর বাজতে থাকে —

১. মুখের ভাঁজে ভাঁজে দুলতে থাকে ব্যর্থতার ছায়া
কাঁধের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভ্রূকুটির মেঘ একরাশ পিঁপড়ে,
ফলের ছাড়ানো খোসার মতো আমি ভাসমান অন্যের করুণায়

২. তোমার জন্যে তাকাই স্বপ্ন নিয়ে
আমি বরিশালের ছেলে
কলকাতার স্বপ্নভঙ্গ, স্বরভঙ্গ যুবক
দুই শিবিরের মাঝখানে দ্বিধান্বিত তারা।

৩. বার্লিনের টাওয়ার চত্বরে কৃষ্ণচূড়ার মতো একাকার হতো যে পায়রাগুলো
চোখে যাদের ভ্রমর, ডানায় হলুদ আকাশের গভীরতা,
অসহায় বন্দির মতো অহর্নিশ সংশয় পুষেও দেখতাম
বাতিঘরের স্বাতীনক্ষত্র
সারাটা সংসার হয়ে উঠত চর্যাপদের হরিণী।

৪. ইনা, হে আমার নতুন দেশের মুখর মাদল, ইচ্ছাসহচরী,
ড্রেসডেনের ভাঙাচোরা বাড়ির মতো আর বিষাদের নীলশিখা নয়,
হে তুহিনকন্যা, হে আমার স্মৃতিবিজয়িনী নারী
এখন পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিকের ভুবনবিজয়ী কম্পাস হাতে
এসো, কচ্ছপের খোলের মতো আকাশে ফোটাই অনন্ত বকুল,
তোমার ভুরুর ধনুকে গড়ে তুলি সাঁকোর মতো চাঁদ
হে তুহিনকন্যা, আমার রিক্ত সমুদ্রের দুঃখজয়ী দ্বীপ।

কিন্তু এ ছাড়াও আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কবি তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে সাহসী বক্তব্য রেখেছেন খোলাখুলি বাক্‌ভঙ্গিতে।

'দিনকাল কেমন যেন বদলে গেছে
কেমন যেন সব চলে গেল মাফিয়াদের আখড়ায়
মস্তানদের খপ্পরে
কেমন যেন বদলে গেল সব কিছু
কেমন যেন বদলে যায় দিনকাল।'

কবির স্বপ্নের স্বদেশ, স্বপ্নের প্রত্যয় আজ দূর থেকে দূরে। দেশে খাদ্য নেই, গণতন্ত্র নেই, মানবতা নেই, আছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা। কিন্তু এ অন্ধকার তো আজকের নয়, অনতি অতীতেও হিংসা, বিদ্বেষ, জমাট অন্ধকারের সমান্তরাল ছিল সঙ্ঘবদ্ধ ইতিবাচক প্রতিবাদ আন্দোলন। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরার ফলে স্বপ্নহীন জীবন এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। স্বপ্ন নিয়ে কবিতা নেই। 'স্বপ্নভূমি' নামক দীর্ঘ কবিতায় কবির সেই মানসিকতার উন্মোচন। একদিন যে সাঁওতাল, তেভাগা, নকশালবাড়ি, ভিয়েতনাম কম্পাসের মতো, মুক্তির মতো জ্বলে উঠেছিল আজ আর তা বারুদ প্রতিবাদে ঝলসে ওঠে না। কিন্তু, তবু কেউ কেউ থাকে যারা 'সাহসের ইতিহাস, রোদ্দুরের ইতিহাস।'

কবির 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যগ্রন্থটি আন্তরিকতা প্রদীপ্ত সমাজ ভাবনার উচ্চারণ। এ কাব্যে সমাজের সর্বস্তরের বর্হিরূপ ও মর্মস্পর্শী রূপ চিত্রিত। ব্যক্তি কবি সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলায় ব্যক্তি-ইতিহাসের চালচিত্রে সমাজের নানা ছবি ফুটে ওঠে। কবির ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা কবিতা-নির্মিতির সহায়ক হয়। একজন খাঁটি আধুনিক কবির মতো জীবনাভিজ্ঞতা কবিতার পটভূমি বা বক্তব্য হয়ে ওঠে।

সমগ্র দেশ যে আজ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত তা কবির জীবনাভিজ্ঞতায় উপলব্ধ হয়। সন্ত্রাস এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ধমনীর রক্তস্রোতে প্রবাহিত। জীবনের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা আছে বলেই কবি নীতি, মূল্যবোধ ও মানবিকতার বিনাশ দেখে ক্ষুব্ধ হন — 'এ কোন্ কালো দিঘির থেকে উঠলে জেগে ঢেউ/মাথায় জ্বলে চিতা।' এরই মধ্যে কবি খুঁজে বেড়ান সহকর্মী, সহমর্মী মানববন্ধুকে, মুখোশধারীকে নয় —

'কার কাছে যাই, কার কাছে যাই, কার কাছে যাই
কথা বলার মতন মানুষ কোন্‌খানে পাই
কোন্‌খানে পাই,
কোন্‌খানে পাই,
কোন্‌খানে পাই, আজকে বলো।'

এ শুধু কবির প্রশ্ন নয়, এ এক আর্তকাতরতা — যার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত থাকে। কবি অবশ্য পাঠকের উপর বক্তব্য চাপিয়ে দেন না, কিন্তু দৃঢ়

আন্তরিকভাবে বক্তব্যকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যে পাঠক বক্তব্যের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যান। 'সমীক্ষা' কবিতায় কবি সমীক্ষায় বসে নীরব সন্ত্রাসের শঙ্কার চিত্রাঙ্কণ করেছেন। সমাজের কোনো স্তরের মানুষই সত্য পরিচয়ে জীবনযাপন করতে পারছেন না। সুস্থতার জন্য তীব্র তৃষ্ণা সকলের, কিন্তু কোথাও নেই ইতিবাচকতা — 'যুদ্ধহীন মৃত্যু আছে, দাঙ্গাহীন খুন, প্রেমহীন প্রেম আছে অশ্রুভরা তূণ।'

ক্ষমতার অহঙ্কারে স্ফীত হওয়া একদল মানুষ মেতে উঠেছে 'তিমির বিলাসে'। জীবন দর্শক, জীবনবিশ্লেষক কবির বেদনাগূঢ় অথচ অমোঘ সত্যবাণী শোনা গেল 'বলবে তারা বলবে' কবিতায় —

'বলবে তারা বলবে
সন্ত্রাসের থেকে ফের জন্ম নয় আরেক সন্ত্রাস।
বলবে, তারা বলবে
নীরব সন্ত্রাস আজো বর্ণময় খরার দাপটে।'

'এলোমেলো' কবিতার ছোট ছোট স্তবকবিন্যাসে জীবনের সজীবতা হারানো খরার রূপ — অভিনব আঙ্গিক বিন্যাসে আছে ভেঙে-পড়া মূল্যবোধের কথা। 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যের মর্মবাণী ধরা আছে 'খরা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় —

'খরার ভিতরে আমি খরা হয়ে এখন ঝিমোই।' 'আমি' এই কবিতায় কবির ব্যক্তিক উপস্থিতি প্রথম পংক্তিতে থাকলেও তারপরেই বিস্তৃত পটভূমিতে স্বাধীনতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু মিছিল এমনই সব অভিজ্ঞতার কথা যা সবই কবির ব্যক্তিগত প্রাত্যহিকতায় জড়ানো শৈশব স্মৃতি। ওপার বাংলায় জীবন যাপনের নিজস্ব প্রসঙ্গ, বাড়ি আত্মীয়-পরিজনদের কথা, তাদের সমৃদ্ধি-প্রতাপ-সুখস্বাচ্ছন্দ্য, হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের সাবলীল জীবনছন্দ, পূর্ব-বাংলার নদী-পাখি-ফল-ফুল সমস্তই আছে আলোচ্য কবিতায়। এ জীবনচিত্র হতে পারে কবি গণেশ বসুর ব্যক্তিগত জীবনচিত্র। এ জীবনচিত্র স্বাধীনতা লাভের সমকালীন যে কোনো শিশু বা কিশোরের জীবনচিত্র হতে পারে। কবির ব্যক্তিজীবনের পটে পূর্ব-বাংলার প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের এক সমাজচিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ জীবনকে প্রীতিহীনতার শুষ্কতায় ঠেলে দিয়েছে। সমাজ, জীবন খণ্ডতায়, ক্ষুদ্রতায় সীমিত হয়েছে। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে বহু সংগ্রামে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুন মাড়িয়ে তারা খুঁজেছে নিরাপত্তা, পরিচয়, বাসস্থান। বুকে দুলেছে কান্নার ঢেউ, স্মৃতির ভারাতুরতা, চোখে ভাসে দুর্গাপূজা, বিজয়া, স্কুলবাড়ি, নাটমন্দির — আরো কত কী যে! পশ্চিমবাংলায় এসেও মিলল না মিলনের গান, মানবতার মন্ত্র।

স্বদেশপ্রেম, মানুষে মানুষে ভালোবাসা, সজীবতা, সরসতা সবই হারিয়ে গেল। কবিতা, গান, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধাবোধ সবই যেন প্রাণহীন। জীবনের এই বিশুষ্ক ছবি কবিকে আলোড়িত করে। সমগ্র কবিতাটি হতাশার, নাস্ত্যর্থকতার চিত্রে পূর্ণ। তবুও কবিতাটিতে কবির আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমীক্ষা, এ যুগের মানুষকে আত্মসমীক্ষণে প্রাণিত করে। কবি শোনান আশার বাণী। কবির আত্মজিজ্ঞাসা — 'খরার ভিতরে আমি খরা কেন?' — এ ভাবনাই বেঁচে ওঠার প্রেরণা। কবিতাটিকে কালের দর্পণ বললে অত্যুক্তি হয় না — এ কবিতা আজকের ঘুণধরা জীবনপটে দাঁড়িয়ে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের এক অমোঘ নির্দেশিকা।

গণেশ বসুর কবিতা প্রেমচেতনা, স্মৃতিময়তা, আর সমাজভাবনা এই ত্রয়ী বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ ছাড়া নানা বক্তব্যের কবিতা আছে — যেখানে আছে একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ — স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, প্রেমিকা, বন্ধুর কথা, বিদেশের অভিজ্ঞতা, স্বদেশের অনুষঙ্গ আর কবির স্বপ্ন।

কবির স্বপ্ন কবিকে চোখ দেয় জীবনকে দেখার, সে স্বপ্ন কবিকে নিয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। সন্তান তাঁর কাছে নবজন্মের প্রতীক হয়ে ওঠে। 'চিরজীবিতেষু' কবিতায় কবি বলেন —

'তোর ভিতর আমিই খুঁজে পাই
হারানো শৈশব
** ** ** **
তোর ভিতরে সমুদ্রকে পাই
হারানো যৌবন
তোর ভিতরে একটু পেতে চাই
আমার জাগরণ।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে স্বপ্নের — বিনাশের — 'তিনি মুক্তির পথ নির্দেশ/ তিনি চলমান সুন্দর।'

ক্ষোভ, অভিমান, বেদনা, ক্রোধ, পাহাড় হয়ে থাকে, 'চারদিকে এখন বিশ্বাসের আলোছায়া', চারিদিকে বিরুদ্ধতা, কিন্তু তার মধ্যেও জাগে সৃষ্টির সুষমা। নবপ্রজন্ম আসে — কবির ইচ্ছার আকাশ ডানা মেলল। এই নবজন্মের প্রাণময়তায় কবি মেলে ধরেন তাঁর স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা, তাঁর কন্যার মধ্যে 'আমার স্রোতস্বিনী', 'তোমার কচি হাতের মুঠোয় এখন ঝড়ের ঝুঁটি', 'তোমার কচি হাতের মুঠোয় এখন মশালমুখী দিন।' এই কচি হাত শুধু কবি-কন্যার নয়, নবপ্রজন্মের। যাদের হাতের মুঠোয় আছে নতুন পৃথিবী গড়ার শক্তি।

॥ ২ ॥

কবি গণেশ বসুর 'বনানীকে কবি কবিতাগুচ্ছে'র ৩৭ সংখ্যক, 'সমুদ্রমহিষ', 'ভীষ্ম' 'শ্মশানকিশোর', 'বত্রিশ বছরে', 'সীমানা', 'প্রবাসে স্বদেশ', 'সমীক্ষা', 'স্বপ্নভূমি', 'কথা', খরা প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠকের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। নিম্নে 'স্বপ্নভূমি' কবিতার অংশবিশেষ এবং 'কথা' কবিতাটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হলো।

(ক) স্বপ্নভূমি

ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মতোই স্বদেশভূমির গণতন্ত্র
আর কাঁকড়ার ডিমের মতো চাঁদ যেন ঔপনিবেশিক টিকটিকি
আমায় ঘিরে থাকে, শিরায় শিরায় গান গাইছে উপেক্ষার করাত
দিনরাত যেন ঝড় তুলছে অভিমানের করাত।

(খ) কথা

সময় থাকে না কিন্তু কথা থাকে, হারানো অঙ্গার।
গলা বুক ভরে স্মৃতি, বালিশে চাদরে বাঁধা ব্যাকুলতা, উষ্ণ অনুভব
নখের আঁচড় কাটে, মুখে নামে প্রজাপতি, চুলের গোছায়
গাছের পাতার ফাঁকে দীর্ণ পাখি, তুমি বলেছিলে : 'ভুলে যাবে না তো?
ছুটিতে যাবার মুখে দশমীর ঢাকে বোল, 'ভুলে যাবে না তো?'
টলটল মুক্তো কাঁপে, শরীর আবেগহীন, যন্ত্রণার রেখা
বুনে চলে যন্ত্রণাই, টনটন করে বুক, গাঢ়
ফোঁপানো কান্নার ধ্বনি পাক খায়, বিকেলের মেঘ
চোখে চোখে খেলা করে। ভুল? না, না, সময় থাকে না।
বিচ্ছেদের মুখে ভাসে অপরাধ, মরা আলো, গ্লানির গরিমা।
বিপুল আবেগে মেশে ছোট ছোট কথাগুলি, করাতের গান বেজে ওঠে,
বেজে ওঠে করাতের গান :
যত দূরে চলে যাও তুমি শুধু বড়ো আরো বড়ো হয়ে ওঠ।
সারাটা জীবন বলো কত ভালোবাসা আর বুকের ভিতরে বওয়া যায়?

প্রেম, ভালোবাসা, জীবনের ছোটখাট সমস্যা, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও হতাশা গণেশের কলমে ভালোভাবে রূপায়িত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার কথা তিনি যখন বলেন তখন তা হয়ে যায় গুরুগম্ভীর। অবশ্য ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। প্রসঙ্গত 'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার' দীর্ঘ কবিতার উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য কবিতাটিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, মানবিক বোধ, লেনিনবাদ

ইত্যাদি গণেশ বসু দীর্ঘ কবিতার আঙ্গিকে নানা রূপকল্পের, ছন্দের, অলংকারের, শব্দের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করে পাঠকের অধিগম্য করে তোলেন।

॥ ৩ ॥

গণেশ বসুর কবিতার চিত্রকল্প — অলংকার — ছন্দ-ভাষা-শব্দ

চিত্রকল্প : IMAGE শব্দটির বাংলা করা হয়েছে বিচিত্র নামে — রূপচিত্র, চিত্রক, কল্পক, প্রতিমা, বাক্‌চিত্র, রূপকল্প ইত্যাদি। কিন্তু IMAGE-এর প্রতিশব্দরূপে চিত্রকল্প শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত চিত্রকল্প শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। অবশ্য বুদ্ধদেব বসু এ শব্দটি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। অভিধানে ইমেজের বাংলা প্রতিমূর্তি, প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথ ইমেজ অর্থে প্রতিমা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অমলেন্দু বসু ব্যবহার করেছেন বাকপ্রতিমা। কেউ কেউ চিত্রকল্পকে বলেছেন Word PICTURE বা শব্দচিত্র। এজরা পাউণ্ডের মতে, 'An Image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant time.'

স্পার্জিয়ান মনে করেন, 'When I say images I mean every kind of picture, drawn in every kind of way in the farm of simile and metaphor in their widest sense.'

কুম্বেস-এর মতে, 'By image we mean figure of speech – often has an effect the opposite of what was intended.' কল্পনাপ্রসূত শব্দালংকারসমূহ, প্রতিমাসমূহকেও Imagery অর্থে ব্যবহার করা হয়।

চিত্রকল্প সবসময়ই কবিতার অনিবার্য অংশ, প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সৌন্দর্যহানিও ঘটতে পারে। চিত্রকল্পের দায়িত্ব শুধু সাদৃশ্য সৃষ্টি নয়, কবিচেতনার প্রসারিত ভূমিকায় কল্পনার ব্যাপ্তি, ঐশ্বর্য ও সৌকর্যের প্রকাশ, যার ফলে পাঠকের কল্পনাবৃত্তিও নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়। চিত্রকল্পে থাকবে সৃজনীশক্তির প্রকাশ। মায়কোভস্কি মনে করেন যে, চিত্রকল্পকে হতে হবে অভিসন্ধিমূলক, অনেক বড়ো বিষয় ও বস্তুকে চিত্রকল্পের সাহায্যে বিশদ করতে হবে।

চিত্রকল্প :

১. তোমার ঠোঁটের মতো সুন্দর সঙ্গীত আমি কখনো শুনিনি,
তোমার চোখের মতো শান্তির আকাশ আমি একটিও দেখিনি।

২. সূর্যের দেশে আমাদের যাত্রা অব্যাহত, এবং
আকাশ তার পটভূমি।

৩. সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌঁছনো গেল না।
৪. এখন আগুন
দ্রুত এসে শুষে নিক দক্ষিণের পাথুরে প্রান্তর
মৃত গোলাপের চারা উঠুক উঠুক
ভরে দশ দিক।
৫. কই কোনখানে সমুদ্র ঝাপট
চূড়ায় চূড়ায় যার সোনা ঝলে
উথালপাতাল বুকে টান ধরে
থরো থরো কেঁপে ওঠে আকাশ পাতাল।
৬. কালের কলসে রৌদ্র করোটি উজ্জ্বল উত্তাল।
৭. এখন নক্ষত্রে মুখ শহীদের, জন্ম সহোদর,
জ্বলে আরক্ত অতীত উত্তরার চরে
ক্ষোভের করবী ফোটে, স্বদেশসূর্যের স্তরে, লক্ষ লক্ষ অভিমন্যু
দুরন্ত আবেগে ঋণী বাংলাদেশ, কণ্ঠ কাঁপে, স্বপ্নভাষা কাঁদে,
৮. ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মতোই আমার স্বপ্নমদির স্বদেশ
শ্যামাঘাসের দানাও যেখানে সোনার চেয়ে দামি।
৯. মুখে নামে প্রজাপতি, চুলের গোছায়
গাছের পাতার ফাঁকে দীর্ণ পাখি, তুমি বলেছিলে
ছুটিতে যাবার আগে ঝরনার মাদলে।
১০. টলটল মুক্তো কাঁপে, শরীর আবেগহীন,
যন্ত্রণার রেখা বুনে চলে যন্ত্রণাই,
১১. নৌকোর গলুই ফাঁকা। খাঁ খাঁ বাড়ির শোঁ শোঁ
বাতাস। বাদুড়ের ছায়া। পায়ে চলার পথে রক্ত।
গাছের চূড়ায় চূড়ায় অন্ধকার। পাতা-ঝরার গান।
১২. বুকের ভ্রমর ডানা মেলে,
তারার ঝুমুর।
১৩. হাতের তালুতে নদী শতমুখ, উদ্ভাসিত ছবি।
১৪. গোলাপজামের রৌদ্র, হিজলফুলের ছায়া।
১৫. সঠিক মুহূর্তে রক্তপদ্ম হেসে ওঠে
করতলে চিবুকে চিবুকে।
১৬. বোনের চোখে আকাশ মেলে, মাটির ভিতর
হু হু অশ্রু, ফাঁসির কাঠে রঞ্জনেরই লাল করবী
সূর্য আজো ভাসছে।

১৭. থ্যাঁতলানো পলাশেরা জাগছে
পায়ে পায়ে সমুদ্র হাঁকছে।
১৮. ত্রিমুখী শৃঙ্গের রাঙা চোখ
গভীর খাদের সর্বনাশ।
১৯. দামাল স্মৃতিরা বুনো শুয়োরের দাঁতে
অভিশাপ দুঃখ অভিশাপ
২০. ভয়ংকর অবিশ্বাস আজ
বাদুড়ের তামাটে ডানায় ঝুলে আছে।
২১. এ পোড়া বাঙলার মাঝ-বুকে
সঙিন উঁচিয়ে দুঃখ কাঁটার পাঁচিল
এক নদী রক্ত বয়ে গেছে
এক নদী বিষাদ উজান
কান্না
কান্না
আমরি ভাষার পদ্ম ফোটে
অ-মরি স্মৃতির দ্বার খোলে...
২২. পাটের খোঁপায় লাল ফুল
চা-বাগে সুতোয় স্বপ্ন উজ্জ্বল উজ্জ্বল।
মানচিত্র জুড়ে ভালোবাসা
অহঙ্কারী ভালোবাসা।
২৩. বাঁকানো পিঠেও চাবুকের ডোরা কাটা
রুখছে এবার ছিন্নমস্তা দিন।
২৪. অধিকার রক্তের, কবিতার,
ইতিহাস গড়বার অধিকার, মুক্তির
অধিকার
রক্তের
ফসলের, স্বপ্নের, অবিরাম
অধিকার, যৌবনসূর্যের অধিকার
অধিকার।
২৫. এ ভাঙা ঘরের দাহে তবু
ব্যর্থতারও ঘূর্ণি ঘিরে স্মৃতিগুলি
ঝিকিমিকি তরঙ্গে চঞ্চল...
অজস্র সূর্যের কণা

আমার দুচোখ ফেটে জল!
(তালিকাটি অসম্পূর্ণ।)

অলঙ্কার :

১. আর কোনোদিন দেখব না আমি তাঁবুর মতো / আকাশ মেলেছো ও-মাথা ঝুঁকিয়ে আমার বুকে। (উপমা)
২. ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা। (কাকু-বক্রোক্তি)
৩. তার ঠোঁটের মতো... তার চোখের মতো। (উপমা)
৪. বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন। (উৎপ্রেক্ষা)
৫. ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মতোই আমার স্বপ্নমদির স্বদেশ। (উপমা)
৬. চাঁদ যেন ঔপনিবেশিক টিকটিকি। (উৎপ্রেক্ষা)
৭. তোমার ভুরুর ধনুকে গড়ে তুলি সাঁকোর মতো চাঁদ। (উপমা)
৮. ফলের ছাড়ানো খোসার মতো আমি ভাসমান। (উপমা)
৯. থরো থরো কোঁপে ওঠে। (অনুপ্রাস)
১০. জ্বল জ্বল পাঁজরের অন্ধকার। (অনুপ্রাস)
(তালিকাটি অসম্পূর্ণ)

ছন্দ :

১. তবুও আমায় / ৬
তোমাকে ভুলিতে হবে / অসম্ভব। তবু প্রয়োজন / ৮+১০
কেননা অসংখ্য স্মৃতি / অবিরল করিছে ক্রন্দন / ৮+১০
২. বরং জ্বলিয়া ওঠো, / জ্বলে ওঠো, মশাল জ্বালাও / ৮+১০
প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে, / কোষে কোষে, শ্রুতিতে শ্রুতিতে / ৮+১০
তোমার সৃষ্টির বীজ / জেগে ওঠো আমাকে জাগাও / ৮+১০
বনানী বাঁচাও তুমি / দুর্নিবার মাধবী সঙ্গীতে / ৮+১০
৩. মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে / শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ / ৮+১০
* * * * *
রক্তে টান প্রবলতা / বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন / ৮+১০
আকাশ পাতাল জুড়ে / চুল ছেঁড়ে বাহুর পারদে / ৮+১০
ভয়ংকর অস্থিরতা / বিধ্বস্ত চোয়াল / ৮+৬
৪. মিছিলে মিছিলে / আলোড়ন অবি/রাম / ৬+৬+২
* * * * *
যৌবন লাল / হৃদয়ে একটি/ নাম / ৬+৬+২
লেনিন লেনিন / শাশ্বত সং/গ্রাম / ৬+৬+২

৫. কার কাছে যাই / কার কাছে যাই / কার কাছে যাই / ৪+৪+৪
কথা বলার / মতন মানুষ / কোন্ খানে পাই / ৪+৪+৪
কোন্খানে পাই / ৪
কোন্খানে পাই / আজকে বলো / ৪+৪
৬. থ্যাঁতলানো পলাশেরা / জাগছে ৮+৩ কিংবা, ৪+৪+৩
লাঞ্ছিত ও বিবেক / জাগছে ৮+৩ ৪+৪+৩
মিছিলেই আমাদের / মুক্তি ৮+৩ ৪+৪+৩
পায়ে পায়ে সমুদ্র / হাঁকছে ৮+৩ ৪+৪+৩
ইস্পাত মুখ সব / হাঁকছে ৮+৩ ৪+৪+৩
মিছিলেই আমাদের / মুক্তি ৮+৩ ৪+৪+৩
৭. মৃত্তিকায় শিউলির হাল্কা আমেজে বৃষ্টির ঝুর ঝুর / দিন বদলের সুরে কিসের গন্ধ / সারাৎসারের মুখাপেক্ষী সময় / অনিবার্য সংঘর্ষের ইস্পাত লাফিয়ে ওঠে রোদের রঙে / বিরোধ আর বিরোধ / বিদ্রোহে ফেটে পড়ল বীজ-ধান / ঘুম নেই / স্বস্তি নেই /
(লিপিকার ছন্দের অনুরূপ)
৮. যেদিকে তাকাই / সময়ের বাঁকা / ফণা ৬+৬+২
সাজানো শিবির / তছনছ মান/বতা ৬+৬+২
ক্রান্তিকালের/ মুখোমুখি
কম/রেড ৬+৬+২
ভালোবাসা জন/তার ৬+২
সন্ধানে তাই / সূর্যনয়ন / আজ ৬+৬+২
জ্বলে ওঠে বার/বার ৬+২
৯. মিছিলে মিছিলে / আলোড়ন অবি/রাম ৬+৬+২
রক্তে লেনিন / আনে স্বপ্নের / দিন ৬+৬+২
বোধের গভীরে / অনন্ত ক্রেম/লিন ৬+৬+২
যৌবনলাল / হৃদয়ে একটি / নাম ৬+৬+২
লেনিন লেনিন / শাশ্বত সং/গ্রাম ৬+৬+২
১০. ভাঙচুর চারদিকে / ৮
বেনোজল চারদিকে / ৮
মেলাতে পারি না কিছু / ৮
তা তা থৈ থৈ নাচে / ৮ [থৈ = থই]

ভৈরবীদল নাচে / ৮ [ভৈ = ভাই]
মেলাতে পারি না কিছু / ৮
[তালিকাটি অসম্পূর্ণ।]

ভাষা - শব্দ :

তাঁবু, আর, ঝুঁকিয়ে, রচে যাবো, অনিন্দ্য শিল্প, মাধবী সঙ্গীতে, ঠোঁট, চোখ, গির্জা, মুখোমুখি, অব্যাহত, কেঁদে যায়, ক্ষেপে ওঠে, চোয়াল, চারা, উঠুক উঠুক, থরো থরো, জ্বল জ্বল, ঊনসত্তরের, ঠেলে ঠেলে, মুঠি, দাঁত, মেশিনে, অহল্যা, অনড়, গিটার, দোটান, ভাসানে, পা, থরথর, ছিঃ, ট্যাঙ্কের ফিতায়, মস্তান, খপ্পর, দানা, খরা, দাপট, ঝিমোই, ফের, ডুকরে ডুকরে, যৌবন, হারানো শৈশব, চিরে চিরে, বল্লম, সড়কি, লাঠি, খসে গেল, মুখোশ, দুঃসহ, গলুই, হাতুড়ি, স্টেনগান, গাঁইতি, কোদাল, আতর, থ্যাঁতলানো, ভোঁতা, খোঁয়াড়, পার্টি, শ্লোগান, বাঁকানো, ভৈরবী, বেহাগ, চোরকাঁটা, খোঁপা, চা-বাগানে, ফুলের স্তবকে, তছনছ, ছিন্নমস্তা দিন ইত্যাদি। [তালিকাটি অসম্পূর্ণ।]

কবি গণেশ বসুর কবিতায় এই জাতীয় তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, কথ্য চলিত, ধন্যাত্মক ইত্যাদি নানা জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচনাটি ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের উপর করা হয়েছে। এর পরেও বেরোয় ৫টি কাব্যগ্রন্থ এবং গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ। ২০২০, সম্পাদনা : ড. জয়গোপাল মণ্ডল।

প্রেমিক-কবি গণেশ বসু : 'আলোকিত মুগ্ধ অনুরাগী'

তরুণ মুখোপাধ্যায়

না সূর্য, না চন্দ্র, না কোনো নক্ষত্র সেই আলো দিতে পারে। অন্ধকার সরে যায় ভালোবাসা যদি পায় কেউ কারও কাছে। (প্রেমিক)

কবি গণেশ বসু কি প্রেমিক কবি? ষাটের দশকের এই কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কবির রক্তে যে 'সমুদ্র-মহিষ' গর্জন করে, সে তো প্রতিবাদী। অন্ন ও অশ্রু-র সুর বাজে তাঁর কাব্য-ভায়োলিনে। এসবই খুব সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। যদি বিদেশি কবিদের দৃষ্টান্ত খুঁজি— যাঁরা বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ তাঁরাও কিন্তু প্রেমের মায়াবী হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি। মায়াকোভস্কি, পাবলো নেরুদা, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ কিংবা তুরস্কের নাজিম হিকমত—প্রেমেই কিন্তু মুক্তি খুঁজছিলেন। গড়পড়তা বাঙালি যুবক-কবিদের মতো প্রেমের কবিতা না লিখেই যিনি 'পদাতিক' কবি, সেই সভাষ মুখোপাধ্যায়ও উপলব্ধি করেছিলেন 'ফুল ফুটুক, না ফুটুক/আজ বসন্ত'। এইসব স্মরণীয় উত্তরাধিকার সঞ্চারিত হয়েছে কবি গণেশ বসুর ক্ষেত্রেও।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হলো 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'। কবির বয়স তখন মাত্র চব্বিশ। বনানীকে ঘিরে যুবক-কবির রাগ-অনুরাগ, অভিমান ক্ষোভ ও আকুলতা ব্যক্ত হলো চতুর্দশপদীর আধারে। কে এই বনানী? ব্যক্তি-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কবির কাব্যমানসী। বিশেষ ভাবে বিশ শতকের তিরিশ বা তিন-দশকে প্রেমিকার নাম দিয়ে কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল। যা নিয়ে সজনীকান্ত দাস ঠাট্টাও করেছিলেন। ভদ্র ঘরের মেয়েদের নাম দিয়ে কবিতা লেখা তাঁর কাছে নষ্টামি মনে হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী, অজিত দত্তের মালতী এসবই নাম। তবে শেষ পর্যন্ত কালজয়ী কাব্যনায়িকা হন 'বনলতা সেন'— কবি জীবনানন্দ দাশের এক অমর সৃষ্টি, পঞ্চাশের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীরা'ও যথেষ্ট খ্যাতি পেয়ে ছিল, ষাটের পবিত্র মুখোপাধ্যায় 'অসীমা'র জন্য সনেটগুচ্ছ রচনা করেন। গণেশ বসুর 'বনানী'-র উৎস খুঁজতে গিয়ে ধীমান অধ্যাপক বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'তার নামকরণে বনলতা নামটির প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে' (গণেশ বসুর কবিতা/এবং মুশায়েরা, শারদীয়া ১৪০৮/২০০১)। যদিও জানা যায়, 'বনানী' আসলে রক্তমাংসেরই এক সত্তা, যিনি ছিলেন গণেশ বসুর একদা ছাত্রী।

চর্যাপদ-সূত্রে আমরা যে যুগলব্ধ প্রেমের কথা জেনেছি তাই বৈষ্ণব পদাবলিতে 'মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে' উদ্ভাসিত। সহজসুন্দরী যোগিনী বা শবরী থেকে রাধা বা রামী রজকিনীকে ঘিরে কবিপ্রাণের আবেগ, বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। উনিশ শতকে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদা'র অনুধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। আর তাঁর ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ আশা, ভাষা ও ভালোবাসা দিয়ে যে মানসী প্রতিমা নির্মাণ করেছেন, সেখানে অকপটে জানিয়েছেন, 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার' এবং

'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।'

অনামিকা নয়, নাম্নীর প্রেমে ও ভাবনায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা বিভোর।

১। দিনের স্বপ্নে, রাতের স্বপ্নে তোমার নামের শব্দগুলি (কঙ্কাবতী!) —বুদ্ধদেব বসু।

২। মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম। —অজিত দত্ত।

৩। থাকে শুধু অন্ধকার—মুখোমুখি বসিবার—বনলতা সেন।—জীবনানন্দ দাশ।

৪। আমার চোখ নরম হয়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা।—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

৫। এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা।—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

৬। আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছো, ফিরে এসো, চাকা।—বিনয় মজুমদার

৭। অনির্বাণ প্রেম হয়ে একবার দাঁড়াও অসীমা।—পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

৮। শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকবো।
—ভাস্কর চক্রবর্তী

৯। বিপাশা,এই চোখ তুমি কার কাছ থেকে চুরি করলে? তস্করী?
—আল মাহমুদ

১০। কেতকীরে ভালোবেসে প্রতিদিন বেড়ে যায় দেনা।—তপন বাগচী

দুই বাংলার কবিদের কাব্যনায়িকার প্রতি এই প্রেমানুভবের পাশে গণেশ বসুর আর্তিময় উচ্চারণ—

'পাতালে ডেকেছো যদি প্রিয়তমা বনানী আমার
থেকে যাবো চিরকাল তোমার স্মৃতিকে বুকে ধরে
সে ভীষণ অন্ধকারে,'।

প্রেম ভালোবাসা বলতে আমরা কী বুঝি? মধ্যযুগের কবি বলেন, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা কাম। অন্যের জন্য যে-প্রীতি তাই ভালোবাসা। উনিশ শতকের বিশিষ্ট লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

...স্বার্থত্যাগে ভালোবাসার আরম্ভ, আত্মদানে তাহার
পূর্ণঠিকানা। যিনি ভালোবাসিতে পারেন তিনি যথার্থ
ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক।...
(ভালোবাসা/ নবজীবন পত্রিকা, ১৯ ভাগ, মাঘ, ১২৯১)

জীবনানন্দ দাশের উপলব্ধি— 'প্রেম/ ক্রমাগয় আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি'। কিংবা 'নিহত উজ্জ্বল ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধানার ফল'—ভালোবাসা। আর কবি গণেশ বসু বলেন, 'ভালোবাসা লোকায়ত। অলৌকিক সেতু'। এবং

'ভালোবাসা স্বাধীনতা, পাখির ডানায় যেন রূপকথা কথকতা ওড়ে শিরিন ফরহাদ। পৃথিবী টলিয়ে দেয়, পৃথিবী সুন্দর করে ভালোবাসা। অনুশোচনাও।' (ভালোবাসা)

২০০৫-এ প্রকাশিত "অন্ন অশ্রু ভায়োলিন" কাব্যেও কবি প্রৌঢ় বয়সে ভালোবাসার অনুভবে বলেন,

'তোমাকে ভালাবাসা ছন্দে জেগে ওঠা
নাগাড়ে নিজেকে আবিষ্কার।' (তোমাকে)

বয়স বাড়লেও কবির হৃদয়ে প্রেম চিরতরুণ থাকে। তাই, ২০১১তে "ভাঙা বইঠার গান" কাব্যে প্রায় মন্ত্রোপম কবিতায় কবি ভালোবাসার গাথা লেখেন।

'ভালোবাসা, আহা ভালোবাসা যেন রাধাচূড়া রংগন
ভালাবাসা, আহা ভালোবাসা যেন পাকা আপেলের গন্ধ
ভালাবাসা, আহা ভালোবাসা যেন করুণার হাতযশ।'

বনানীকে নিবেদিত প্রেমের কবিতায় গণেশ বসু তারুণ্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রথম যৌবনে অনুভূত প্রেমে মিশে থাকে গাঢ় অভিমান, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, বিষাদ আর শপথের স্পর্ধা। একদিকে আমরণ প্রেমের স্মৃতি বাঁচাবার পণ, অন্য দিকে অপ্রাপ্তির শূন্যতায় 'তুমিহীন কাটে না সময়'। কবি যে-যুগে প্রেমের বাহুপাশে ধরা দিতে উৎসুক ছিলেন, সে বড়ো সুখের সহজ সময় ছিল না। ছেলে ও মেয়েদের অবাধ মেলামেশা ছিল গুরুজনদের শাসনে, তর্জনীর সংকেতে বদ্ধ। পড়া, পড়ানো যেকোনো ছুতোয় প্রেমিকার কাছে এসেও শেষ পর্যন্ত দেখতে হয় 'কড়া পাহারায় তুমি বন্দি হয়ে যাও।' দূর থেকে দেখা ক্লাসে সহপাঠিনীকে ঘিরে হুমায়ুন কবীরের এমনই 'কাছে থেকে দূর' উপলব্ধি হয়েছিল।

ঠিক যেভাবে গণেশ বসু দেখেন, 'তুমি রয়ে গেলে সন্ধিকালের সন্ধ্যাতারা' তাঁর ৯ সংখ্যক সনেট স্মৃতিবেদনার।

'সজল চোখের দৃষ্টি এখনো হৃদয়ে নিবিড়
অমল স্মৃতিরা এ বুকে ভীষণ নাচে
ঈশ্বরী ওগো ভাবিতে পারি না কুমারী নারীর
ভালোবাসাহীন পুরুষ কী করে বাঁচে?'

স্মৃতিবেদনার মালা গাঁথায় উঁকি দেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পরবর্তীকালে কবি 'তুমি' সর্বনামে ('রক্তের ভিতরে রৌদ্র' কাব্য) লিখেছিলেন—

কত সহস্র স্বপ্নালু অভিমান
ফুলে উঠেছিল ছন্দে সগৌরবে
সেদিন হাওয়ায় শত সূর্যের গান
তুলেছিল বুঝি অন্যদের অনুভবে;

'শাশ্বতী'র অনুরণন টের পাই আমরা। ভালোবাসা পেলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলে ছিলেন সব লন্ডভন্ড করে দেবেন। গণেশ বসু বলেন, 'ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা?' কী সেই ভালোবাসা? 'তুমিময় স্মৃতি'—

'যে নিবিড় মায়াযন্ত্রে ভুলিয়েছো বনানী আমার
তাহার অশ্রুত সুরে ভরে আছে বিনিদ্র হৃদয়,'

এই কাব্যের সমস্ত কবিতা অবশ্য সনেট নয়। সেটা বড়ো কথা নয়। অধিকাংশ কবিতা সনেটের আঙ্গিকে লেখা— যাতে কবির বাঁধভাঙা আবেগ ও যন্ত্রণা যেন বন্ধনে মুক্তি খোঁজে। ২০ সংখ্যক সনেটে কবির উপলব্ধি ঃ

১। প্রেমের সমস্ত সংজ্ঞা অবশেষে ভ্রান্ত বর্তমান।

২। প্রেমের সমস্ত সংজ্ঞা অপ্রেমের, পরম বিস্ময়।

২২ সংখ্যক সনেটে লেখেন, 'নিছক অমৃত নয়, ভালোবাসা বিষেরও আধার' । কবি তাঁর ৭৫ বছর বয়সে "বল্‌গা হরিণের শিং" কাব্যে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, 'ভালোবাসা' 'উপেক্ষার অদ্ভুত সরণি।' বনানীকে কবি বলেন, 'ভালোবাসা চাহিয়াছি, ভালোবাসা আর কিছু নয়'। কখনো বলেন, 'তোমাকেই চাই আমি, চাই চাই তোমার হৃদয়'। অভিমানে এও বলেন, 'আমাকে ভুলেই যেয়ো, এইমাত্র মিনতি আমার'। প্রেমের রাগ-বিরাগের অনুরাগের বর্ণালিতে বড়ো মায়াময়ী হয়ে ওঠে বনানী। যার উদ্দেশে প্রেমিক কবির আর্ত উচ্চারণ: 'তোমার অভাবে ক্লিষ্ট, দীর্ণ আমি, বন্দনীয় প্রিয়।/ দুঃখময় এ জীবনে তুমি ছাড়া কিছু নেই'। কেননা 'তুমিই দুচোখে আশ্রয় হয়ে থাকো' (তুমি)। নতজানু প্রেম বলে, 'তোমারই বিভায় হবো আলোকিত মুগ্ধ অনুগামী।'

আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সারা পৃথিবীতে এখন যেখানে যা কবিতা রচনা হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলা কবিতার মান অত্যন্ত উঁচু। এটা নিছক দাম্ভিকতা নয়। ফাঁকা আত্মগরিমা নয়।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উদ্ভাসিত উক্তিটি স্মরণে এল গণেশ বসুর (জন্ম ১৯৪০) কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙা বইঠার গান' পড়তে পড়তে। কবি গণেশ বসু গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবি। ১৯৬৪তে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি গণেশ বসুর কবিতাতে লক্ষণীয়, কিন্তু তাঁর স্বর-প্রক্ষেপণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

চিন্তা নেই রবীন্দ্র ঠাকুর
তেলে জলে মিশে আছি লাল নীল ক্যাডার ধর্ষক
ফায়ার ব্রিগেড শব্দ, ঝোলা গাল নেতার কোঁচাটি
এবং বালিকাবধূ, খোলাদৃষ্টি নবতিপরাও
এবং সচিবকুল, ফাইলবাঁধা কেরানিমাছিরা (অছি)

তাঁর শব্দচয়ন ও চিত্রকল্প নির্মাণের পরতে পরতে ঝলসে উঠেছে এ সময়ের দ্বিচারিতা-কপটাতার বিরুদ্ধে শাণিত ব্যাঙ্গের তীব্র বিদ্যুৎ। তাঁর ছন্দপ্রয়োগ অভ্রান্ত এবং স্থির লক্ষ্য:

কীভাবে বদলায় আগুনে ক্ষুধা
কীভাবে বন্দুক চোখের জল
কীভাবে জনজাতি দাঁড়ায় ঘুরে
তাতেই বিস্ময়, কৌতূহল? (এদেশে প্রশাসন পাথরকুঁচি)

জীবনের এই সার্বিক ঊষরতার ঘেরাটোপেও তিনি সন্ধান-পান এক প্রাণদায়ী প্রস্রবণের স্নিগ্ধ কবোষ্ণ আশ্রয়ের যা তাঁকে জীবনের ইতিবাচক দিকটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ক'রে তোলে। 'সব কেন শেষ হবে? জলসত্র এখনও এখানে কেউ কেউ' (জলসত্র) কবি গণেশ বসুর সার্থকতা ও সিদ্ধি তাঁর কবিতার বৈচিত্র্যে ও বহুমাত্রিকতায়। নানান আঙ্গিকে বিভিন্ন মেজাজে তাঁর কবিতার বিন্যাস— পাঠক

কখনও ক্লান্তি বোধ করে না তাঁর কবিতা পাঠে, কারণ প্রতিটি কবিতাতেই উন্মোচিত হয় আরেক নতুন দিগন্ত। সেই নবীনতার প্রাঙ্গণেও ধরা পড়েন পুর্নবার রবীন্দ্রনাথ

আবার কখনো আলো অন্ধকারে আঁকিবুকি রবীন্দ্রনাথের
পাণ্ডুলিপি লক নেস। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে জলাধার
কুমিরের মুখ।
কোথাও কোথাও যেন গণ্ডারের খড়্গ জ্বলে,
শিল্পিত স্বভাব
দিকে দিকে, এমনকি জিরাফের শায়িত গ্রীবায়
পাথরের আশ্চর্য কবিতা (লক নেসে)

এই গ্রন্থে 'রাস্তার বালক' দীর্ঘকবিতাটি গভীর মনোনিবেশের দাবি রাখে। কবিতাটির সূচনায় হাঙ্গেরির কবি ফেরেনক জুহাসজ (Ferenc Juhasz) এর কবিতার দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে:

'Heck-bent on life, line a sponge, I head for home
in the red, grcea and blue rain in the age of association'

এই উদ্ধৃতিটি কবির মানসতাকে সৃষ্ট করে তোলে। সমাজবাদের স্বপ্ন, বিপ্লবের স্বপ্ন শ্রেণিবৈষম্য দূরীকরণের স্বপ্নে একদিন উত্তাল হয়েছিল যুবক সমাজ—আজ হয়তো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রেক্ষিত বদল হয়েছে— মাৎসান্যায় গ্রাস করেছে পৃথিবীকে, কিন্তু এই সমূহ নাস্তির মধ্যেও অস্তির ইশারা সমূলে বিনষ্ট হয়নি। তাই একদিকে যখন কবির বেদনার্ত আর্তি ধ্বনিত হয় নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহে:

চন্দ্রকোটিতে ওড়ে নক্ষত্রবীথিকা
অ্যানটেনায় অদ্ভুত সময়।

যারা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল,
যারা আর স্বপ্নও দেখে না,
যারা আজো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে থাকে,

কারোর সময় নেই অভিশাপ আবার দেবার
কারোর সময় নেই আবার কাঁদার
কারোর সময় নেই বৃষ্টির ফোঁটায় ফের ফুল জড়ো করা

কবিতাটির সমাপ্তিতে বামপন্থায় কবির প্রবল আস্থা এক নতুন স্বপ্নের জন্ম দেয়— যা এই সার্বিক নৈরাজ্যের মধ্যেও বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে উশকে তোলে— কবির

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় এক বাক্‌প্রতিমার আধারে উপস্থাপিত। এক দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রস্তর দীক্ষিত পাঠককে সম্মোহিত করে

বাঁ দিকের স্বপ্ন তবু হাতিয়ার, আকাঙ্ক্ষার কমলে কামিনী
বাঁ দিকের স্বপ্ন কেউ গুঁড়োতে দেবো না

দীর্ঘ কবিতায় যেমন তিনি স্বচ্ছন্দ তেমন সংক্ষিপ্ত পরিসরেও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি একটি ছোট কবিতায় কীভাবে গভীর বোধ প্রকাশিত হয় মিতকথনের পাঠ্যে।

জীবন এখানে শান্তিময়
তোমাকে ছাড়া
ফুলেরা তা হলে? থাকুক না-হয়
স্বপ্নহীন
স্বেচ্ছামৃত্যু পেয়েছে জয়
তোমাকে ছাড়া
কথারা তা হলে? খড়ের ভিতরে
অন্তরিন। (অন্তরিন)

এই বহুকৌণিক বিচ্ছুরণ তাঁর কবিতার উপজীব্য বলেই কোনো নির্দিষ্ট মেরুকরণের ছকে তাঁকে বন্দি করা সম্ভব নয়। আপাত উচ্চকণ্ঠ এই কবি মন্ত্রস্বরে নিজেকে নিবেদন করেন 'নির্জনে মুহূর্তে' 'আমাকে বিলীন করো পঞ্চভূতে, বাতাসে ভাসাও/ মা আমার শয্যা পেতে রেখো।/মিথ্যের পোশাকগুলি ছিঁড়ে দাও, ওড়াও, ওড়াও/শান্তিতে দুচোখ জুড়ে থেকো' (মা আমার)

ভাঙা বইঠার গান। গণেশ বসু। মনন প্রকাশনী। দাম: ৮০ টাকা

চলমান ছায়াছবি: গণেশ বসুর কাব্য সমীক্ষণ

অজন্তা মিত্র (বিশ্বাস)

"একটুখানি সময় তুমি দাও
গাইছে পাখি বইছে নদী ডাকছে হাজার চোখ
তারপরে যা ইচ্ছে তোমার করতে পারো তাও।"

প্রথাগত কাব্যধারার ওপরে আধুনিক জীবন চেতনাকে রূপসংলগ্ন করে কবিতায় বিকশিত করে তোলার মধ্যে দিয়ে তাঁর কাব্যের প্রকাশ। কবি গণেশ বসু কাব্যজগতে উল্লেখযোগ্য নাম। কোনো কবিকে কখনও একটি কালের বলে চিহ্নিত করা কঠিন। তবুও বলতে হয় কবি গণেশ বসু ষাটের কবি।১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরিশালে'র (অধুনা বাংলাদেশ) দেহেরগতিতে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম, পৈতৃক নিবাস চাঁদশি, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ। ব্যক্তিগত প্রেম চেতনাকে সার্বিক প্রেম ভাবনায় উত্তরিত এই কাব্যগ্রন্থ । তাই তিনি বলেন, বাঁচার সংগীত তুমি জীবনের ময়ূখ মঞ্জরি (২৯ সংখ্যক কবিতা)। কখনও বলেন 'প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকা অলক্ষ্যে শেখায় / ভালোবাসা' (৩৭ সংখ্যক কবিতা)। ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া মানে ও কাজে সিদ্ধিদাতাই বটে। 'সোনালি গির্জার মোরগ চূড়া'র কথা বলেন (আমি চান্দ্রমাস পত্রিকার নভেম্বর ২০০২) সংখায় এই কবিতাকে 'The complete Fairy Tales' এর 'The Ball of crystal (Grimm the Brothers এর) সোনালি সূর্যের দূর্গ চূড়ার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখিয়েছেন) ভাষার কারিগর তিনি 'যেখানে রক্তের জলে সূর্য হেসে যায়', বিবর্ণ সব প্রেমিকা চোখ হয় সজল গভীর বসন্তের গানে'— রক্ত জল সূর্য, প্রেমিকা, বসন্ত সব মিলিয়ে স্বপ্নময় composition তৈরি করেছে। প্রথম কাব্যের রেশটুকু এখানে রয়ে গেছে। আস্তে আস্তে দেখা যায় 'এখন যৌবন কাঁদে অন্ধকার সময়ের সাহারা সংকটে / চোখের কোটর জুড়ে অন্ধ অমা, বুকে জ্বালা আর্তনাদ বাজে' (অন্ধকার সময়ে) আর শুধু প্রেম নয়, সংশয়, ক্লান্তি বেদনার ধূসরতা সমকালকে ধরতে চাওয়া নতুন আলো ও ভাবনা থেকে প্রশ্ন 'হে আমার রক্তাক্ত মৃত পাখিরা উজ্জ্বল হও, উজ্জ্বলতা আমাদের তীর্থভূমি' (তারপর)।

মানব হৃদয়ের নিবিড় আঁধার যেন যুগের অন্ধকারের সঙ্গে মিলে যায়। রক্তের ভিতরে রৌদ্র, ভীষ্ম কবিতায় তিনি যেন রক্তের গভীরের দুঃখের শিকলগুলো বেজে উঠতে শুনছেন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং নিরন্ন পাঁজর, শরশয্যা, রক্তের সম্পর্কের মানুষের দ্বারাই এই কৌরব -গর্বের এমন পরিণতি কবিকে আলোড়িত করেছে। 'ভালোবাসা' কবিতায় 'করতলে সূর্যের আত্মহত্যা', 'তুমি' কবিতায় বিদায়ের কুঙ্কুম', 'সমুদ্রশাসন'-এ কুঙ্কুমের সহস্র পলাশ, লাল সূর্য। 'অধিকার' কালচে রক্তের স্মৃতি, 'আহত চরায় কন্ট্রোলরুমের লালে উদ্ধত সঙ্গিন, দ্রাবিড় শৈশবে 'সাঁজোয়া বাহিনী দীপ্র রক্তের ভূগোল' একজন সৃজনশীল নাগরিক তাঁর অনুভূতির মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছেন রক্তের কত মাত্রা হতে পারে, রক্তের ভিতরেই স্বপ্ন ডানা মেলে, রক্ত শব্দটি যেন বহুমাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে Trope হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় শক্তিতে মাঝে মাঝে আস্থা হারিয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তিনি। রক্তের মধ্যে ভয়, জিঘাংসা, লোলুপতা, কান্না, মৃত্যু আছে, আবার আছে বিশ্বাস, বিশুদ্ধতা, ভালবাসার রং, যৌবন সব কিছু। অহল্যা পাষাণপ্রতিমা থেকে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন তিনি, Myth কে ব্যবহার করেছেন ঊনসত্তরের দিনগুলি লাশ ঠেলে চলে— উনিশশ ঊনসত্তরেও/আবার সালাম নামে রাজপথে/বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সমুখে'। সমস্ত 'শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসা লেনিন, লেনিন' ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে রচিত গণেশ বসুর কাব্যগ্রন্থ 'লেনিন: অধিকার রক্তের কবিতার'। এই গ্রন্থে বামপন্থী কবির ধর্ম, জাত, আগুন, সমুদ্র সব কিছুর মধ্যে একজনকেই খুঁজেছেন, তিনি ও কবি তরুণ সান্যাল 'লেনিনের যুগ' সম্পাদনা করেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল লেনিনের শতবর্ষে। এখানে বিমলচন্দ্র ঘোষের সহস্রাক্ষ সহস্রশীর্ষ সহস্রপাদ লেনিন' (১৯৭৫ খ্রি প্রকাশিত) মনে হয় গণেশ বসুর কবিতায়ও তদ্রুপ প্রতিনিধি 'একটি শব্দের হাঁকে হাজার হাজার রক্ত কণিকা আশ্চর্য আগুন', 'জমিদারের বর্শা গাঁথে স্বর্ণবোনা পেশল পুরুষ', 'ভেড়ির মালিক পিটিয়ে মারে মৎস্যগন্ধার হাজার বুক', ক্ষেতমজুরের প্রাণ, রক্তাক্ত আলোক থেকে আলোকে অভিযান, 'মোরগঝুঁটি লাল' প্রশ্ন, থুবড়েপড়া মুখগুলির যে সব শ্রম ফসিল হয়ে যাবে আদর্শের অজস্র রক্তাক্ত 'পলাশফুল' গুলি যেন বসন্তের পরাজয় বলে মনে হয়। পলাশগুলি যেন লাশ হয়ে গেছে। ফুলের মত বিশ্বাস ও ভালবাসা যেন শুকিয়ে মরে গেছে। বিধ্বস্ত বিবর্ণ লক্ষ্যহারা জীবন, যেন পলাশ থেকে লাশ হয়ে গেছে, নাকি লাশগুলি পলাশ হয়ে নতুন করে ফুটবে। আলোকিত যৌবন প্রশ্ন রাখে, 'আলোকপর্ণা ভাবনা' প্রতিশ্রুতি 'মুক্তি চেরাগ জ্বেলে' সেই সৈনিক কবে আসবে তার প্রতীক্ষা করছে, অজস্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যেন আলোর ফোয়ারার ভিতর দিয়ে ইতিহাস গড়ার অধিকার আনে, হাঁটেন লেনিন।

গণেশ বসু কবিকৃতির আর একটি স্বাক্ষর 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ'। সময়কাল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। 'বন্দুকেরই ঠোঁটে শাসন আবেগ আমার রাজ্য বেশ' (জবানবন্দি)। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন দেশের স্বপ্নে বিভোর সেই মাতৃভাষার প্রতি, দেশের প্রতি সম্মান জানান গণেশ বসু। অমৃত আস্বাদ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে লড়াই এখনও বাকি। 'মৃত্যু' শব্দটির গমক এখানে চমৎকার। প্রবাদ আছে অমৃত পান করে লোকে অমর হয়। স্বাধীনতালাভের অমৃত পান করে প্রচলিত প্রবাদের বিপরীতে দেখা গেল এখনও অমৃত লাভ হয়নি, চারদিকে সন্ত্রাস, 'বেয়নেটের চুমা ধোঁয়ায় লাঠি, টালমাটাল বাতাস, বারুদ, বিপুল তীব্রতা, নিরন্ন স্বদেশ'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গড়তে এখনও দেরি। অহল্যার Myth ব্যবহার করেছেন তিনি, পাষাণে ধীরে ধীরে প্রাণ জাগবে, এখনও লড়াই। 'লড়ছি কারণ শিরায় ভালোবাসার ডাগর সাধ/লড়ছি আমি, লড়াই আমার রৌদ্রহাতিয়ার।... লড়ছি কারণ শহিদ আমার ভাষায় কথা কয়/লড়ছি আমি লড়াই জ্বলে প্রাণের অঙ্গীকার'/(রৌদ্র হাতিয়ার)। অহল্যার পাষাণী প্রাণ থেকে জীবন্ত রূপের প্রাণ— বাংলাদেশে গড়বে নতুন বাংলা, পূর্ববাংলায় পূর্ব দিক যেন নতুন ভোরের অঙ্গীকার নিয়ে এক লড়াকু বীরের সাহসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে। ক্রুদ্ধ ব্যথিত ভালবাসার কথা আছে 'বাঘের থাবার নিচে' (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ) 'বিস্মৃতি বিলীন প্রান্তে ভেসে যায় আমাদের বোবা দুঃখগুলি' (উপলব্ধি)। স্বপ্নের ভিতর থেকে এখন শব্দ ফিরে আসছে 'ভুবনলতায়'। স্বাধীন সাংবাদিকতার নামে পায়ে বেঁধেছে 'মোরগ হাওয়ায়' ঘুঙুর, বারবার স্বপ্নভঙ্গের আত্মিকক্ষয় সত্ত্বেও ঘৃণার, রক্তে, গর্বে লড়াই-এ ক্ষতবিক্ষত মানুষ। গণেশ বসু বলেন 'মুখ' কবিতায় 'অহর্নিশ 'জলন্ত বাঘের চোখ রক্তে তাড়া করে'। এখন সমস্ত 'বাঘের থাবার নিচে'— 'স্মৃতির করুণ মেঘ ডানা ভাঙা পাখি'... বোধের করোটি নিয়ে, বুকে বুকে বুকে খরার আগুন' (এখানে হৃদয় নেই)। কবি বলেছেন বিদগ্ধ মানুষ মানবাত্মার কাতর ক্রন্দন থেকে তৈরি হয়েছে স্মৃতির করুণ মেঘ, ভালবাসা, যা করুণ করাত— চলে ভেতরে ভেতরে আতঙ্ক। কবি নাম দেন 'নীরব সন্ত্রাস' (১৯৯৯ খ্রিঃ)।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণজাগরণে, অনুশীলিত সরলতার বিশ্বাসের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা, স্বপ্নভঙ্গের ছবি তাঁর লেখনের অভিমুখকে কোন, দিকে নিয়ে যায়। 'কোন অসুখে যৌবনেরই মুখগুলোকে ঝাপসা রেখে/ মেঘের ভিড়ে হারিয়ে যাই ভস্ম মেখে'। জীবনদর্শী কবির এই উক্তি যেন বর্তমান যুগে করোনা- আবহে মুখঢাকা মুখগুলিকে মনে পড়ায়। নিশ্চয়ই তিনি কল্পনাতেও এমনটি ভাবেননি, তবু যেন কথাগুলি এই অবস্থায় বেশ চলে যায়। তিনি তাঁর 'গন্ডার' কবিতায় দুঃখ করেছেন 'নিখিলের ঘোড়াগুলো কেন যে এমনভাবে বদলে যায়

মাতালগন্ডারে?' জরাসন্ধ সময়', অন্ধতা, চাবুক, স্বপ্ন, শব্দ, মুষলের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা এ যেন ভয়ের আতঙ্ক আবহ রচনা করেন। খরায় এমন পোড়ে সংবেদনশীল মায়াবী উষ্ণতা। 'খরার ভিতরে আমি খরা কেন? দেশজোড়া খরা।' পরের গ্রন্থ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'অন্ন, অশ্রু, ভায়োলিন'। কবিতার ভাষাভঙ্গি, কাঠামো, অবয়বের তীব্রতায়, বোধের জাগরণের মন ও মননের মিশ্রণে— ভাবের সঙ্গে চোখের জল ও তার পায়ে বেহালা যেন করুণ স্পর্শী Trio হয়ে উঠেছে। সর্বদিকে হতাশা, গ্লানি 'দেড়খানা নেতার পকেটে' গণতন্ত্রের হুমড়ি খাওয়া (নেতা একজন থাকলেও তাঁর পারিষদরা অন্যায় করে, নেতাই লোকের অসন্তোষ ও ক্ষোভের কারণ হয়)। তাই তিনি বলেন 'তোমাদের কাছে ছিল শুশ্রূষায় উত্তরণ, ঋতুবদলের/মূল্যবান মুখগুলি অন্তহীন যন্ত্রণার শেষ (প্রত্যাশাপূরণ)'। কিন্তু দেখা গেল 'বঞ্চনার কারুকথা, স্বপ্নের খোয়াবনামা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে/কুমিরছানার গল্পে চলে যাচ্ছে, চলে যাবে ভাঙনে আদরে' '(কারুকথা)', নিরন্ন মানুষের কাতরতা, ক্রন্দন, অভিজ্ঞতা ও বেদনার আলেখ্য থেকে তৈরি অশ্রু, স্মৃতির হত্যা, ধোঁয়া, মিছিল পেরিয়ে পতনের সিঁড়ি দিয়ে যেন নেমে যায় পাতালঘরে। এ যেন 'ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যার বটবৃক্ষ' (নিরুপায়)। কবি এক চরম অসহায়থার কথা বলেছেন। বটবৃক্ষের সম্বন্ধে 'সত্য' শব্দটির কথাই বলা হয়, যে আশ্রয় দেয়, রূপকথায় সে তার কোটরে ভরে রাখে শরণাগতকে, তার অজস্র ঝুরি, একজন বয়স্ক গুরুজনের মতোই যেন বটগাছ। আজ সেই বটবৃক্ষ (যাকে সত্যযুগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়) যেন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, হন্তারক হতবুদ্ধি যেন সময়ের আর এক নাম। পুঁজির বিশ্বায়নে স্মৃতির সুস্থতা নেই। পোড়াটে বল্কল ছেঁড়া কাঁথার মতই 'বাতাস মাটি জলকে দূরে রেখে দেয়' পোশাক আশাক বদলে শোষণ ফিরে ফিরেই আসে', 'সুন্দর সুড়ঙ্গ কেটে ঘনায় ট্রাজিডি' (দৌড়) 'নবনাৎসি' বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন অত্যাচারী শাসকদের হাতে 'মৃত্যুর মহড়া' 'চলে দিনগুলি চলে যায়' জনগণের বিবেককে তিনি যেন করুণ স্বরে ডাক দিয়েছেন। এই স্বর কি ভায়োলিনের সুর?' কবি 'ছন্ন স্মৃতি' কবিতায় বলেন 'চেয়ারের ধ্যানে বেশি ডুবে গেলে পথের কথারা আর মনেও জাগে না। শাসকদলের ভুলভ্রান্তি হলেও কবি তাকে ছেড়ে দেন না। বুঝিয়ে দেন 'চালচিত্রের রূপটিকে বাস্তব লোকেরা তাই পেটো ছোঁড়ে, টায়ার ফাঁসিয়ে দেয় এলোপাথাড়িয়া/ইঁটে ইঁটে ভরে দেয় অলিগলি ....মেরে আগুন বেরোয়।'

ম্লান কষ্টধিত পারিপার্শ্বিক হলেও ভদ্র মার্জিত সংস্কারের হৃদয় তাপের মননঋদ্ধ বাক্যবলী অবজ্ঞা লাঞ্ছনাও অমর্যাদার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় কবির

ব্যক্তিগত জার্নাল, 'চোরাঘুর্ণি ঝাঁপ দেয়, ছায়ায় ছায়ায় নাচে বিশ্বাসঘাতক', তাই 'ক্ষতবিক্ষত সুন্দর, সংসারে, অগ্নি অন্ন অশ্রু ও ভায়োলিন' বেঁচে আছে। তাই আজ যেন সময় এসে গেছে। সমর্পণের রুগ্ন ছায়া মৃত্যু মোহনায়'— কারণ 'স্বপ্নেরা মরে না।' এরপরে ভাসান দরিয়া' (২০০৮ খিস্টাব্দ) এবং 'ভাঙা বহঠার গান' (২০১১খ্রীঃ) তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ। জলকে ভালবাসার কবি সমুদ্র ও বইঠার কথা বলছেন। 'সমুদ্র মহিষের কবি সমুদ্রের গর্জন ও প্রতিবাদী সত্তাকে একদা মিলিয়ে দিয়েছিলেন, যখন রক্তের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন ও মহিষের গর্জন একত্রে। ফেলেছিল শ্বাস, কাজেই জলকথা তাঁর কাব্যে বারবারই উপস্থিত। পুরানো বিশ্বাস ও উদাত্তস্বরে দ্রোহের কালে প্রতিকারের লক্ষ্যে প্রতিবাদ হয়েছে। ভালবাসার নামে জলে স্থলে কবি যখন প্রশ্ন রাখেন 'শবসাধনা সুখ পেয়ে কি মাতাল হলে মধ্যযামে/বা কোন্ তামসের তপস্যাতে প্রিয় আমার মাতাল তুমি।' মনে পড়ছে 'লড়াই আমার দোটান বোধে আরেকভাসানে/লড়ছি আমার লড়াই আমার রৌদ্র অধিকার' '(রৌদ্রঅধিকার: পূর্বোক্তা)' ভাসান দরিয়ায় 'মা' ও 'ভাতসরা', 'পরিশেষ', 'ডিসেম্বর' অনেকগুলি কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনের কথা আছে। সন্তানের বিদেশে অবস্থান, নিজের জন্মদিনে স্মৃতির বৈরিতা মা-এর একটি লোকখাদ্য ঢেঁকিশাকের প্রতি প্রীতি এবং 'ভাতসরা' কবিতায় একটি লৌকিক আচারের কথা আছে। মৃত পিতার উদ্দেশে ভাতসরা দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো সত্ত্বেও শ্রদ্ধাঞ্জলি শুধু নয়, বাবা যেন বলছেন 'সাঁকো' না ভেঙে, তাঁকে ফিরিয়ে নিতে, ভাতসরা দিয়ে তাঁকে পৃথক না করতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'। বিভিন্ন মানসিকতার কবি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের জয়গান করেছেন। গাঢ় চকোলেটের সঙ্গে ভালবাসার গভীরতার উপমা, হাঁটুর ব্যথায়। ওয়াক্সবাথ মোমগলানো চিকিৎসায় ব্যথাতুরতার সঙ্গে র‍্যাফেলের দাড়িহীন হাঁটু, উলের বলের মত হাঁটু—যন্ত্রণার সঙ্গে সরসতার মেলবন্ধন গণেশ বসুর কবিতাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সাগরে ডিঙা ভাসিয়ে দোল খাওয়ার কথা, মাছরাঙা শঙ্খচিল সবই জলের সঙ্গে সংযুক্ত। কখনও বিসমিল্লার সানাই-এর সুর (বিসমিল্লায়) নিঃস্ব মেঘ, আপ্লুত নদী— (কোথায় গেল শিকড় বাকড় কোথায় আমার মা—ভাসানদরিয়া।

২০১১ খিস্টাব্দে রচিত 'ভাঙা বইঠার গান' শুরু হয় কান্না দিয়ে, 'কাঁদো' বলে, এখানেও সেই অশ্রুসজলতা, 'শহিদ' কবিতায় শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে স্মরণ করলেন, মাতঙ্গিনী হাজরা, ভগৎ সিং, জোয়ান অব আর্ক সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 'শহিদ অনন্তকাল হৃদয়ে আগুন জ্বালে' ভাঙা হল কেন বইঠা?

স্বপ্ন দরিয়ায় ভেসে আজ পরিবর্তন দেখে বলতে ইচ্ছা করে মৃত্যুর সীমানা ছুঁয়ে স্বপ্নের ভিতর চলে অভিযান। সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে স্বকীয় প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় বিধানের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের বিশ্বাসের সমান্তরালতা না দেখতে পেলে বিরাগ বিরূপতা, ক্রোধ থেকে ক্ষোভ জন্মায়...। সমস্ত বিষণ্ণতা ভয় নিরাশাকে অতিক্রম করে একাকী চলেছেন তাঁর কবিতার প্রাণরস নিয়ে, 'বিশ্বাস মরেনা তবু একদিন সকলেরই ঠিক ভাল হবে' (আস্থা) 'সব কেন শেষ হবে? (জলসত্র) এখনও এখানে কেউ নেই। ছিন্নভিন্ন বইঠার গান সাগরে ভাসে ঠিকই কিন্তু তবু 'স্বপ্ন জ্বলে, স্বপ্ন নেভে' (ঘোড়ারা কী দেখে রাতে) 'জেগে উঠা'র আগে/সবাশব্দেই কেন বেজে ওঠে ভালোবাসা, ভালোবাসা'। (প্রেমের জন্য অপেক্ষা তবু করে গেছেন কবি ঝিঙেফুল ইরিনার। কবির বার্লিনে থাকার সময়ের এক লালন ভালবাসার সোনালি আবেশে আপ্লুত হন। 'তোমাকেই চাই', 'হে আমার ভালোবাসা', সাতটি স্বরধ্বনির ভিতর ভেনাস'। 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়া কথা', 'কথায় কথায় সুর, সুরে সুরে ভালোবাসা', শীতের দেশে জায়গা বদল, কারা যেন বার্লিন জুড়ে বদলে যায়, ফিরবার পথে— 'বিগত সময় যখন কাছে চলে আসে দেখি জানলার ধারে পাখিরা গাছে'। ভালবাসাও মাঝে মাঝে বিরল ব্যর্থতায় পর্যবসিত। নিঃসঙ্গ গাছের মত মানুষ বাঁচে, ফুলগুলি বিপন্ন বাতাসে ভাসে, কারো কারো কেবল ছায়া কথা বলতে থাকে। শাপলার ফুল হয়ে জলের ওপর ভেসে থাকা, আকাশকে চাওয়া বৃষ্টির পরেও রামধনু জেগে ওঠা হৃদয়ের গঠন পতনের মধ্যেই ভারতবর্ষকে তিনি খোঁজেন, হয়ত পেয়েও যাবেন শিকড়ের টানে 'নির্জন মুহূর্তের ঘাটে, ব্যক্তি সত্তার উন্মোচন তাঁর জীবনের অভিমুখে। 'মৃত্যুই সেরা গান/সৃষ্টির তাড়া অরণ্য মর্মরে/অঙ্গারে অভিমান'।

গণেশ বসুর পরের কাব্য ২০১৩ খিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বর্ণময় পৃথিবী'। একতারা হাতে যেন সহজিয়া কবি, 'সেদিন ছিল মেঘলাদুপুর বাজাচ্ছি একতারা/ হাতের তেলোয় উষ্ণতা কার আচমকা দেয় সাড়া', আবার শেষাংশে 'অবাধ্যতায় উদ্‌বেগে আর সংশয়ে দিই সাড়া/আউল বাউল মেঘলা দুপুর বাজাচ্ছে একতারা, বাজাচ্ছি' থেকে 'বাজাচ্ছে' অর্থাৎ দুপুর এবং আমি একত্র ও একান্ত একতারার সুরে।' 'কানামাছিতে' (একটি লোকখেলা) তিনি বললেন 'মেঘে মেঘে ঘোরাফেরা/ভালো লাগছেনা'— সময়কে জড়িয়ে ধরে ব্যক্তিক অনুভূতি থেকে নৈর্ব্যক্তিক দিকে। তিনি বলেছেন 'মৃত্যুতে শেষ ছৌনাচ আর মুখোশের কানামাছি'। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কানামাছি' শাসকশ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অসমের কবি অভিতাভ দেবচৌধুরী বলেন 'বিদেশি ভাষার অনুবাদ মাত্র হয়ে বেঁচে আছি/স্বভাষায় ও স্বদেশে প্রাণ তাই খেলে কানামাছি'/

বিদেশের কাছে সদা আগত স্বদেশবাসীর ভুল ভাঙাতে এখানে অমিতাভর কণ্ঠেও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আল মাহ্‌মুদ যখন বলেন 'পাখিটা লেজ উঁচু করে আমার বন্দিদের বিরুদ্ধে গাইছে' (দোয়েল ও দয়িতা), তখন আমরা তাঁর হৃদয়ের ব্যথার প্রতিবাদ বুঝি। গণেশ বসু বলেন, ছোনচোরে হিটকায়/বোগডারে ঘোল ঢালছে ধইন্যামরিচগুলা/সহত্ত ভাইস্যা যায়' (কেউ বোঝে না মানে)। স্বতঃস্ফূর্ত লোকজীবনকে পাথর চাপা দেবার বিরুদ্ধে অগ্রজ ও অনুজ কবির প্রতিবাদ মুখরতা সহজ সরল ভাষায় কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। গণেশ বসুর (২০১৫ খ্রিস্টাব্দে) 'বলগা হরিণের শিং' কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ পায়। 'বল্‌গা হরিণ' (Rebindeer curibow) আকারে বিরাট এবং শীতপ্রধান দেশে মালামাল বহন করে। এস্কিমোদের শ্লেজ গাড়ি টানে এই বিশেষ প্রজাতির হরিণ। এই হরিণের শিং খুবই জটিল, সর্পিল এবং শিকড় বাকড় সমেত যেন অতিরিক্ত জটিল ও কঠিন পথের মত। রাজনীতি সচেতন কবি এর মধ্যে যেন সময় ও পরিবেশকে মিলিয়ে দেন। জীবনের সর্বপূর্ণতা মানুষ কখনই পেতে পারেনা। অতৃপ্তিই তাকে দিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে বলিয়ে নেয়। এমনকি মৃত্যু ভাবনাও তাকে এক বিপন্ন বিস্ময়ের জন্ম দেয় (জীবনানন্দ), অস্তিত্বের সংকট যেন সহস্র সর্পিল আকারে চলে। 'বল্‌গা হরিণের শিং' এর কবি বলেন 'মৃত্যুহীন পৃথিবী কি ভালবাসা দিয়ে ফের গড়ে নিতে পারি না।' এখানেই তাঁর আশাবাদের স্বকীয়তা, 'ঘুঙুর' কবিতায় তিনি বলেছেন 'বৃত্তের ভিতর থাকলে সব পাওয়া যাবে'। গণেশ বসু বলেন 'মগজে কারফু জারি করা মোটে সহজ নয়', কারণ কবির মতে 'পৃথিবী শাসন করে ভালবাসা', 'প্রেমহীন দ্রোহহীন আঁচড় কাটে না তাতে সময়ের ঋণ।' বিষ্ণু দের 'স্কান গোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে', আর গণেশ বসুর ভাষায় 'আমার দু হাতে ছিল আকাশ, সমুদ্র আর শস্যের সংগীত।' এখানেই তাঁর নিজস্বতা তাই তাঁর কাব্যে আলোকস্তম্ভের মত জীবনের প্রার্থনাই আছে।

আমি থেকে আমরা-র পথিক গণেশ বসু

তাপস রায়

''আমরা ঘাসের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলাম/সেই ঘাস দেখতে দেখতে ফসল হয়ে উঠলো;''— এ দু'টি লাইন মিরোশ্লাভ হোলুবের। আমি নিলাম। নিলাম কবির যাত্রাপথ দেখতে চাই। ব্যক্তিকবির ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা গণমানুষটির কীভাবে জাগরণ হয় আমরা দেখতে চাই। পৃথিবী নামক গ্রহটি বা যে কোনো স্বতন্ত্রতার প্রস্তুতিপর্ব জানতে যে আগ্রহ থাকে জিজ্ঞাসুর, সেই আগ্রহেই দেখতে চাই একজন কবির উন্মেষপর্বটি। একটি ফুলের ফুটে ওঠার আগে তার যে জার্নি, তার যে বেদনা, তার যে সংগ্রাম— তার সব কিছু যেন চোখে পড়ে। যেকোনো ম্যাজিক থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই।

মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিমূল প্রেম। সে কবিতার সাথে হোক, প্রকৃতির সাথে হোক কি মানুষের সাথে। এই ব্যাপারটা ইন্সটিংক্টলি তৈরি। আর যদি বিপরীত লিঙ্গের সাথে হয় তো জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন তুচ্ছ লাগে। আমরা জানি শিবের প্রলয় নাচ। জানি হেলেন অব ট্রয়। বিষ্ণু দে জানেন, ''হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল/দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী/কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।'' শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলবেন, ''ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাব/যেদিকে দুচোখ যায়— যেতে তার খুশি লাগে খুব।''

আমরা দেখেছি নতুন আধুনিকতা, বা বলা যায় পাশ্চাত্য দীক্ষা বক্ষমান করে আমাদের কবিরা প্রায় সকলেই এক একজন নারীকে বুকের ভেতরে লালন করেছেন। বিষ্ণু দে-র ক্রেসিডায় যে আড়াল তা জীবনানন্দের বনলতায় আর থাকছে না। জীবনানন্দ থেকে এই সব নারীরা সঙ্গোপনতা বা ঘোমটার আড়াল পরিহার করে অনেক বেশি মুখোমুখি। বুদ্ধদেবের এলো কঙ্কাবতী। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নীলিমা, সুনীলের নীরা, ভাস্করের সুপর্ণা, বিনয়ের গায়ত্রী আর এই কবির মনোজগত দখল করে আছে বনানী।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' দিয়ে শুরু হল সফর। মৃত্যুর পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক অনেক কথাবার্তা আর জীবনচারণের ভেতর সেদিন চোখে পড়ল, বলছেন, সেই নবীন বয়সে যে সৌমিত্র কবিতা লিখত তাতে হয়ত

অধিকার করে থাকত মেয়েদের মুখ। কারণও বলেছেন, তখন নানা কাল্পনিক অভিঘাতে টলায়মান মাথা। হ্যাঁ আমরা জানি, যুবক বয়সের কবিতা চর্চায় কোনো কবিই ওই আকর্ষণের পরমতা অস্বীকার করতে পারেননি।

পারেন না বলেই তো কবি লিখবেন : "বাঁচার সংগীত তুমি জীবনের ময়ূখ মঞ্জরি।/অথবা শরীর হতে ভালোবাসো? অথবা আগুন! কী যে চাও, জটিল রহস্য তুমি মহাবিভাবরী/অফুরান আধিপত্য? দুর্নিবার মদিরা দারুন?"

(২৯ সংখ্যক কবিতা, বনানীকে কবিতাগুচ্ছ, গণেশ বসু, ১৯৬৪)।

যৌবনে পা রেখেছেন। ধরা যেতে পারে এই কবিতা বইটি গ্রন্থিত হবার আগেই লিখিত। আন্দাজ করা যাক এই কবিতার রচনাকাল ১৯৬১ থেকে '৬৩-র ভেতর। ১৯৪০-এ জন্ম হলে বয়স হবে ২০-২১। মানে ঝিকিমিকি দিয়ে উঠছে সুকান্ত কথিত 'আঠারো বছর'। তখন অনুভবের মেদুর আহ্বান। অনুভবের তো কোনো রং রূপ হয় না। তা কেবলই বেজে ওঠা। নদীর চলমানতার ছলাৎ ধ্বনি বা। এই কবি খুবই যোগ্যতরভাবে এই অনুভবকে তাই চিহ্নিত করতে গেলেন না। মানে দেগে দিতে গেলেন না। প্রেম একেবারে নিষ্কলুষ রাখতে, তুলনাহীন রাখতে বসন্তের হাওয়ার মতো বইতে দিলেন। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' তাই শিরোনামহীন। 'বনানীকে' সামনে রেখে একটা সম্মোহন পথ চলা শুরু করল। সে সম্মোহন, আমরা ক্রমে দেখব এই কবিতাগুচ্ছের সাইঁত্রিশটি কবিতা ধরে দিতে পারল না। সে রূপ পাল্টেছে হয়ত, চলার ভঙ্গি আর বাঁক নতুনতর হয়েছে বটে, কিন্তু আজীবন যেন এই প্রেম কবিকে আঁকড়ে থাকল।

এই কবি ছাত্রজীবন থেকেই মার্কসবাদ স্পন্দিত। মানে ঝুপ্ করে দর্শন তাঁর উপর লাফিয়ে নামেনি। ব্যক্তি অনুভব আর মার্কসবাদ এর ভেতর যে বিরোধ নেই তা তিনি পড়াশুনো করেই জেনেছিলেন। যেভাবে কবি বিষ্ণু দে এই বিশেষ পাশ্চাত্য দর্শনে উদ্বুদ্ধ থেকেও ফ্রয়েডের লিবিডো ধারণায় কবিতার শরীর রঞ্জিত করে দিতে পারেন। বিষ্ণু দে 'চোরাবালি'তে লেখেন, "হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর/আয়োজনে কাঁপে কামনার ঘোর/কোথায় পুরুষকার/অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?"

এই অঙ্গীকার শব্দটি দিয়ে বিষ্ণু দে যেমন তাঁর রক্তের ভেতর লালিত দর্শনকে সঙ্গে রাখেন, তেমনি 'পুরুষকার' শব্দটিকেও কামনাবৃত্তের পাশে অচ্ছ্যুৎ রাখলেন না। আমাদের এই কবি লিখলেন, "তোমার বিচ্ছেদে এই তৃষ্ণাতুর যুবক চতুর/কোন্ পথ খুঁজে পাবে? মণিময় সুভদ্র স্মৃতির/গরলে কি মজ্জমান? নষ্ট আমি? বিষাদে আতুর?/তুমি কি অতলস্পর্শ, তুমিও কি মায়াবী শরীর?" (২৯ সংখ্যক কবিতা, বনানীকে কবিতাগুচ্ছ, গণেশ বসু)।

যেকথা হচ্ছিল, একটি বিশেষ দর্শন দ্বারা শুরু থেকেই পীড়িত থাকলে, আর তা যদি বিশ্বের বেশি মানুষের পক্ষের দর্শন হয়, তাকে একটি সেনসিটিভ ব্যক্তিত্ব সারা জীবনে খারিজ করতে পারেন না। যে দেশভাগ, আর দেশভাগজনিত অন্ধকার পটভূমির ভেতর দিয়ে ষাটের সব কবিকেই চলাফেরা করতে হয়েছিল, তা যেন এই বিশেষ দর্শনের আলোয় জারিত করে দেখতে চাইছিলেন আমাদের কবি। হ্যাঁ সত্যি তো দেশভাগের কুফলে মানুষ একেবারে দূরবস্থার গহ্বরে পড়ে গেছে সে সময়। সেখান থেকে উঠে আসতে তো একটা এক্সটার্নাল সাপোর্ট দরকার। ষাটের অধিকাংশ কবিরা যখন এই সামাজিক দুর্ভোগটিকে এড়িয়ে যেতে হাংরি, শ্রুতি, ধ্বংসকালীন— ইত্যাদি আন্দোলনের আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা বা মুখ লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন, মাত্র কয়েকজনই তা না করে মুখোমুখি হয়েছেন দেশ, ভিটে, ভাষা, স্বজন হারানো সময়টিকে বিম্বিত করতে। এঁদের ভেতর আমাদের আজকের কবি ছাড়া নিশ্চই মনীভূষণ ভট্টাচার্যের নাম কবিতা পাঠক মনে রাখবেন।

আমাদের কবি খানিকটা বৈদগ্ধ্যে আর অনেকটা দর্শনে তাঁর পূর্বসূরী বিষ্ণু দে-কে যে ধ্যেয় করেছিলেন তরুণ বয়সে তা হয়ত ভাবা যেতে পারে। ১৯৬৭-তে ' নিজের মুখোমুখি' বের হলে সেই বিষ্ণু-দের দ্বিধাদীর্ণতার যন্ত্রণা যেন তাঁর কাব্যভাষা অধিকার করে রাখল।

"বরং তুমি হারিয়ে যেয়ো অন্ধকারে
স্মৃতির ভারে
ঝাড়লণ্ঠন তেকোণা কাচ সবুজ রাতে,
যন্ত্রণাতে
আমার বুকে হাহাকারের শূন্য নদী,
অদ্যাবধি
তবু তোমার খোঁজে বেড়াই তেপান্তর
কিন্তু দেখি ফাটল শুধু মনান্তর।
সামনে দেখি ফাটল শুধু যুগান্তর
ঘুর্ণিঝড়
....."

(রক্ত ঝরে নিরন্তর, নিজের মুখোমুখি, গণেশ বসু)।

বিরুদ্ধতা ও দ্বৈততার চিন্তন বিষ্ণু দে-কে নিয়ে যেমন সারা জীবন খেলেছে, আমাদের কবিকেও অন্ততঃ এই পর্বে সেরকম দ্বিধাদীর্ণতায় বসে থাকতে দেখা যাবে। বিষ্ণু দে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে এলিয়টের টেকনিক আত্মস্থ করেছেন।

এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেটস' বাজিয়ে দিয়েছেন 'জন্মাষ্টমী' কবিতায়। সঙ্গে সঙ্গে 'সন্দীপের চর' থেকে তিনি যেন অন্তঃজীবী মানুষের কবি হতে চান। বন্ধু যামিনী রায় ফোক্ এ ঢুকে পড়ছেন, জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ছবি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে জনতার কবি হতে চাইলেও তো এলিয়টের গম্ভীর, গভীর প্রণোদনা এড়াতে পারছেন না। একদিকে রোমান্টিসিজমকে নিখুঁত , বাহুল্যহীন বাক্য দিয়ে সাজানো, অন্য দিকে সাম্যবাদের জন্য আকুলতা— "তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ/ এ জনতার—/কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি, আর কামার।" (সাতভাই চম্পা, বিষ্ণু দে)। বিষ্ণু দে অনুসারী ও প্রীতিধন্য আমাদের কবিও এই দ্বিধাদীর্ণতার কাঁটায় নিজেকে বিক্ষত করেছেন অনবরত। বলা যাবে প্রেম ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বে আজীবন পিষ্ট হতে থাকবেন আমাদের কবি। কিন্তু সেই বিখ্যাত কবিতা 'সমুদ্রমহিষ' এ পর্বেই উত্থিত হবে। 'সোনালিমোরগ' কবিতায় ধরা দেবেনও। "ওদিকে তাকালে কেন পুড়ে যায় সোনালিমোরগ/করতলে নক্সা আঁকে সূর্যের কণিকা,/এ-এক অন্তর্দাহ, ক্রেন আর ট্রাক্টরের ভিড়ে/হারিয়ে যাবার আগে পিছুটান্ দুঃখবোধ অন্ধকারগুলি/দাঁতের করাতে তীক্ষ্ণ, দ্বিধাদ্বন্দ্বে হত্যার ভূমিকা।/তাহলে কি অভিশাপ?"

ব্রেখ্ট বলেছিলেন "watch the people's mouth"। কিন্তু এই 'ওয়াচ' ক্রিয়াটি নাটকে, গল্পে সত্যি খুব জরুরি। কবিতা যেহেতু ঠিক মুখের ভাষা নয়, মুখের ভাষার কাছাকাছি অন্য একটা ভাষা, যা কবিকে নিজে নিজেই তৈরি করে নিতে হয়, তা অধিকাংশ কবির মতো আমাদের কবিও মান্যতা দিয়েছেন। গোটা পঞ্চাশের অধিকাংশ কবি যখন এই মুখের ভাষাকে আরো মুখরতায় নিতে সংবাদপত্রের ভাষাকে আশ্রয় করেছেন তখন আমাদের ষাটের কবি নিশ্চিত করে তাকে স্বাগত জানাতেই পারতেন। তাতে সুবিধা ছিল তাঁর। যে সমাজবাদী ভাবনা নিয়ে তাঁর পথ চলা তা আরো বেশি বেশি করে হয়ত জনতার দরবারে পৌঁছে দেয়া যেত। তাঁর সমকালে মণিভূষণ ভট্টাচার্য তো এই মুখের ভাষাকে চূড়ান্ত করেছেন 'গান্ধীনগরে একরাত্রি'-তে। "শালা কুত্তার বাচ্চা, নেকু সাজছ?/দুপুরে তুমি টিপিন কেরিয়ারে করে ভাত পৌঁচে দাওনি, বান্‌চোত?"

কিন্তু আমাদের কবি যে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাসের হার্দ্য ভাষার উত্তরাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন প্রথম থেকেই। সোশ্যাল ক্যারেক্টার হয়ে ওঠার তাগিদে কবিতার ভাষাকে আক্রমণ করেননি। তিনিও প্রতিবাদে যাবেন, তবে আস্থা রাখবেন বুদ্ধদেব বসুর দেখানো হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে। বুদ্ধদেব বলেছিলেন যে "কবিতার ভাষা কখনো অবিকল সাধারণ বাস্তব মানুষের মুখের ভাষার মত হতে পারে না; ... শুধু এমন একটা মোহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন এই

ভাষায় কোনো বিশেষ মানুষ কোনো বিশেষ অবস্থায় হয়তো বা কথা বলতে পারে, অন্তত বললে অসংগত হবে না স্বাভাবিক শোনাবে। কবি যদি পাঠকের মনে এই সম্মোহ সৃষ্টি করতে পারেন যে তাঁর ভাষা স্বাভাবিক ও সপ্রাণ, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো— তিনি তৎসম না দৈশিক শব্দ বেশি ব্যবহার করেছেন, তাঁর ছন্দ প্রকরণ হালকা না গুরুগম্ভীর, এ-সব প্রশ্ন অবান্তর।"

পাঠকের মনেও হবে সেসব কথা যখন দ্বিতীয় গ্রন্থের পর ১৯৬৯-এ তৃতীয় গ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'-তে বিষয় খরশান হয়ে মানুষের পক্ষে এসে গেলেও বলার ভাষা পাল্টাল না। আমাদের কবির কলম প্রতিবাদে তরবারির মতো ঝিঁকিয়ে উঠলেও মণিভূষণের মতো সো কল্ড ফিলদি টাং এলো না। এলে বরং মানাত ওই অশান্ত সময়ে। কিন্তু আমাদের কবি যে ভাষার আভিজাত্য মান্য করেন। তিনি নিজের ভাষাতেই 'দ্রাবিড়কেশরে' কবিতায় আক্রোশে লিখলেন:

"এবং আক্রোশে জ্বলে ভয়ংকর প্রতিশোধ দ্রাবিড়কেশরে
সেদিন প্রত্যাশা আনে বিশাল মশাল
কারা দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে চতুর্দিক, দিনগুলি নতুন বাঁকের
স্বপ্নে জলবিদ্যুতের মণিহার, অভিজ্ঞতা অস্থিরতা শুধু
অথবা দুরন্ত ফোঁসে পাঁজররাইফেলে।"

(দ্রাবিড়কেশরে, রক্তের ভিতরে রৌদ্র, গণেশ বসু)

'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' কাব্যগ্রন্থের নাম। প্রকাশ হচ্ছে ১৯৬৯-এ। কিন্তু কেন এরকম নাম! কবি কি জানান দিতে চান নিজের শ্রেণী চেতনা! তিনটি শব্দ, কিন্তু তিনটিই যেন তুর্য বাজাচ্ছে পাশাপাশি বসে। এমনিতে শব্দের নিজস্ব কোনো মানে নেই। ব্যবহারকারীর ইচ্ছেকেই সে প্রকাশ করে। ১৯৪০ এ জন্ম এই কবির। ১৯৬৯ এই বই-য়ের প্রকাশ কাল। ৩০ বছর বয়স। ভরা যৌবন। রক্ত টগবগ করছে। সমাজ পরিবর্তনের ভাষ্য লেখা হচ্ছে সময়ের দেয়ালে। তাঁর চেতনায় তখন হানছে আঘাত। জনতার দুরন্ত সঙ্গীত তিনি আত্মস্থ করতে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছেন হয়ত।

বিষ্ণু দে-র উচ্চারণে যে 'টপ্পা-ঠুংড়ি' প্রাচ্য-প্রতীচ্য দ্বন্দ্ব, তা থেকে শিক্ষিত হয়েছিলেন বা বিষ্ণুভক্ত আমাদের কবি। এই যে জীবনের শেষ দিকে এসে না ঘরকা না ঘাটকা দশা বিষ্ণু দের তা প্রায় ৩০ বছরের অনুজ আমাদের কবিকে হয়ত সচকিত করেছিল। বিষ্ণু দে-র ডিসলোকেটেড ডিসকোর্স পেরিয়ে এসে এই রক্তের ভেতরে রৌদ্রে এসে আমাদের কবি মনোভঙ্গিটিকে নির্দিষ্ট করতে চাইলেন। দোলাচল পরিহার করতে চাইলেন। বনানীকে পরিত্যাগ করলেন না। সম্ভব নয়। কিন্তু বনানীর প্রতি প্রেমকে ছড়িয়ে দিতে নিজের প্রাপ্ত, চর্চিত দর্শনে

আস্থা রাখলেন। আমাদের কবির ভাষাও হয়ে উঠল তীব্র, তীক্ষ্ণ। আরো পথ ও রথের মুখোমুখি বসবার আয়োজন হল। লিখলেন, "পাহাড়তলিতে দীপ্ত ক্রোধ/ হৃদয়ে লক্ষ ফণা/শহরে গঞ্জে রক্তের ডাক/কার বুক সান্ত্বনা/গরবে এবার স্বপ্নের চূড়া উদ্ধত প্রতিরোধ।" (প্রতিরোধ, রক্তের ভিতরে রৌদ্র, গণেশ বসু)।

১৯৭০-এর নতুন বই তো জানান দেয়ার জন্য, আমি লেনিন আর তাঁর নীতি সমর্থন করি। নিজেকে নিজে দেগে দেয়া। আমি সাম্যবাদী কবি, এই আমার পরিচয় হোক। বইয়ের নাম "লেনিন: অধিকার রক্তের কবিতার"।

নিজের কবিতাবোধের সাথে বিশ্বাসের বোধ যুক্ত হয়ে একটাই কবিতা তৈরি হলো। শুধু কি আবেগ উচ্চকিত লিরিকতা নিল! না তা নয় বোধ আর অনুভবের মিশেলে কবিতার ভেতরে ভেতরে গদ্যের নিবিড়তা দিয়ে দেয়া হল, যাতে নিজের বুকের পাটা দেখান যায়। যেন জয়েসের ইউলিসিস আর তা থেকে উৎসারিত এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের বার্তা ঝলমল করে উঠল বাংলা কবিতায়। কমিটমেন্টে ঢুকে পড়লেন আমাদের কবি— "শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসা লেনিন লেনিন।"

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বলার ভেতর দিয়ে বাংলা কবিতায় যে রাজনীতির প্রবেশ তা সম্প্রচারিত হতে হতে অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়েও গতিময় থেকে গেল। সময়ের চিহ্ন বুকে নিয়ে ষাটের এক কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য লিখলেন কবিতা, "একটি শ্লোগানের জন্ম"। সেখানে একটি বাচ্চা ছেলের (তার সৎমাকে) চিৎকার করে বলে ওঠা লাইন 'ভাত দে হারামজাদী' শ্লোগান হয়ে উঠল। এই উচ্চারণে প্রান্তিক মানুষের নিজস্ব এক্তিয়ারের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। আর এই ভাবনাটিই গান্ধীবাদ থেকে বন্দুকের নল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এরকম প্রেক্ষিত ধরেই অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে বলতে হয়েছে, শেক্সপিয়র বা টলস্টয় সামাজিক সত্যগুলিকে অনেক সময়ই সমাজবিজ্ঞানীদের চেয়ে অনেক বেশি পরিস্কারভাবে দেখেছেন আর প্রকাশ করেছেন। যেমন বিবেকানন্দ বললেন, "you talk of your philosophy– that is class philosophy." আমাদের কবি তাঁর নিজের শ্রেণী চেতনার পাঠ ততদিনে নিয়ে ফেলেছেন। আর কবিতাতো কবির নিজের কথা, কবির সময়ের কথা, কবির সমাজের কথাও বা।

"সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে।
সময়! সময়!
ক্রুদ্ধ
ক্রুদ্ধ
ক্রুদ্ধ

ক্রোধের মিছিল
বিবেক ...বিপ্লব
খাড়া ঘাড়ে এই সময় জানতে চায়
আরো কতোকাল আরো কতোকাল ঋণ
শিকলে শিকলে জীবন জানতে চায়
সমুদ্র কই মহামুক্তির দিন?'

(লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার, গণেশ বসু)

দীর্ঘ কবিতা বা মহাকবিতা আমাদের কবির সময়ে বা তার আগে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু পদ্য ও গদ্যের এরকম অনায়াস বয়ন মনে হয় এর আগে বাংলা কবিতা দেখেনি। বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, বিনয় মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র— অনেকে, অনেকেই দীর্ঘ কবিতায় নিজেদের পারঙ্গমতা উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এই কবিতার টেক্সচার এরকম কীভাবে সম্ভব হলো! বিষ্ণু দে চেয়েছিলেন লিরিকতাকে আঘাত করতে, আমাদের কবিও কি কঠোর কঠিন গদ্যে বাংলা কবিতার ভাবালুতার সিনট্যাক্স আক্রমণ করতে চান! তার মানে এই কবিতার কন্টেন্ট-এর জন্য কবির এই ফর্মটি জরুরি হয়েছিল। মানে তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ধার করে বলতে হয়, ততটা 'ফুল খেলবার দিন নয়, ধ্বংসের মুখোমুখি' কবি ও সমাজ। এই যে কবির মনোজগতে লেনিনের ভূমিকা আর তাকে কীভাবে রিক্রিয়েট করতে হবে ভেবে এই গদ্য পদ্যের সরোদ— তবলার যুগলবন্দিতে যে মনোজগতের অবস্থান, যে সেন্সিটিভিটি তাকে একটু আগের কবি উৎপলকুমার বসু চিহ্নিত করেন "ইউ আর থিংকিং ইন টার্মস অফ ফর্ম, নট ইন টার্মস অফ কনটেন্ট।" হাজার লোক লেনিন নিয়ে কবিতা লিখলেও লেখার এই ক্রাফ্‌ট, এই অ্যাপ্রোচ, আমাদের কবিকে আলাদা করে রাখবে।

স্তেফান মালার্মে শুদ্ধ কবিতার সন্ধানে ভাষার অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। কবিতা তো অনুভব, আর ভাষা তার আবরণ। সে এক ইনভিজবল ম্যানের মতো, দেখা যাচ্ছে না তাকে। কিন্তু তার কার্যকলাপ টের পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় বুঝে ফেলেছি কবিতা। কিন্তু বড় একটা না-ও যে সেখানে অপেক্ষা করে থাকতে পারে। মানে 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। এটুকুই। কবিতা সম্পর্কে একটা কোনো সুনির্দিষ্ট বয়ন এখনো উঠে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকে ওই যে বললেন, "কোন মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো— ইচ্ছে করছে চোখে- দেখা, কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই, হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে, সেখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে যাই।"

হ্যাঁ তাই তো! বুকের ভেতর বেজে উঠল মাত্র। সকলেই জানে শব্দের নিজস্ব কোনো রং নেই, মাত্রা নেই, সংকেত নেই। ব্যবহারকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে শব্দ কী মানে বয়ে আনবে। মানে আমারই চেতনার রঙে পান্না সবুজ হবে কি না তা আমি ঠিক করব। আমার ঠিক করার আগে সে টুকরো পাথর, তার কোনো দাম নেই। এখানেই কবির কেরামতি। এমন একটা আন্তঃসম্পর্ক বয়ন করবেন কবি যে চেনা দৃশ্য নতুন হয়ে উঠবে। তাঁতির মতো তাঁর হাতের তাঁতের মাকুটি দিয়ে বলিয়ে নেন, তাঁতের শাড়িটি দেখতে কেমন হবে। কবি যেভাবে দেখবেন, সেভাবেই দেখতে হবে শাড়িটিকে। তাতে চোখের অভ্যাস, মনের অভ্যাস-এ ধাক্কা লাগলে কিচ্ছুটি করার নেই। কবি এই ফাঁদ পাতবেনই। তাঁর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে যেতে হবে পাঠককে। বলা যেতে পারে, এ হল জাদুকরের খেলা রে ভাই, জাদুকরের খেলা।

কেন এই গহন কথার ঘোরে ঢুকে পড়ছি আমরা! পড়ছি এই কারণে, কবির মানসভূমির ভেতর দিয়ে আমরা পরিক্রমারত। বাইরের আবরণের একটা প্রবল আকর্ষণ থাকলেও ভেতরের জগতেও তো উঁকি মারতে সাধ হয়। মানে এই যে নতুন কাব্যগ্রন্থ লিখে ফেললেন ১৯৭১-এ, যার নাম "অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ", যার ভেতরে ছিন্নমূলতার হাহাকার পাখা মেলছে। কিন্তু এতদিন কী করেছেন! সেই তো আট বছর বয়সে দেশ থেকে উৎখাত হয়েছেন। মানে ১৯৪৮। ততদিনে জীবনানন্দ লিখে ফেলেছেন বরিশাল বাংলার পটলচেরা রাত্রির রূপ ১৯৪৬ কবিতায়। কিন্তু আমাদের কবি দেশভাগ, ছিন্নমূলতা নিয়ে তত আতুরতা তো দেখাননি এতদিন। তাহলে কী এমন বিক্রিয়াকারী ঘটনা এসে হাজির হল, সমুদ্র তলের ঢেউ উপরে উঠে এলো ভাসিয়ে নিতে! বেদনায় ভাসিয়ে নিতে!

হ্যাঁ ১৯৭১ এ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর পৃথিবীর মানচিত্রে একটা বাঙালিস্তানের জন্ম হয়েছে। যা স্বাধীন। আমাদের কবির জন্মভূমি বরিশাল তো মনে পড়বেই। হ্যাঁ ১৯৬৯-এ পার্টি ভাগ হয়ে নতুন পার্টি। শ্রেণী ঘৃণায় সশস্ত্র হুঙ্কার— মনোজগতেও বিচ্ছেদ। এই বাংলায় তিনি যে উদ্বাস্তু বা ছিন্নমূল হয়ে কাটাচ্ছেন, তা তো মনে পড়বেই। সেই শান্ত-সুন্দর, ধান-পানের দেশের কথা চোখে ভাসবে। বিশেষত গত প্রায় পাঁচটা বছর ধরে এই নতুন আবাসভূমিতে যেভাবে হন্তারক হাওয়া বিচরণ করছে তা মোটেও সহ্য হচ্ছে না। মানসভূমি উত্তাল হয়েছে। সেটা ১৯৬৭। রাতের গভীরে ছেলেপুলেদের পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা বেপাত্তা। ওই সব প্রেসিডেন্সির মতো মেধাবী ছেলেরা কলে ও কৃষিতে শ্রমিকের কাঁধের জোয়ালের ভাগ নিচ্ছে আর নতুন শ্রেণীহীন সমাজের

স্বপ্ন দেখছে ওই উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির নামাঙ্কিত বিপ্লব। নতুন পার্টি তৈরি হয়ে গেছে। CPIM ভেঙে নতুন দল CPIM(L)। নেতা চারু মজুমদার। বাংলা থেকে এই সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে তখন অন্য রাজ্যেও। প্রশাসনও বসে নেই। নির্মম অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। এক বিপ্লবী জানাচ্ছে, ধোপা যেমন কাপড় কাচে তেমন করে চলেছে পুলিশের ওই শুদ্ধিকরণ অভিযান। দুটো পা-ই ভেঙে দিয়েছে। আমাদের কবির সম সময়ের কবিতাযোদ্ধা মণিভূষণ ভট্টাচার্য যেন চাক্ষুস করেছেন এই সব ঘটনা। তিনি যেন দলিল লিখলেন তাঁর 'দধীচি কবিতায়: "জেল থেকে হঠাৎ খালাশ-পাওয়া ছাত্রকে দেখে জিগেশ করেন—/'কী হে, কবে এলে? তুমি তো প্রেসিডেন্সিতে ছিলে—/পুকুরটায় মাছ ছাড়া হয় নাকি আজকাল?'/সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উত্তর দেয়—/'আর মাছ, নৃপেন্দা, মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিচ্ছে,/ এই দেখুন,'— সে তার ডান হাত এবং বাঁ পায়ের দিকে/দেখায়। তাঁর শাদা ভুরুর নিচে দুটো সুদূর কোটরে/যজ্ঞের অন্তিম আগুন জ্ব'লে ওঠে,—/'ভেবো না, একদিন সবই সুদে-আসলে শোধ হ'য়ে যাবে।"

এরপর ব্যক্তি বা পুলিশ হত্যার কলঙ্ক লেপে দিয়ে একটা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টাও চলেছে আমাদের কবির সামনে। তিনি কীভাবে তাড়িত হবেন, ভেবে উঠছেন। বিশ্বাসে আঁচ এসে লাগছে। আর নতুন বাংলাদেশের জন্ম তাঁকে একটি স্নিগ্ধ ভুবনের আতুরতা দিচ্ছে। তিনি অতীতপ্রিয় হয়ে নিজের ভূমির কাছে আশ্রয় তো চাইবেনই। শান্তি জরুরি। বাইরে ভেতরে এত অধীরতা থেকে একটু মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি যুদ্ধ-ধস্ত ইউরোপের মনকে, বিশেষ করে যেভাবে ইয়েটস-কে ঐ শান্ত স্তোত্রের কাছে আশ্রয় পাওয়ার অভিমুখ এনে দিয়েছিল। আমাদের কবিও সেরকম নিজের ভেতরে উদ্ভাসিত হতে চেয়ে কি লিখলেন নতুন পর্বের ছবি— 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ'!

"পাকানো ঘুঁষির ফণা উঠে আসে, হা হা করে ছুটে আসে
কাপালিক জটার ঢেউয়ে, ওড়ায় ওড়ায় কারা ইলিশরুপোলি
রোদে বালি, ভাঙে পাড়, চুর্ণিত অভ্রের নুন, আনে তুলে
বুকের শূন্যতা কারো কারো খাঁ খাঁ, চাপ চাপ রক্তে কটি সূর্যমূখী
দোলে, ছড়ায় রাস্তায় মাঠে গোলাপের পাপড়িগুলি হৃদয়ের
অনন্ত কুঙ্কুম, তখন, সময় তোমার ঠোঁটে তেতো কষ ঝরে,
চিড় ধরে পায়ের পাতায়, টন টন পেশীর মাদলে ঝম্ ঝম্
শিকলের মুখ। সময় তখন বলো পারো কি নিজের নক্শি
বুনে যেতে তুড়ি মেরে চলন্ত পৃথিবী? গ্র্যানিটে কংক্রিটে
বেঁধে দিতে স্বাধীন নদীর বাঁক, যুবতী বধূর রাঙা ঢল?

আমারো বয়স হলো বাঙলাদেশ, আমের আবিরে স্মৃতি ভাসে
ছোটে গয়নার নাও, পাল ভরে মেঘার্দ হাওয়ায় বেহালার ক্লান্ত সুরে
ঘোলা জলে দোলে মুখ,
প্রতিমার তেল রঙ,
ঢাকির ঘুঙুর
দশমীর
অশ্রুপাত,
ভালোবাসা,
দুঃখে কলকাতা
আমাদের শহরেও উঠে আসে বাঙলাদেশ,
কোন্ বাঙলা তলানি কুড়িয়ে উঠে আসে
দশটা পাঁচটার বাসে ট্রামে চৈতন্য প্রতিমে?"

ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'ইলিউশ্যন এন্ড রিয়ালিটি'-তে বলছেন, কাব্য যে টিকে আছে সেটা একটা আপতিক ঘটনা। মানুষ কথা বলে, প্রাচীন কালের গল্পও বলে, জ্ঞানগর্ভ বচন আওড়ায় এবং সে সব লোপ পেয়ে যায়। কাব্য তার উন্নীত ভাষায় টিকে থাকে এবং সেই কারণে সামাজিক কথাবার্তার অবশিষ্ট অংশ থেকে অত্যন্ত কৃত্রিম একটা পার্থক্য টেনে এনে তাকে আমরা সাহিত্য বলি। যুগ যুগ ধরে কবিতার বহমানতার পেছনে রয়েছে যে কারণ তা হল, মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন বাসনাগুলির পরিবর্তন না করেও কবিতা মানুষের মনকে নতুন এক উদ্দ্যেশ্যের সাথে যুক্ত করে দিতে পারে। এই কাজ সে করে মানুষকে এক অলীক কল্পনার জগতের মধ্যে টেনে এনে। যে জগৎ তার চেনা বাস্তবের থেকে শ্রেষ্ঠতর। কবি লিখবেন "জ্বলন্ত বাঘের চোখ রক্তে তাড়া করে।"

এখানে আদর্শ-আহত এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে ক্রমে। ক্রমে দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ যে জগত উঠে আসতে থাকবে কবিলেখ থেকে তার জন্য তো এতখানি জীবন তিনি ব্যয় করেননি। প্রভাব পড়বে লেখার ভাষায়। স্থির করে উঠতে পারবেন না, কী হবে তাঁর লিখন রীতি। গদ্য-পদ্য অনবরত কোলাহল তুলবে। ১৯৭১ এর পর আবার ১৯৮২-তে বই প্রকাশ হচ্ছে। একটা উত্তাল দশক কেটে গেছে এর ভেতর দিয়ে। নিজের চিন্তার ভেতরও বা ইরোশন ঘটেছে। হয়ত আর সম্ভব নয় প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই। কনজুমারিজম ঢুকে পড়েছে প্রবল বিক্রমে বাংলায়। আর আর্থ-সামাজিক পরিবেশটিকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত। পার্টি বুঝে উঠতে পারছে না। কংগ্রেসের বাইরে বেরিয়ে একক ভাবে বিপ্লব সম্ভব কিনা। না কংগ্রেসকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। যোশি সাহেব আর ডাঙ্গে সাহেব তাঁদের যুক্তিতে অনড়।

"স্পন্দিত বীজের মতো যে চেয়েছিলো মাদল হতে
সে আজ সঙ্গীহীনতায় পশ্চিম আকাশে ঢলে-পড়া চিতার দাউ দাউ,
অঙ্গারের মতো যে চেয়েছিলো বিদ্যুতের গান গাইতে
বাতিল ঘোড়ার মতো তার অঙ্গে আজ অবহেলার দ্যুতি,"
(বাঘের থাবার নিচে, গণেশ বসু)

সুরের আবর্তন যেন কেটে কেটে যাচ্ছে। এই গ্রন্থে কোথাও ছড়ার ছন্দ এসে মাথা তুলছে কোথাও ক্রোধের দ্যুতিতে অক্ষরবৃত্ত ফোটে, "অহর্নিশ/জ্বলন্ত বাঘের চোখ রক্তে তাড়া করে।" (মুখ, বাঘের থাবার নিচে, গণেশ বসু)। কেন লিখবেন এই হতাশা! কে/কি এই বাঘ? আত্মদীপক এক চেতনার গরাদভাঙার আয়োজন যেন। "একদিন,/আশ্চর্য, একদিন/সেই আবেগ/সেই চিত্রকল্প/শিমুলফুলের মতো খুলে ধরা সেই বুনো অঙ্গার/আমার বুকে দেখল অভ্রের মতো ঠান্ডা মরুভূমির রাত,/শিরায় দেখল আগাছার মতো ভাসমান মাকড়শার হাত-পা/ আমার চোখে দেখল ছন্নছাড়া ভুবন।" (সে, বাঘের থাবার নিচে, গণেশ বসু)।

একজন ক্রিয়েটিভ ইন্ডিভিড্যুয়ালের এই হচ্ছে ক্রাইসিস। সমষ্টির চেতনার ভেতর নির্বিরোধে নিজের চেতনাকে হারিয়ে দিতে যেতে পারেন না। আমাদের কবি জানেন, বিষ্ণু দে পারেননি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পথচ্যুত হচ্ছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আঙুল তুলছেন। তাঁর অবস্থানটির সাথে সবচে বেশি মিল দেখা যায় অন্য জগতের এক ব্যক্তিত্ব। তিনি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক। পি সি যোশি তাঁকে পাঠিয়েছেন রাজশাহী থেকে কলকাতায়। 'ইন্ডিয়ান ওয়ে' নামে পত্রিকার বাংলা চ্যাপটারের দায়িত্ব নিয়ে। সেটা ১৯৫১। কিন্তু ঋত্বিকের চোখের উপর থেকে ক্রমে ফিকে হয়ে গেল মার্কসিজম যোশি আর রণদিভের মারামারিতে। ১৯৫৩-তে ছেড়েছুড়ে দিলেন সব। আর তাঁর ভেতর ঘরে থাকা ইন্ডিভিড্যুয়ালিজম ক্রমে মাথার উপরে উঠে এল। শিল্পে আপোষ করলেন না। দ্বন্দ্ব সইতে না পেরে বেশি বেশি পানাশক্ত। বলতে শুরু করলেন, শ্রেণী সমাজে রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে হয়, কিন্তু তাঁর মানে নয় 'শ্লোগান-মাঙ্গারিং'। ফলে ঋত্বিকের ফিল্মে অনেক মার্কসবাদীর মাথা ঘুরিয়ে মানুষের মনের গভীর থেকে উত্থিত সংলাপ পাহাড়ের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে মূল সিস্টেমের মুখোমুখি হাহাকার বাজিয়ে দিল— "দাদা, আমি বাঁচতে চাই।" আমাদের কবিও যে এরকম এক বিদ্ধস্ত চেতনাবৃত্তে বসে লিখে উঠলেন জবানবন্দি। কবিতার নাম "স্বপ্নভূমি"। দীর্ঘ কবিতা। কিন্তু এখান থেকেই যেন শুরু হলো তাঁর নতুন পথচলা। কবিতাকে, নিজেকে শিল্পের স্বাধীনতা দিয়ে দেখা। যেখানে তিনি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন আস্তে-আস্তে একটা মরালিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। সোসাইটি ভাঙছে। ভেঙে নতুন হচ্ছে।

আর এই সব স্খলন যেন নিতে পারছেন না। "ঝিঙেফুলের মতো উছলে উঠেছিল যে তেভাগা/কুন্দফুলের মতো উছলে উঠেছিল সাঁওতালের বাহু,/শস্য তুলতে তুলতে যারা গান গাইত/ শস্য বুনতে বুনতে যারা গান গাইত/আমি ছিলাম/আমি ছিলাম তাদের একজন/আকাশের ভিতরে আকাশ।" (স্বপ্নভূমি, বাঘের থাবার নিচে, গণেশ বসু)।

এই ১৯৮২-র পরে আমাদের কবির মনোভঙ্গিতে যে ইন্ডিভিড্যুয়ালিজম গোপনে ছিল, তা যেন কন্টিন্যুয়াসলি প্রবহমানতা পেল। তিনি যে বামপন্থা, তার ইউটোপিয়ান বোধির জায়গাটা ভুলে গেলেন, তা নয়। ইউটোপিয়ার ভাবনায় যে সব মানুষের ভালো করার লক্ষ্য তা তো মার্কসিজমের প্রথম ধাপ। তা থেকে উন্নীত হতে হতে হতে সর্বহারার সমাজবাদে প্রবেশ। কবি ভেতরে ভেতরে থাকলেন বামপন্থী, কিন্তু প্রত্যক্ষতা যেন বর্জিত হলো। অনুভব ও দর্শন যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর নবীনতর উপাদান তৈরি করে, তা একে একে লেখা হতে থাকল পরবর্তী পর্যায়ের কবিতার বইগুলির ভেতর। প্রকাশ পেল ১৯৯৯-তে "নীরব সন্ত্রাস"। এই সন্ত্রাস কবির মননের ভেতর নীরবে ঢুকে পড়েছিল। দান ফেললেন এবার অন্ত্যমিলের ছন্দে। দুলুনি দিয়ে হলেও কিছুটা ভুলিয়ে রাখতে হবে মনের জ্বলন। "তুমিই দেখি জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে করো খাক/পাঁজর-কাঁপা সুখের দিন ধু ধু/বাঁকানো ছোরা চালিয়ে দাও, গুঁড়িয়ে করো ধুলো/ তুষের মতো ঈর্ষা জ্বলে শুধু।" (ট্রাজেডি, নীরব সন্ত্রাস, গণেশ বসু)।

ট্রাজেডি এই, কবিকে মানতে হচ্ছে কবিতা আর কবিজীবনের সীমাবদ্ধতা। বাজার অর্থনীতির ধাক্কায় ক্রমে দেশে ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণা মুছে যাচ্ছে। কবি কী করতে পারেন! বাহুল্যহীন নিখুঁত বাক্যনির্মাণের দিকে সরে গেলেন কবি। সময়ের সংকটকে ধ্বনি তরঙ্গে একইভাবে গেঁথে এক আচ্ছন্নতা দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে। " আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়াননে/ আমরা খুঁজিনি মর্ত্য রূপের ঐশী সীমা;/ইথাকার কভু কলাকৌশলে কিনি না নাম/তবু কেন মরি ঘরে ব'সে লোভী ট্রয়ের রণে/রাজারাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম/পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বীমা।" (কাসন্দ্রা) কেন ঘুরে ফিরে বিষ্ণু দে-র কথা উঠছে, তা আমাদের কবি-ই বলুন: "কয়েক বছর আগেই যদি বাতাস হয়ে যান/রাতবিরেতে শিকড় তবু নাড়িয়ে দেন কে/ঘুম আসে না, আড্ডা জোড়েন চিন্তা চেতনায়/মধ্যবুকে কবির কবি আছেন বিষ্ণু দে।" (ঘুরে ফিরে বিষ্ণু দে, বল্‌গা হরিণের সিং, গণেশ বসু) হ্যাঁ মাত্রাবৃত্তে সাজানো কথার এই ঝোঁক রোমান্টিসিজমের ঝোঁকও। আর ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিকের পথে আমাদের কবির লেখা ধাবিত হলো না। তিনি, বিষ্ণু দের ঘোরতর ভক্ত। একের পর এক

তথাকথিত কমিটমেন্টহীন শিল্প ফেলতে লাগলেন, কিন্তু আবার অন্তরে নন-কমিটেড নন। কবি শিল্পের পক্ষে গেলেন। মানস বলাকার মুক্তির পথে। হয়ত সংশয়বাদী তখন। বা বলা যাবে 'ভ্যালু সিস্টেম থেকে চ্যুত না হয়ে কান্টের 'মেটাফিজিক অব্ মরাল' সঙ্গে রইল। মানে গোটা গোটা মানবতা। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকদের 'ইন্টেলেকচুয়াল সলিপসিজম' পরিত্যাগ করে 'কোর অব্ মরালিটিতে' ঢুকে পড়লেন। এই দ্বিধা থরথর যাপনপর্বে এক এক করে মুক্তি পেতে লাগল কবিতার বই। ২০০৫-এ 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'। ২০০৮-এ 'ভাসানদরিয়া'। ২০১৩ তে 'বর্ণময় পৃথিবী'। ২০১৫-তে 'বল্‌গা হরিণের সিং'।

পল ক্লে পেইন্টিং প্রসঙ্গে বলছিলেন, "It is a method of transforming quantity into quality." এই কোয়ান্টিটি তো আমরা বুঝলাম, আমাদের চারিদিকের জীবনপ্রবাহ, যাকে আপাত সত্যি বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোয়ালিটি? কবি, তিনি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ-র ভেতর বসে থেকে, ওই বস্তু পুঞ্জকে রূপান্তরিত করতে থাকেন। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একসময় বলেছিলেন, জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতেও কবিতা কবির ভেতরে রং-তুলির খেলা খেলতে থাকে। অনুভব মথিত ওই রং-তুলিই হলো কোয়ালিটি। আমাদের আজকের কবি সেই কোয়ালিটি দেখাতে দেখাতে ক্রমে নিঃস্ব হয়ে যান। ক্রমে ভাবনা অসীমে বিলীন:

"হাঁটি
হেঁটে যাচ্ছি
বাবার সঙ্গেই আমি হেঁটে যাচ্ছি
হেঁটে যাচ্ছি
যা...ই
দুধারে নারকেল গাছ, বাবুইপাখির বাসা, তাল আর সুপারির চূড়া
ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে পাখির পালক
বাবার ভিতরে ছিল আলো
কখনো আবার তিনি মেঘের ভিতরে
উড়ে যান
উ...ড়ে যান
উড়ে...যা...ন ঘুড়ির মতন... "
(বাবাকেই দেখি, বল্ গা হরিণের সিং, গণেশ বসু)।

গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার

মৃদুল দত্ত রায়

"বাইরে লড়াই
গর্জন এখন বাড়তে বাড়তে শেল তীব্র
সজোরে ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে উঠবে
তোমার জানলা
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে সমস্ত প্রাচীর।
কারণ, সময় এখন
বদলায় নিজেকে।"

— বব ডিলন/'সময় বদলায় নিজেকে' (অনুবাদ : রাম বসু)

বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক যাপনে ষাটের দশক এই বদলানোর সময়। এই বদল কেবল অংশকালীন নয়; তা ক্রম পরিবর্তনশীল। আর তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই দশক ইতিহাস-বোধের এক ক্রম বদলের অভিজ্ঞানকে বুকে ধরে রেখেছে। একদিকে রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে, অন্যদিকে দিন বদলের নতুন স্বপ্নেরা একটু একটু করে দানা বাঁধছে। সাহিত্যের পথ নিয়েও হাজারো প্রশ্ন। হাংরি-শ্রুতিধ্বংসকালীন-প্রকল্পনা বাংলা কবিতাকে নতুন নতুন পথের ঠিকানা দিচ্ছে। এসব কিছুকে পাথেয় করেই ষাটের দশক হয়ে উঠেছে এক খরস্রোতা নদী। আর সেই নদীতে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে গণেশ বসুকে আমরা বলতে শুনি—

"আমার চারদিকে এখন মরা ডালের ছায়া
হলুদ পাতার মতো ইতিহাসের ক্লান্ত করুণ মুখ
ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতোই আমার স্বপ্নমদির স্বদেশ
শ্যামাঘাসের দানাও যেখানে সোনার চেয়ে দামী
ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতোই স্বদেশভূমির গণতন্ত্র
আর কাঁকড়ার ডিমের মতো চাঁদ যেন উপনিবেশিক টিকটিকি।"

সময়ের নিবিড় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে যায় গণেশ বসুর কবিতা। ব্যক্তিক অনুভবের সিঁড়ি ডিঙিয়ে তাঁর কবিতা বারবার ছুঁতে চায় সময়ের তীরবিদ্ধ

যন্ত্রণাকে— সে ষাটের দশকে হোক, কিংবা সমকালে। আর তাই মরা কুকুরের রক্তমাখা লালা ছড়ানো তোবড়ানো চোয়ালের মতো সমকালের বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি উচ্চারণ করতে পারেন—

"মিডিয়া শাসন করে, প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে রাজার আস্তিনে
চমৎকার দেয়া নেয়া, রাজা ও মিডিয়া শোয় একই কফিনে।"
(অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

এভাবেই তিনি জেগে থাকেন; জাগিয়ে রাখেন পাঠককে। চোখ খুলে আলোর স্বেচ্ছাচারী সান্ত্বনায় যারা ঘুমিয়ে থাকেন, গণেশ বসুর কবিতা তাদের চোখে বাস্তবের নিপাট যন্ত্রণার ক্যানভাস তুলে ধরে।

গণেশ বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'। প্রকাশ কাল ১৯৬৪। এই বইয়ের কবিতাগুলিকে কবি নামকরণের শৃঙ্খলে বাঁধতে চাননি। কাব্যগ্রন্থের সাঁইত্রিশটি কবিতার শিরোনাম-হীনতা কোথায় যেন এদের একটি অন্তলীন সুর-প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়েছে। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-র প্রতিটি কবিতায় ব্যক্তিকবির প্রেমভাবনার চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। কবি তাঁর সমকাল, সামাজিক আলোড়ন— সবকিছু থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে কেবল প্রেমের সাগরে যেন নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইছেন। ষাটের রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-মুখরতার মধ্যে কবির আশ্রয়হীনতা একটা বড়ো সত্যি হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলিতে। সংকলনের প্রথম কবিতায় কবি বলেছেন

"... সব কিছু বড়ো স্মৃতিময়
মনে হয় শূন্যময়, তুমিহীন কাটে না সময়।"

—এই রোমান্টিকতা গণেশ বসু মজ্জাগত। কোটি মন্বন্তরেও তা এতটুকু মলিন হয় না। তাঁর এই সংরাগ প্রকারান্তরে আত্মসচেতনতার একটা মৌলিক অর্জন হয়ে উঠেছে। —"বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'র রোমান্টিক গণেশ বসু ক্রমশ নিষ্ঠুর বাস্তবে নেমে এসে মিছিলে ও সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু রোমান্টিক ভিত্তি তাঁর এখনও অটুট। গভীরতাকে তিনি অর্জন করে নিতে চাইছেন। প্রেমের কবিতাগুলোয় বস্তুতই তিনি আন্তরিক, কবিতার রীতি এবং বক্তব্যের মধ্যে থেকে তিনি যে মোটামুটি আত্মসচেতন, তা বুঝতে পারা যায়।"

—('এ কালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল'/সত্য গুহ)

কাজেই 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' পড়তে পড়তে বারবার মনে হয— বাঙালির গতে-বাঁধা প্রেম-সাধনা ষাটের উত্তাল ডামাডোলের মাঝখানেও ডানা মেলে দেওয়ার সাহস দেখায়। ঈজম-এর ধরা-বাঁধা মূল্যবোধকে পেরিয়ে কবি নেহাৎ না হয় নিজের প্রেমের সামনে নতজানু হল— তাতে কী বা মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার

আছে! তবে এখানকার কবিতাগুলো কবির যে জীবন-সংরাগকে ফুটিয়ে তুলেছে, সেখান থেকেই যেন পরবর্তী পর্বের সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক কবিতাগুলোর সূত্রপাত। জীবন সম্পর্কে একটা সংরাগ থাকলেই কেউ উচ্চারণ করতে পারে—

"আগ্নেয়গিরির গর্ভে তুমি শান্ত দোল পূর্ণিমার
নিবিড় আলপনা হয়ে বেঁচে আছো, বেঁচে আছি আমি
ছিন্নভিন্ন সভ্যতার ছায়া হয়ে।" (তেইশ সংখ্যক কবিতা)

ব্যক্তিপ্রেম, বিষাদ এবং একপ্রকার বিচ্ছিন্নতাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলা 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এর কবিতাগুলোতে স্মৃতি একটি অপরিহার্য সত্য হয়ে উঠেছে। স্মৃতির তর্পনেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে কবির প্রেমভাবনা। কবি একস্থানে বলছেন—

"তোমারে স্মরিয়া জেগে রয় আজো তৃষিত নয়ন
যতই করো না ঘৃণা আর অবহেলা
কী বা আসে যায় যদিবা সহিতে হয় আমরণ
মহানির্জনে কেটে যায় সারা বেলা।" (নয় সংখ্যক কবিতা)

কবির প্রেমভাবনা রক্তমাংসের জান্তব যাপনের একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়ে একটি শাশ্বত সুন্দরের কাছে নতজানু। কবির মনন এক্ষেত্রে চেতনার বদ্ধ জানালায় টোকা দিয়ে যায়। আজকের পুঁজিবাদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিক্ষেপকালে ভালোবাসার শরীর থেকে, সম্পর্কের শরীর থেকে সুন্দরের পলেস্তারা ঝরে পড়েছে। প্রতিটি মানুষ ভালোবাসা বলতে বোঝে অধিকারকে, কর্তৃত্বকে। আজকের মানুষ তাই অভিমান বোঝে না, কেবল কানের পর্দায় টের পায় কারও সুতীব্র অভিযোগ। গণেশ বসুর প্রেমভাবনার সঙ্গে শিল্পবোধের সার্থক সম্মেলন ঘটেছে। তাঁর প্রেম তাই বস্তু-ভাবনার সংকীর্ণ একরৈখিক আবর্ত থেকে মুক্ত। ভালোবাসতে পারাটাও যে আসলে একটা নিপুণ শিল্প— তা তিনি বারবার জানান দিয়ে যান :

"অনিন্দ্য শিল্পের খোঁজ যদি পাই এইখানে বলিব তাহারে
কিছুই চাহি না আমি, চাহি শুধু ভালোবাসা, বনানী তোমারে।"

কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি খণ্ড-কবিতায় কবির জীবন-সংরাগের স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটেছে। বনানী তাঁর ব্যক্তিক পরিচয়ের সীমানা আতিক্রম করে হয়ে উঠেছে অখণ্ড প্রকৃতির প্রতীক, আবার কখনো সে শুধু নারী, কবির জীবনদেবতা হয়ে কবিকে বাঁচার গান শুনিয়ে যায়। কবি তাঁর ব্যক্তিগত স্বমেহনের কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চান বনানীর হাত ধরে। কবির কলমে তাই ফুটে ওঠে—

"ভয় হয়। বড়ো বেশি ভয় হয়, যদি ছেড়ে যাও

ফেলে রেখে এ সময় অনিশ্চিত বোবা পৃথিবীতে,
বরং জ্বলিয়া ওঠো, জ্বলে ওঠো, মশালে জ্বালাও
প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে কোষে কোষে শ্রুতিতে শ্রুতিতে
তোমার সৃষ্টির বীজ, জেগে ওঠো, আমাকে জাগাও,
বনানী বাঁচাও তুমি দুর্নিবার মাধবী সংগীতে।"

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' শিল্প-বিচারের মানদণ্ডে অভিনব বিরাট কোনো ব্যতিক্রমের শরিক হতে পারেনি। বাংলা প্রেমের কবিতার পরিচিত বর্ণমালা বিচিত্র বৈভবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মাত্র। আসলে এই সংকলনটিকে আমরা কবির প্রস্তুতিকালীন অনুশীলনের প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। পৃথক ভাবে অনেক কবিতা বাংলা সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশের সার্থক দলিল হয়ে উঠেছে— এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। বাণীর দিক থেকে তা গভীর থেকে গভীরে পাঠক মনকে ছুঁয়ে যায়। তবু আলাদা করে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' সময়ের বিচারে বিরাট কিছু হয়ে উঠতে পারেনি।

গণেশ বসুর পরিণত সময়ের কবিতাগুলোতে আঙ্গিক এবং শব্দ ব্যবহারের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নজরে আসে, সে দিকটি অবশ্য 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এ অল্পবিস্তর উঁকি দিয়ে গিয়েছে। জীবনানন্দীয় ঘরানার কবি সাধু ও চলিত কথ্যপ্রবাহকে এক সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন :

"জাহাজ তোমার কোন্ বন্দরে ভিড়িবে?
কোন উপকূলে? বনানী নিবিড়ে বলো তো?
বেপথু বাতাসে কেবলই কি পাল ছিঁড়িবে?
হৃদয়ে রহিবে সংশয় শুধু সতত?
রমণীয় তটরেখা নাহি যদি মিলিবে
বিষাদ সজল শ্রাবণ হবে না আগত?"

আবার কাব্যসংকলনটির অন্তিম কবিতায় কবি লিখছেন—

'বাস্তুচ্যুত হতে ফের ভুলেও চাহি না আমি, চাই
দীপাবলি হয়ে ওঠো, আমৃত্যু তোমারই গান গাই।"

'ভিড়িবে', 'ছিঁড়িবে', 'মিলিবে' প্রভৃতি সাধু বিলম্বিত শাব্দিক উচ্চারণের পাশাপাশি 'বলোতো', 'হবে না' প্রভৃতি চলিত শব্দের ব্যবহার কবিতার প্রবাহ বেগে উত্থান-পতনের নির্মাণ করেছে। একই পথে 'চাহি' এবং 'চাই' শব্দের পর পর ব্যবহারে এক অব্যক্ত নৈঃশব্দ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কবি।

আবার বেশ কয়েকটি কবিতায় ভাবনার প্রবাহকে শব্দের শারীরিক সঞ্চালনায় পাঠকের চোখের সামনে হাজির করেছেন কবি। সংকলনের দ্বিতীয় কবিতাটিতে

গতানুগতিক ব্যর্থতার একঘেয়েমিকে প্রকাশ করতে চেয়ে কবি বলছেন—

"এখন কি হাহাকার? সারা দিন ব্যর্থ যায়, যায় যায় যায়।
তবু স্মৃতি হয়ে যাবে, অধরাই থেকে যাবে অলীক সুন্দর ?"

'যায়' শব্দটির বহুল ব্যবহার পাঠককে এক অন্তহীন যন্ত্রণাদগ্ধ সময়ের নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-তে প্রকৃতির ব্যবহারে জীবনানন্দের অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। পল্লীবাংলার টুকরো টুকরো প্রাকৃতিক উপকরণ কবিতাগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে জীবনানন্দের মতোই গণেশ বসুও অতি তুচ্ছ প্রাকৃতিক উপকরণগুলোকে নির্বাচন করেছেন। সুন্দর হিসেবে তা প্রান্তিকতার ধারণাকেই স্পষ্ট করে তোলে ৩৪ সংখ্যক কবিতায়—

"জলজ গুল্মের ঘ্রাণ নিয়ে জেগে থাকো, জাগো, জাগো।
নিশিন্দা পাতার চোখ পাকা কামরাঙার শরীর.."

৩৬ সংখ্যক কবিতায়—

"এখনো তোমার চোখে কাশফুল রয়েছে অক্ষয়।
শিরা উপশিরা ছিঁড়ে চাই চাই তোমার আশ্রয়।"

আবার, ৩৭ সংখ্যক কবিতায় কবি লেখেন—

"প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকা অলক্ষ্যে শেখায়
ভালোবাসা। যুদ্ধের ভিতরে নয়, সীমানা পেরোনো
প্রভুত্ব বিস্তারও নয় ভালোবাসা, দিগন্তরেখায়
ফোটায় আকন্দ ভাঁট অতসী অপরাজিতা কোনো।"

আপাত 'অন্ত্যজ', আপাত ব্রাত্য এই 'নিশিন্দা পাতা', 'কামরাঙা', 'জলজ গুল্ম', 'কাশফুল', 'আকন্দ', 'ভাট', 'অতসী', 'অপরাজিতা' নাগরিকতার বাইরে এভাবেই এক উন্মুক্ত মাটির পৃথিবীকে টেনে নামিয়েছে 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এর অক্ষরে অক্ষরে, রক্ত-মজ্জা-শিরা-উপশিরায়। বনানী' শব্দটি যে অনাবিল প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে বহন করে আনে, এই সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ লতা-গুল্ম-পুষ্পের সমারোহ তা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের 'বনলতা'-র মতোই এই 'বনানী' বারবার কবির নিদারুণ আশ্রয় বাসনাকে পূর্ণতার দিশারী করে তুলেছে।

গণেশ বসুর দ্বিতীয় কবিতা সংকলন 'নিজের মুখোমুখি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' থেকে প্রকাশকালগত দূরত্ব মাত্র তিন বছর; অথচ এই সংকলনের পঁয়ত্রিশটি কবিতা বাংলা কবিতার পৃথিবীতে একজন নতুন কবির স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরল। প্রথম কাব্যগ্রন্থে পাঠক কবিকে চারপাশের ভিড় থেকে আলাদা করে চিনতে পারেনি, অথচ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই

কবি এক আশ্চর্য সমুন্নতির স্বাক্ষর রাখলেন। ব'লে না দিলে পাঠক আন্দাজ করতে পারবে না— এই দুটি সংকলনের কবি আসলে একই মানুষ।

ব্যক্তিগত রোমান্টিক চাওয়া-পাওয়াকে অনেকটা সংযত করে কবি এই সংকলনে নজর দিলেন এক প্রবহমান জীবনের অলিন্দে। ব্যক্তির পাশাপাশি তাই উঠে এল সমষ্টি। নিজের জীবনের দর্পণে কবি বহুকে প্রত্যক্ষ করলেন। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা ও জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে অস্থির হয়ে উঠল কবিতা। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এ কথার পাহাড়কে ভিজিয়ে দিয়েছিল তান প্রধান ছন্দের সুরেলা নদী। 'নিজের মুখোমুখি'-তে সেখানে গর্জে উঠল গদ্য ছন্দের নিয়মহীন যেমন-খুশি গতি। কবিতার শরীর থেকে অন্তমিলের প্রযত্ন মুছে গেল।

'নিজের মুখোমুখি'র প্রথম কবিতা 'সোনালি গির্জার মোরগ চূড়া'। জার্মানীর গ্রিম ভাইদের সংকলিত 'The Complete Fairy Tales'-এর The Ball of Crystal'-এর সোনালী সূর্যের দুর্গচূড়ার মিথ এই কবিতাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। কবি লিখছেন—

'সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায় আর পৌছনো গেল না
পৌছনো যাবে না বুঝি কোনোদিন
এখানে কেবল
রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে
সংখ্যাহীন মানুষের রক্তের ওপর দিয়ে
সংখ্যাহীন যুবতীর আকাঙ্ক্ষা মাড়িয়ে।
বুনো গোলাপের স্বপ্নে বিমোহিত যুবকের বুকের ওপর দিয়ে
অন্ধকার সেতুর ওপারে।"

আসলে পৃথিবীর প্রবল প্রবলতর অসুখ এখন। যে রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন— 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', তিনিও জীবনের সায়াহ্নে এসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন গভীর গভীরতম অসুখকে। মানুষের হাতে সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্বংস ভ্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে এলিয়টিয় পোড়ো জমির ধারণা সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক নির্মাণকে প্রভাবিত করে চলেছে। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েও কোনো কাল্পনিক আশাবাদ গণেশ বসুর চেতনায় বিশ্বাসের শীতল প্রলেপ দিতে পারেনি। দিনগুলো সত্যিই সংকটের বর্ণমালা উগরে দিচ্ছিল। তার ভেতর দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন এক চরম সত্যকে। মানুষের জীবন থেকে আলো হারিয়ে গিয়েছে, সত্য হারিয়েছে, শাশ্বত সুন্দর হারিয়েছে। মানুষ আর কোনোদিনই নির্মল প্রাণে আলোকিত হয়ে পরম সুন্দরকে ছুঁতে পারবে না, তাই কবির আক্ষেপ সমগ্র

মানবজাতির পরিপ্রেক্ষিতে মূর্ত হয়ে ওঠে—

'সোনালি গির্জার সেই মোরগ চুড়ায় আর পৌছনো গেল না
সোনালি গির্জার সেই মোরগ চূড়ায় কেউ পৌছতে পারে না?

পাশাপাশি 'স্বপ্ন' কবিতায় কবির ব্যক্তিহৃদয় গণহৃদয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে এক নতুন সূচনার। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই কবিকে দিন বদলের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু কবি সংশয়ী।

"মাঝে মাঝে আমিও লাল পাহাড়ের স্বপ্ন দেখি, যেখানে
উষ্ণতা প্রবহমান নদীর মতো, যেখানে
বুকের অন্ধকার পল্লবিত কৃষ্ণচূড়ার নেশায়।
যেখানে গোলাপের উজ্জ্বলতা
হাজার মানুষের রক্তে ভেসে যাওয়া সন্ধ্যেবেলার আকাশ
আমাকে তোলপাড় করে। আমার
বাহুতে আরেক পৃথিবীর স্বপ্ন।"

জীবনানন্দ দাশ চারপাশে অনুভব করেছিলেন এক অদ্ভুত আঁধারকে। এ আঁধার জীবনকে দিন শেষে চুপি চুপি আশ্রয়ে বিলীন হতে ডাকে না, চেতনার গভীর ক্ষয়কে কেবল প্রলম্বিত করে। আর ষাটের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ডামাডোলের ভিতর কবি গণেশ বসু অনিঃশেষ যাপন-যন্ত্রণাকে বড়ো বেশি নগ্নভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। পুঁজিবাদী শোষণের জাল প্রতিটি মানুষেকে ক্রমাগত বধ করে চলেছে। আমরা দিন দিন বাঁধা পড়ে যাচ্ছি এক অনন্ত ক্ষয়ের চক্রব্যূহে—

"আমরা সবাই
একালের অভিমন্যু, তাই
দীনতা ব্যর্থতা ঘৃণা অবিশ্বাস ঘোরে নিরন্তর' (চব্বিশ হলো না শুরু)

আর তাই—

"এখন এখানে নেই আর
উজ্জীবন মন্ত্র কোনো, কালের দু'চোখে তাই অনন্ত আঁধার।"

সমসাময়িক খাদ্য-আন্দোলন এবং প্রশাসনের কদর্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুবসমাজের ক্ষোভ কবিকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই বিপর্যয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি কান পেতে জীবনের এক উত্তাল তরঙ্গকে শুনেছিলেন। সমকালীন অপরাপর গণজীবনের কবিদের মতো সংগ্রামী আশাবাদ কবিকে ছুঁয়ে যায়নি। জীবনের যন্ত্রণা, রাগ, বিদ্রোহের দোদুল্যমানতাকে তিনি শব্দের বন্ধনে বেঁধেছেন। সমকালের ক্ষোভ ও ফেনিয়ে ওঠা ক্রোধকে তিনি সমুদ্র-মহিষের

রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন—

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরফোলা সমুদ্র মহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।" (সমুদ্রমহিষ)

পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠানিক বশ্যতার ঐতিহ্য কবিকে যন্ত্রণায় কাতর করে তোলে। কবি বিদ্রোহে উচ্চকিত হন না কিন্তু অন্তরে এক তীব্র রক্তক্ষরণ চেপে রাখেন। স্লোগানমুখর হয়ে তিনি জনজাগরণের পথে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু কবিতায় কোনো উচ্চকিত চীৎকার বেড়ে ওঠেনি। বরং তিনি তুলে ধরছিলেন এক ভ্রষ্ট সময়ের নিদারুণ ইতিহাসকে—

"এখন নিজেকে বড়ো অপরাধ, ছত্রী সেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
সব চেনা মুখে তাই ধ্বংসের থাবার
ছুটে চলে..." (সমুদ্রমহিষ)

'নিজের মুখোমুখি'-তে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমির পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রেমের প্রকাশপথটি একেবারে ব্রাত্য হয়ে যায়নি। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এর কবিতাগুলির তুলনায় এখানকার প্রেমের কবিতাগুলো অনেক বেশি গভীর। অবশ্য বেশ কয়েকটি জায়গায় আগের প্রকাশ ধারার ছাপ অল্পবিস্তর থেকে গিয়েছে। যেমন—

"তোমার যৌবনে আজ ফিরে যাবে কল্যাণী আমার,
তারপরে দুঃখ নাই নেমে এলে ঘন অন্ধকার।
কোন্ দুঃখ প্রাত্যহিকতায়?
সকালের পুষ্প ঝরে বনতলে বিষন্ন সন্ধ্যায়।" (বৃদ্ধের ডায়েরি থেকে)

কিন্তু পাশাপাশি কবি ব্যক্তিপ্রেম এবং স্বদেশ ভাবনাকে এক সুরে বেঁধে ফেলেছেন। আসলে ভালোবাসাও তো একটা বড়ো যুদ্ধ। কবি বেঁচে থাকার যুদ্ধ-হাতে ছুঁয়ে যান তার ভালোবাসাকে। ফলে এ ধরণের কবিতাগুলো সংকীর্ণ ব্যক্তি-কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ভেসে গিয়েছে এক অসীম ব্যপ্তিতে। বিশেষ থেকে হয়ে উঠেছে নির্বিশেষ—

"এখন আমার দৃষ্টিতে তুমি অনুপস্থিত, তোমার ভালোবাসা—
কঠিন অস্তিত্ব
অনুপস্থিত, যেন

হারানো স্বদেশ।" (আমার দৃষ্টিতে)

এভাবেই গণেশ বসু কবিতার হাত ধরে ধীরে ধীরে গণহৃদয়ের কাছে পৌছানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। নিপাট ব্যক্তিপ্রেমের সংকীর্ণতা থেকে যাত্রা শুরু করে সামষ্টিক চেতনার গন্তব্যে কবির এই যাত্রাপথ কিন্তু কখনোই একরৈখিক নয়। জীবনানন্দ যে কালচেতনার কথা বলে গিয়েছিলেন, তা গণেশ বসুর কবিতাকে একটি বিশেষ মর্জি দিয়েছে। কবি কোনো কিছুকেই চরম বলে মেনে নেননি। সামাজিক পটভূমির পরিবর্তনের চিহ্ন তাঁর কবিতার শব্দে শব্দে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের কথা বলতে গিয়ে, মানুষের যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার তুলে আনেন মানুষের সম্পর্ককে। আর এদিক থেকেই রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাসের থেকে এক অন্যতর গণজীবনের আখ্যান খুঁজে পাওয়া যায় গণেশ বসুর কবিতায়। 'নিজের মুখোমুখি'র পর সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর ধরে একে একে প্রকাশিত হয় রক্তের ভিতরে রৌদ্র' (১৯৬৯), 'অধিকার রক্তের কবিতার' (১৯৭০), 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' (১৯৭১), বাঘের থাবার নীচে' (১৯৮২), 'নীরব সন্ত্রাস" (১৯৯৯), "অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' (২০০৫) এবং 'ভাসানদরিয়া' (২০০৮)। পরবর্তী এই প্রতিটি সংকলনে ভাষা-ছন্দ এবং ভাবের রসায়ন নিয়ে কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস নজরে আসে। দীর্ঘ প্রায় অর্ধশতাব্দীর পথ চলায় কবি কখনও নির্দিষ্টতায় থেমে থাকেননি। পারম্পর্য-ক্রমে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ কবির পথ পরিবর্তনের শরিক হয়ে থেকেছে।

'রক্তের ভিতর রৌদ্র' সংকলনটি কবির একটি ব্যতিক্রমী মেজাজকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। কবির প্রকাশ এক্ষেত্রে যথেষ্ট উচ্চকিত। একটি অদ্ভুত রেশ হৃৎপিণ্ডের তাল-দামামার মতো চারদিকে ছিটকে পড়ছে। মৃদু অথচ বলিষ্ঠ এক শ্লোগান কবি প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত হয়েছে। গণবাদী আহ্বানের সুর শোনা যায় 'সময়' কবিতাটিতে—

"এখন যদি সুযোগ এলো
অভিশাপের ফাটল ধরা।
অশ্রুজমা অন্ধ পাঁচিল
বদলে ফেলো
এবং ঘৃণাব্লাডার ক্রোধে
মেকং বোনের স্নায়ুর টানে
নখের ফলা বন্দুকেরও।"

বলা বাহুল্য, ছন্দ এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তানপ্রধানের সুরধর্ম কিংবা গদ্যছন্দের নির্মোহ উদাসীনতা নয়, বরং স্বরবৃত্তের চাপল্যই হয়ে

উঠেছে কবির মুখ্য অবলম্বন। সময়ের এক ঝোড়ো অভিঘাত প্রায় সমান্তরালে ফুটে উঠেছে 'ঝড়' কবিতায়। সেক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্তের দুলকি তালে কবি সমকালের চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছেন, ছন্দের বিচিত্র ব্যবহার গণেশ বসুর কবিতাকে যেন একটি ঋতু-চরিত্র দিয়েছে।

সমকালের অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা গণেশ বসুকে ক্রমাগত ইতিহাসের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। কখনও সেই ইতিহাস দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে যায়, আবার কখনও তা একান্তই পার্শ্ববর্তী জীবন প্রবাহে মিশে থাকে। আর সেই সূত্র ধরেই 'জঙ্গল সাঁওতাল' হয়ে ওঠেন তাঁর কবিতার প্রাণপুরুষ—

"দুঃখের দিনে আগুন জ্বেলেছে তরাইয়ে শূন্যতায়
প্যাঁচা ইঁদুরের হাল-হকিকত অজানা ছিল না কিছু
ক্ষুধিত মানুষ শোষিত মানুষ হাঁটে পাশাপাশি; পিছু
হাঙর কুমির বেরিয়েই যেন সূর্যকে গিলে খায়।
আস্ত মানুষ জঙ্গলে সাঁওতাল।

জঙ্গল সাঁওতাল
কালের কলসে রৌদ্রকরোটি উজ্জ্বল উত্তাল।" (জঙ্গল সাঁওতাল)

পাশাপাশি ভিয়েতনাম হয়ে উঠেছে মানুষের গণসংগ্রামের প্রতীক, সত্তরে দিনগুলোর 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম' কলরবে রাজপথ তখনও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। তবু সেই সময়বৃত্তে দাঁড়িয়ে কবি ছুঁতে চাইছেন ইতিহাসের ঝঞ্ঝা গতিকে। যে যেখানে লড়ে যায় আমাদেরই লড়া— এই বোধ কবিকে আলোড়িত করেছে। তাই কবি মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে লিখছেন—

"মায়ের হা-অন্ন মুখ খুঁতলানো, অভিশাপ
দুলতে থাকে, নাবাল ভূমিতে
খাটাশের আস্তানা, বাদুড় ঝোলে, তামাটে দিনের
শিরায়-শিরায়
চুল্লির চমক
বাংলার পায়ের ছাপ উত্তরের
মরচে-পড়া ইতিহাস আগ্নেয়গিরির
ক্রোধে ভিয়েতনাম।" (খঙ্গের মুখে)

গণচেতনা, গণসংগ্রামের প্রতি কবির আসক্তি গণেশ বসুর একাধিক কাব্য সংকলনে মিশে গিয়েছে। সত্তরের দশকের দিনগুলোতে কবিতা হয়ে উঠেছিল একপ্রকার অস্ত্র। সমাজ পুনর্গঠনের হাতিয়ার। কবির দায়বদ্ধতা বারবার জনগণের

মুক্তিচেতনার সমার্থক হয়ে উঠেছে। বাঙালি জীবনে সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছেন লেনিন। ১৯৬৯ সালে তরুণ সান্যালের সঙ্গে 'লেনিনের যুগ' কাব্য-সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন গণেশ বসু। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হল 'অধিকার রক্তের কবিতার' কাব্যগ্রন্থটি। বস্তুত, এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। কাব্যগ্রন্থের সূচনাতেই কবি লিখেছেন— 'শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসা লেনিন লেনিন।' সামনে এক লড়াই-এর ক্ষেত্র, পেছনে ক্ষুধিত দিন আর সামনে একটি লাল টকটকে নতুন দিনের সূর্য। কবি মুক্তির টানে ভাসিয়ে দিয়ে প্রত্যয়ী জনজীবনকে। দেশ-কালের গণ্ডী ছাপিয়ে নিপীড়িত জনগণের শরিক হয়ে কবি উচ্চারণ করেন—

"এ লড়াই চলছেই, চলবেই
মেকঙের গঙ্গার ভোল্‌গার
চলবেই এ লড়াই চলবেই
মার-খাওয়া বিশ্বের জনতার
লেনিনের রক্তের জনতার।"

কবি মণীন্দ্র রায় 'অধিকার রক্তের কবিতার' সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—

"গণেশ বসু যা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন তা তরুণ কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। বর্তমান কালের এবং অনতিদূর অতীতে বাংলা দেশের সমাজজীবনে যা ঘটেছে সেই বহু তলবিশিষ্ট বিচিত্র জটিল বাস্তবকে একটি দীর্ঘ কবিতার অবয়বে সমগ্রতা দেওয়া এবং তাতে মানুষের ইতিহাসে নবযুগের স্রষ্টা মহামতি লেনিনের ভাবসমর্থন একীভূত করা সৎ এবং পরিশ্রমী কবিত্ব শক্তিরই মুখাপেক্ষী। গণেশ এ কাজে আশাতীত ভাবে সফল হয়েছেন।"

মানুষের কথা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করার দায় বারবার গণেশ বসুর কবিতায় তরঙ্গ নির্মাণ করে। কবি সংগ্রামকে মানুষের মুক্তির অপরিহার্য হাতিয়ার হতে দেখেও বিরাট কোনো আশাবাদে ভেসে যাননি। বরং সংগ্রামী জনতা এবং সংগ্রামের পথ প্রদর্শকের মাঝখানের দূরত্বকে অনুভব করেছেন। তাই তিনি বলেন—

"পা থরথর টলছে সময়, দলনেতাদের কি?
লোক মরছে পেট ধুকছে দুঃখ কীসের? ছিঃ।
বিল শুকনো মন শুকনো বুক দাউ দাউ ? ফোঃ।
দলনেতারা আঁকড়ে আসন দুঃখ কোথায়? ছোঃ।"

("সময়/'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ')

ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়ে এসে বাঙালি কবিদের জীবন নাগরিক ও ব্যক্তিগত জটিল আবর্তে প্রবেশ করেছিল। গণসংগ্রাম, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ মানুষের জন্য নতুন সূর্য ওঠেনি। বরং এক অনিবার্য ক্ষয় জীবনকে গানহীন করতে ভারী থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। গণজীবন ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছিল। এরকম সংকটের দিনে গণেশ বসুর মতো দরদী শিল্পীরা একবারের জন্যও জনগণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। ষাটের দশকের আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। আর আশির দশকের আন্দোলন হয়ে উঠল একক মানুষের সার্বিক বেঁচে থাকার লড়াই। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে অতিক্রম করেও যে কেবলমাত্র জীবনের প্রতিনিধি হয়ে বহু জীবনের সংকটকে স্পর্শ করা সম্ভব, তা এ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—

"মরা টিকটিকি
ইঁদুরের ছায়া ঘুন পোকা বুক : বেশ তো আছি।
গণতন্ত্রের
মূলোচ্ছেদেই কাঁচা হাড়গোড় : বেশ তো আছি।
দাপিয়ে বেড়ায়
নেকড়ে কুমীর ধর্ম মিনার : বেশ তো আছি"

('বেশ তো আছি'/বাঘের থাবার নিচে)

মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, সুখী গৃহকোণে ধর্মের আফিমে বুঁদ হয়ে বসবাস জীবনকে এক অন্তহীন পোড়া জমিতে পর্যবসিত করেছে। সে জীবনে ফসলবিলাসী হাওয়া প্রবেশ করার ছাড়পত্র পায় না। কোনো গানের সুর সে জীবন থেকে উৎসারিত হয় না। প্রাণের দরজা-জানালা বন্ধ করে গোপনে মনুষ্যত্বের এই মরে যাওয়া, ভালো থাকার নেশায় বুঁদ হয়ে বস্তুত একতাল কদর্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি কবিকে যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছে। কবি জানেন, আজকের যুদ্ধ কোনো বাহ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে শুধু নয়, তা নিজের সঙ্গে নিজেরই বেঁচে থাকার লড়াই; নিজের স্বপ্ন দেখার ইচ্ছেগুলোকে শানিয়ে নেওয়ার লড়াই— তবু সেখানেও এক অন্তহীন ক্ষয়—

"খোলসই বদলায় শুধু, মরা মেঘে দিন ভাসে, সযত্নে সাজায়
ভাঙাচোরা ঠ্যাং সব, নামেরই বদল শুধু, দেখি
টিকটিকির ঠোঁটে রক্ত, আরশোলার তোবড়ানো শরীর।
এখন সমস্ত স্বপ্ন হা হা করে মরচে পড়া লোহার মতই।"

(এখন/বাঘের থাবার নিচে)

সে লোহার শরীর থেকে নির্গত বিষাক্ত মরচে অবিরাম জীবনকে আহত করে। জীবনের যাবতীয় বারুদেরা শীতল ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। কবি তাঁর যৌবন আর মধ্যবয়সের মধ্যে কোনো সম্পর্ক-সূত্র স্থাপন করতে পারছেন না। মানসিক ভাবে বেঁচে থাকা এই সকল মানুষগুলোর আক্ষেপ ফুটে উঠেছে কবির কলমে—

"দিনকাল কেমন যেন বদলে গেছে
কেমন যেন বদলে যায় সব কিছু।"

(স্বপ্নভূমি/বাঘের থাবার নিচে)

এলিয়ট বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জীবনের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন পোড়া জমির অস্তিত্বকে। বিশ্বায়নের সন্ত্রাসের কবলে পড়ে গণেশ বসু অনুভব করেছেন 'খরা'কে। জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সকল রকমের কমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা। জীবন বড়ো বেশি একরৈখিক এবং স্থূল হয়ে উঠছে নিরন্তর।

"খরার ভিতরে আমি খরা হয়ে এখন ঝিমাই।
মেধা নেই, মেধার ভিতরে আজ খরা
বোধ নেই, বোধের ভিতরে আজ খরা
হৃদয়ে হৃদয় নেই, হৃদয়ের বালিগর্ভে মরা টিকটিকি
ঘিরে আরশোলা হাসে, থিক থিক্ পিঁপড়ে ইঁদুর।"

(খরা/নীরব সন্ত্রাস)

ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই খরার দাপট আরো ভয়াবহ। জীবনের পরতে পরতে এই খরার আত্মপ্রকাশ। এর সঙ্গে মোহসার বন্ধনে অবিচ্ছেদ্য পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের চোখরাঙানি। মানুষের কিছুই আর ব্যক্তিগত নেই। সবই বিকিয়ে গিয়েছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর জোয়ারে। সমাজের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে হাজারো প্রতিষ্ঠান— পরিবার, স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা এমনকি ব্যক্তিগতের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া পড়শিকুল, যেখান থেকে নিয়ত আমাদের একান্ত ব্যক্তিক জীবনে 'লোকলোচন উঁকি মারে'। আমরা নিয়ন্ত্রিত হতে ভালোবাসি, গড্ডালিকা স্রোতে মিশতে ভালোবাসি, গোপনে বাঁচার মন্ত্র ভুলে গিয়ে মরে যেতে ভালোবাসি। কেননা আমরা তো ভয় পেতে ভালোবাসি। তাই এক বর্ণময় নীরব সন্ত্রাস আমাদের প্রতিটি কর্মস্রোতকে, উদ্যমকে, স্বাভাবিকতাকে নিয়ত আহত করে। 'নীরব সন্ত্রাস' কবিতা সংকলনের 'বলবে তারা বলবে' কবিতায় কবি রাষ্ট্রের এই দমনমূলক হাতিয়ারটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

"জিজ্ঞেস করো তোমার চেয়ারকে
তোমার কলমকে

তোমার প্যান্টকে
এমন কি তোমার বোতামকে"

— এই জিজ্ঞাসার ভিতর থেকেই কবি অনুভব করেছেন এক অমোঘ ভয়াল সত্যকে—

"বলবে, তারা বলবে
ক্ষমতায় যারা থাকে তারা কি শান্তি দেয়?

বলবে, তারা বলবে
সন্ত্রাসের থেকে ফের জন্ম নেয় আরেক সন্ত্রাস।
বলবে, তারা বলবে
নীরব সন্ত্রাস আজো বর্ণময় খরার দাপটে।"

বিশ্বায়ন মানুষের সমাজ বদলের স্বপ্নকে পুড়িয়ে ছাড়খার করেছে। কোনো রাজনৈতিক মতবাদেই আজ আর মানুষের জীবনকে সমস্যা উত্তরণের পথ দেখায় না এই চরম সত্যকে স্বীকার করছেন সেই মানুষটি, যিনি একসময় ভেবেছিলেন সমাজতন্ত্র মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চারিত করে তাকে উপহার দেবে নতুন দিন।

গণেশ বসুর রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, দলীয় রাজনীতির অপরিসর, সংকীর্ণ, বাদুরে গন্ধে দমবন্ধ করা আদর্শে তিনি নিজের কবিতাকে বেঁধে ফেলেননি। তিনি দলকে পেরিয়ে দেখেছেন মানুষকে। সেই মানুষের যন্ত্রণা বারবার তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাই একসময় মানুষকে সংগ্রামী বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি, তার বর্তমান স্বৈরাচার গণেশ বসুকে নীরব থাকতে দেয়নি। বরং তিনি স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণা এবং বিক্ষোভে উচ্চারণ করেছেন—

"তোমার শিকড়ে ছিলো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, আবেগের পানি।
তোমার শিকড়ে ছিলো স্বাধীনতা, আরিঅন, সৃষ্টির আগুন।"
এই স্বপ্নের পাশাপাশি—
"পানি নেই—। ক্লেদ বমি যমপট। তিলে তিলে অহংকার ফোটে।
উনুন কি নিভে গেছে? অবিশ্বাস্য অপমৃত্যু। ধুলোঝড় ওঠে।"

(পন্থা/অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

গণেশ বসুর 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসানদরিয়া এবং ভাঙা বইঠার গান' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার এক বিরাট ক্যানভাস হয়ে উঠেছে। একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্রোহকালের ভিতর থেকে কবি কিছু মানবিক প্রশ্নকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান—

"বন্দুকের নীচেই রয়েছি।
ওরা তো নিষিদ্ধ নয়, মধ্যরাতে হানা দেয় তবুও জল্লাদ
অন্ধকার নেড়েচেড়ে, ঘিরে ফেলে ঘরবাড়ি, দাগি ক্রিমিনাল।
যেন এক অধ্যাপক, নির্বিচার থার্ড ডিগ্রি, সন্দেহের চামুন্ডাবিলাস
বৈদ্যুতিক শক্ দেয়, উপড়ে নেয় নখ চুল, শিশুমুখে আগুনের ছ্যাঁকা
অনির্বাণ, এভাবেই চলে যায় পরিচ্ছন্ন প্রশাসন রক্ষার শপথ।"
(বন্দুকের নীচেই রয়েছি অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

এক্ষেত্রেও কবির যাত্রা বিশেষ থেকে নির্বিশেষে। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সমস্যাকে কবি দেশ-কাল-রাষ্ট্রের সীমানা পার করে অনুভব করেছেন একটি সর্বকালের প্রেক্ষাপটে।—

"ক্ষমতা মানুষ খায়, গিলে নেয় মৃগনাভি স্বপ্নের মহড়া।
ক্ষমতা স্তাবক টানে গড়ে তোলে অন্ধকার বিমুগ্ধ বলয়।"
(কাক/অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

আবার অন্যত্র কবি বলছেন—

"ওরা তো তিরিশ মাত্র, আমরা দুশো তিরিশেরও বেশি।
যা খুশি করার হক আমাদেরই, বোঝে না নির্বোধগুলি, সংখ্যাতত্ত্ব এটাই দস্তুর
('সংখ্যাতত্ত্ব'/ভাসানদরিয়া)

সমকালের শাসনতন্ত্রের মুখে উঠে আসা আধিপত্যবাদী ঘোষণা এভাবেই বিশেষ কালের হয়েও বস্তুত এক সর্বকালীন ক্ষয়কেই প্রকট করে তোলে। এরই পাশাপাশি কবি বলেন—

'চেয়ার উন্মাদ ষাঁড়, পুলিশের ভানুমতী বুটেই বিশ্বাস!' 'চেয়ার'/ (ভাসানদরিয়া)

ঊনষাট থেকে দু'হাজার ছয়— সুদীর্ঘ পাঁচটি দশক ধরে শাসনতন্ত্রের একটি চেহারাকেই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। লাইসেন্স প্রাপ্ত সন্ত্রাসকারীদের নিয়ে রাষ্ট্র বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠরোধ করে চলেছে। পুলিশ-মিলিটারী আসলে যে রাষ্ট্রের মানুষ-মারার হাতিয়ার— এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিরোধী তত্ত্বটি বারবার কবি পাঠককে জানিয়ে দিতে চান।—

"পুলিশ পুলিশই থাকে, শাসকেরও একই রঙ, সূর্য ডোবে পায়ের তলায়।"
('হাত'/ভাসানদরিয়া)

২০১১ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হচ্ছে 'ভাঙা বইঠার গান'। দিন বদলের সমস্ত উপাচার সাজানো ছিল, অথচ দিন বদল হ'ল না। জীবন যে তিমিরে ছিল,

সেই তিমিরেই হাঁটু মুড়ে বসে রইল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অব্যাহত। আর তাই ২০০৬ থেকে ২০১১—'ভাসানদরিয়া' থেকে 'ভাঙা বইঠার গান'— কবির চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে সেই একই বাস্তবতা—

"খড়কুটো জড়ো করি ঘরে ঘরে গড়ে নিই যে যার চুল্লিকে
গোটা দেশ জেগে আছে, কড়াই ঝোলানো থাকে আকাশের মতো,
পীড়িত আত্মায় জ্বলে প্রতিশোধ যৌবনের ক্ষিপ্ত তরবারি
গণহত্যা করা ছাড়া পুলিশের কোনো কাজ কখনো কি ছিল?"
(জঙ্গলমহল)

জীবনের স্বপ্নগুলোকে কবি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দমননীতির জাঁতাকলে পিষে যেতে দেখছেন। সময় তাঁর চেতনায় কোনো আশাবাদের সৌরভ ছড়াতে পারছে না। কেননা—

"এখন সময় খ্যাপা গ্রিনহান্ট নাৎসিবাহিনীর
রক্ত মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সমুদ্র বানায়।" (লাশ)

এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রতিটি বিবেকী মানুষের সহজ বেঁচে থাকাকে ক্রমাগত সন্ত্রস্ত করে। এ কেমন বেঁচে থাকা, যেখানে অধিকার সুরক্ষিত করতে চাইলে ধেয়ে আসে রাষ্ট্রীয় শাসন! সাধারণ মানুষ আকুলভাবে শুধু বেঁচে থাকতে চায়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সে স্বাধীনতাও কেড়ে নেয় বারবার। 'একা' কবিতাটিতে এই শোচনীয় যাপনের ছবিটি স্পষ্টতা পেয়েছে—

"গণতন্ত্র নই আমি। তবু
আমাকে তাড়াতে কেন টিয়ারগ্যাসের শেল অযথা ফাটাও?
গণতন্ত্র নই আমি, তবু
আমাকে তাড়াতে কেন বেপরোয়া লাঠিচার্জ করো?
গণতন্ত্র নই আমি তবুও রাইফেল কেন ঝাঁঝরা করে বুক?
আমি তো দোমড়ানো টিন, গণতন্ত্র নই।"

—গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র এভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তছনছ করে দিচ্ছে একক মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্নকে। লড়াই কি তবে জীবনের সঙ্গে? উত্তর মেলে না কোনো প্রশ্নের। আর তাই এ বড়ো সুখের সময় নয়। বেঁচে থাকার স্বার্থেই তাই—

"গলাটা আমার তেতো আর ফ্যাসফেসে
গলাটা আমার জ্বলন্ত অঙ্গার
দাঁড়াও শাসক, মৃত্যুর কারবারি!
আমাদের নেই অশ্রুও হারাবার।
গলাটা এদেশে জ্বলন্ত অঙ্গার।" (গলাটা আমার জ্বলন্ত অঙ্গার)

আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি, গণেশ বসুর কবিতা জীবনের রুক্ষভূমি থেকে উদ্গত। রাজনৈতিক পটভূমি যেমন সত্য, তেমনি সত্য হয়ে উঠেছে সামাজিক সমস্যার দিকগুলিও। এই সবটুকুর সমন্বয়ে জীবনের সামগ্রিক ব্যথাতুর চেহারাকে তিনি ছুঁয়ে গিয়েছেন। বিশ্বায়ন এবং উত্তর-আধুনিকতা থেকে জন্ম নেওয়া মানবিক সংকটগুলি প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থার ও জীবনভাবনার ধারাপাতকে দ্রুত বদলে ফেলছে। বর্তমান গতিবহুল জীবনে পারিবারিক সম্পর্কের আগলগুলো ক্রমান্বয়ে আলগা হয়ে পড়ছে। উত্তর প্রজন্মের কেরিয়ার প্রতিষ্ঠার ঘোড়-দৌড় আর অর্থ উপার্জনের বিকট প্রচেষ্টার পাশে প্রায় ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ মা-বাবাদের জীবন। কোথাও কিছু করার নেই। বিশ্বায়নের ও উন্নতির জোয়ারে অস্তিত্ব বজায় রাখাটাই বড়ো দায়। কোনো অভিযোগ নেই, নালিশ নেই। কিন্তু এক বিচ্ছিন্নতা জীবনকে কুরে কুরে খায়। এ-ধরণের সংকটের প্রতিফলন ঘটেছে 'ভাসানদরিয়া' সংকলনের 'পরিশেষ' কবিতাটিতে—

"মেয়েটা বিদেশ থাকে, ছেলেটাও নৌকো কাগজের।
পুরনো দিনের মেঘে জল জমে, কুয়াশায় বোনে
দেখা হবে, দেখা হবে, সকলেরই শিকড়বাকড়।
গানের কলির মতো বুড়োবুঝি রাতের আকাশে তারা গোনে।"

একদম অমোঘ এই সংকট বড়ো বেশি তীব্রতর আধুনিক জীবনে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনটাই কেমন তার নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমাদের সময় নেই পিছন ফিরে তাকাবার। আসলে সময়টাই কাউকে পিছন ফিরতে দিচ্ছে না। ছিঁড়ে যাচ্ছে শিকড়। পাশাপাশি জীবনটা খুব বেশি আড়ালহীন হয়ে যাচ্ছে। একান্ত নিভৃত বলে কোনো কিছু আজ আর নেই। সম্পর্কের অলিতে-গলিতে শুধু উদযাপনের ভিড়—

"আমাদের স্বপ্ন শস্য, অগ্নি প্রেম একটু তো আড়াল চায়,
একটুই আড়াল।
তাও নেই। কই যাই এ সময় তোমাকে নিয়েই।"

('ভ্যালেন্টাইনস ডে'/ভাসানদরিয়া)

এভাবেই গণেশ বসুর কবিতা হয়ে ওঠে সময় ও মানুষের তল না মেলা এক এবড়োখেবড়ো দুঃসময়ের দলিল। তবে ক্লান্তি, হতাশা, যন্ত্রণা কবির বেঁচে থাকার স্পৃহাকে বিনষ্ট করতে পারে না। আসলে এ সব কিছু পিছনে রয়ে গিয়েছে একটি বলিষ্ঠ জীবনবোধ, যা কোনো পরিস্থিতি কোনো কিছুর সঙ্গে আপোস করে না, কবিকে জীবন-বিমুখ করে না।

শেষ না হওয়া গতানুগতিক অধঃপতন, শেষ না হওয়া যন্ত্রণার হা-হুতাশ আর শেষ না হওয়া তৃতীয় বিশ্বের ক্রমশ বেড়ে চলা যন্ত্রণা আর রক্তবমিদের এক 'বর্ণময়' ক্যানভাস হয়ে উঠেছে গণেশ বসুর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ—'বর্ণময় পৃথিবী'। আমরা বারবার এটাই দেখছি। গণেশ বসুর কবিতা সময় এবং জীবনের অলিন্দে বাসা বেঁধে থাকা রাজনীতির ছককে পাঠকের দরবারে তুলে আনতে বদ্ধপরিকর। নিছক সাহিত্য সাহিত্য খেলা নয়, বরং পাঠকের চেতনাকে তিনি এখানেও তর্কে আর যুক্তিতে আপোসহীন করে তুলতে চান। আর তাই শক্তি-রাজনীতির কারবারিদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত। বলা বাহুল্য, এই শক্তি-রাজনীতির প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ত বদলে যায়, কিন্তু প্রতিরোধ চলতেই থাকে। পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় মিডিয়া-ব্যবসা এক সমান্তরাল আধিপত্য ক্ষেত্র নির্মাণ করে। কবি-শিল্পী তৈরির কারখানা হয়ে ওঠে দাদাভাইদের প্রকাশনা সংস্থা। কবির মৃত্যু ঘটে এইসব দাদাভাইদের লোভনীয় গিলোটিনে—

"তাহাদের মাংস বড়ো স্বাদু লাগে সর্বাধিক প্রচারিত কুমিরের কাছে।
নীল স্কচ বয়ে যায়, স্বর্গ থেকে নেমে আসে পরি।
নিজেদের মতো করে বদলে নেয় কুমিরেরা, বিলাসে ভাসিয়ে দেয়, প্রজ্ঞা কেড়ে নিয়ে
কিমাকার করে তোলে সংখ্যালঘুদের মতো কসাইখানায়।"
কেননা,
"তাহাদের মাংস বড়ো স্বাদু লাগে সর্বাধিক প্রচারিত কুমিরের কাছে কবিরাই খাদ্য কুমিরের।" (কুমিরের খাদ্য কবিরাই)

পাশাপাশি, 'মিডিয়ার স্বাধীনতা" বলে তৈরি হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাটিকেও কবি প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সত্যি সত্যি 'মিডিয়ার স্বাধীনতা'র নামে যাবতীয় তোড়জোড় নিছক মিডিয়া-প্রভুর যথেচ্ছাচারে আটকে যাচ্ছে না তো? পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় চিটফান্ডের মালিক, জমির দালাল, আদার ব্যাপারি যেখানে মিডিয়া চ্যানেলের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, সেখানে 'মিডিয়ার স্বাধীনতা' কি আরেকটি বিরাট সামাজিক গণ-পরাধীনতার জন্ম দেয় না? তাই—

"টি আর পি আরো বাড়াতে অসুস্থতা
অর্ধসত্যে থোড় বড়ি খাড়া থোড়
হা হা করে হাসে স্বার্থের হাড়গোড়
সোনার শিকলে নাচে বাক্‌স্বাধীনতা।
প্রশ্ন তুলেছেন মার্কস, মিডিয়ার স্বাধীন, কার স্বাধীনতা?"

(প্রশ্ন তুলেছেন মার্কস)

পুঁজিবাদী সামাজিক পরিসরে আজ শুধু রক্তমাংসের শরীরটাকে সাজিয়ে তোলার ব্যস্ততা। অথচ মানসিক সাম্রাজ্যে, বোধের সাম্রাজ্যে অবক্ষয় অব্যাহত। জীবনের এই গভীর গভীরতর অসুখ গণেশ বসুর কবিতায় তার সার্বিক স্থূলতা নিয়েই উপস্থিত হয়েছে—

"ক্যালরি মেপেই না কি খেতে হবে, চর্বিযুক্ত কিছুই চলবে না।
তার বিনিময়ে রোজ একটু একটু বেড়ে যায় মগজে চর্বিই,
তার বিনিময়ে রোজ একটু করে জমা হয় বিপন্ন বিষাদ।"

(চর্বি)

সমসাময়িক যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণের সীমাতেই শুধু 'বর্ণময় পৃথিবী'-র কবিতাগুলো আটকে থাকেনি। কবির অতীত যাপন, নস্টালজিয়া, প্রেম-প্রত্যাখ্যান বারবার ফিরে ফিরে এসেছে কবিতাগুলোয়। তবে অতীত এক্ষেত্রে কখনোই বর্তমানের তীব্র ক্ষতের মলম হয়ে ওঠেনি। কবি এক্ষেত্রে পলায়নবাদী নন। তাই বর্তমানের ধাক্কা তাঁকে কখনোই অতীতচারী করে তোলেনি। অতীতকে কবি সেই কারণেই কখনো এখানে মহীয়ান করে তুলতে চাননি। 'পারিবারিক ফোটোগ্রাফ' কবিতাটি অনেক জাঁদরেল সংসারী মানুষকেও নাড়া দিয়ে যাবে—

"ওখানে কি আছি আমি?
এতই পুরনো এই ফোটোগ্রাফ, কার হাত, কার চোখ, বোঝাও
যায় না।
ফোকাসের বাইরে সব, তবু
কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ছায়া ছায়া ফ্রেমের ভিতর।"

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট যেমন গণেশ বসুর কবিতার এক প্রধান সমালোচনার দিক, তেমনি অন্যদিকে প্রেম একটি অপরিহার্য সত্য হয়ে উঠে বারবার পাঠককে ছোঁয়া দিয়ে যায়। কবি সম্পর্কের কাছে নতজানু হয়ে যাবতীয় ক্লান্তি থেকে প্রশান্তি চান। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এ কেবল প্রেমের আকর্ষণ ছিল না, তা একাধারে হয়ে উঠেছিল কবির বিঘ্ন বিজয়ের গোপন চালিকা শক্তি, জীবনের নিবিড় আশ্রয়—

"সৃজনে আবেশে ধ্বংসে বারুদের গন্ধ দশে কার মুখ কার?
জন্মভূমি? অথবা বনানী !" (১৮ সংখ্যক/ বনানীকে কবিতাগুচ্ছ)

'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' সংকলনটিতে রাজনৈতিক চেতনায় দীপ্ত কবিতার পাশাপাশি কবি লিখছেন ব্যক্তিপ্রেমের রোমান্টিক বর্ণমালা—

"দূরগামী আজ বিদেশিনী তবু বলো
প্রবাসে প্রবল হবে কি বিস্মরণ

হৃদয় এদিকে স্মৃতিভারে টলোমলো
অশ্রুতে তুমি নিশ্চত আমরণ।" ('তুমি')

'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'-এর দীর্ণ সামাজিক পটভূমিতে মানবিক বেঁচে থাকার চর্যাপদ লেখা হয়েছে প্রেমের হাত ধরে, সম্পর্কের হাত ধরে। কবি তাঁর প্রেমকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করেছেন—

"তোমার জন্যই আমি ভূকম্পবিধ্বস্ত মুখে রেখে যাই হাসি।" পাশাপাশি 'ইরিনা'কে নিয়ে লেখা কবিতায়—

"শ্মশানে চুম্বন ওড়ে। আর নয়। এভাবে চলে না।
তোমাকে বিব্রত করি? পদতল কেঁপে যায়? ধু ধু রোদে ঝরে
অনুরাগ? চতুর ভ্রুকুটি জ্বলে? স্তব্ধ গান? শোনো
তোমাকে নিয়েই তবু এ বন্দিশিবিরে আজো মরে বেঁচে আছি।"

একমাত্র 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' ছাড়া গণেশ বসু শুধুমাত্র প্রেমের কবিতা নিয়ে আর কোনো সংকলন প্রকাশ করেননি। আসলে সময় যখন অস্থির, সময় যখন রক্তাক্ত, তখন আলাদা করে রোমান্টিক স্মৃতি বিলাসে বুঁদ হতে পারেননি তিনি। প্রেমের কবিতাগুলি তাই ঝড়-ঝাপটায় বিধ্বস্ত কবিতাগুলির পাশে স্থান পেয়েছে। কবি বিদ্রোহ করেন— তাই ভালোবাসেন। ভালোবাসেন— আর তাই বিদ্রোহ করতে পারেন। প্রেম এবং প্রতিবাদ— ভালোবাসা এবং বিক্ষোভ— এই আশ্চর্য সমন্বয়ে কবির প্রায় প্রতিটি কবিতা সংকলনই জীবনের এক অখণ্ড সঙ্গীত হয়ে উঠেছে, যা পাঠককে বারবার তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার নিরলস উপাসনায় ব্রতী।

গণেশ বসুর কবিতায় আমরা এমন এক শিল্পীকে খুঁজে পাই, যিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী। গত বাঁধা পথকে তিনি ভাঙতে চেয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। এদিকটি সম্ভব হয়েছে কবিতার শাব্দিক শরীরী রূপকে অবলম্বন করে। ফর্ম নিয়ে ভাঙা গড়ার বেশ কিছু ছবি আমরা তাঁর কবিতায় পেয়ে যাই। কবিতার দেহের গঠন বিষয়ে 'শ্রুতি' এবং 'প্রকল্পনা' নামের দুটি কবিতা আন্দোলন কবিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। কবির প্রথম সংকলন 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশ পায় ১৯৬৪তে। সনেটের আকারে সাজানো এখানকার কবিতাগুলোতে আঙ্কিক-চেতনা উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে না। 'শ্রুতি' আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৬৫ তে, সমাপ্তি ১৯৭১-এর আগস্টে। অন্যদিকে 'শ্রুতি' আন্দোলনের ভাবধারার অনেকটা কাছাকাছি অবস্থান থেকে ১৯৬৯-এ 'প্রকল্পনা' আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলনের মুখপত্রে জানানো হয়—

ক. সাহিত্যে প্রচলিত কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম পরিত্যাগ করতে হবে।

খ. ঘটনা দৃশ্য ও অভিজ্ঞতার প্রতি শিল্পীর অনুভূতির অনাবৃত উন্মোচন কাম্য।
গ. প্রচলিত বাকরীতির বিরোধিতা। শব্দের সীমানা অতিক্রম। প্রভৃতি।

গণেশ বসুর কবিতায় এই 'প্রকল্পনা' সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবের সম্ভাবনা বেশি। ১৯৭০ পর্যন্ত প্রকাশিত 'নিজের মখোমুখি', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'অধিকার রক্তের কবিতার' সংকলনে সে ভাবে ফর্ম নিয়ে চিন্তা ভাবনার কোনো স্বাক্ষর পাওয়া যায় না। 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' থেকেই ফর্ম সম্বন্ধে কবির সচেতনতার সূচনা। এই সংকলনের 'স্বর্ণচাপা' কবিতাটিতে গদ্যের কাঠামো ও কবিতার হ্রস্বচরণের পর্যায়ক্রমিক সন্নিবেশ ঘটেছে—

"চলকে উঠল ঘর। কয়েক জোড়া চশমার পুরু কাচ, ফুরফুরে। খটাশের মায়াবী চুল, ঠোঁটের নিভন্ত চুরুট নিষ্পলক দরজার দিকে। তারপর... যে যার নিজের দিকে। কপালের রেখায় ঝিকিয়ে উঠল নদী। ভ্রান্তিমেঘ। সোঁদা স্মৃতি।

টনটন
ভাঙনের ভেতরে ভাঙন।
সমস্তই ঘুলিয়ে গেল যে।

ক্ষেপে উঠল দাবার ঘোড়াও। ভাঙচুর। কেঁপে উঠল দেয়াল, মেঝে কুঁড়ে অনন্ত ত্রিশূল। রাস্তার আকাশ, ঝমঝম চারদিকে। উচাটন।"

আবার, আরেকটি কবিতায়—

"জন্ম মৃত্যু জন্ম আর ধোঁয়া কুয়াশায়
দীর্ঘবেলা
দীর্ঘবেলাভূমে?

এ এক দুঃসহ দিন। এ এক আনন্দ অবাক, স্মৃতির লণ্ঠন ঝাড়। ফুঁসে উঠল নদী। ঢেউয়ে ঢেউয়ে রক্ত জবা। খালবিল দামাল উল্লাস। রাস্তাগুলো বিদ্রোহ, বিপ্লব।" (অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ)

ফর্ম নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'নীরব সন্ত্রাস' কিংবা অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' এর বেশ কিছু কবিতাকে আকর্ষক করে তুলেছে—

(ক) "একটি শহরতলির ছবি (সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে।)
৩ মেঘ মারলো উঁকি ঈশান কোণে
১ মাছ ভর্তি পুকুর ডাইনে
পুকুর পারে মাঠ, মাঠের শেষে বাড়ি
১ মানুষ (কাঁচের জানলায় জ্বলছে চোখ)" ('আবিষ্কার/নীরব সন্ত্রাস)

(খ) "১. আপনার মতে জনজীবন কেমন চলছে
ক. পারদ প্রতিম
খ. পাথরপ্রতিম

গ. ত্রিশঙ্কু
২. আপনার মানসিক চাহিদা
ক. সিনেমায় যাই, থিয়েটার, খেলার মাঠে, ক্লাবে
খ. খুলতে চাই জানলাগুলো
গ. বুকের ভিতরে তৃষ্ণা, মাতৃভাষা লুঠ হয়ে গেছে।" ('সমীক্ষা/ নীরব সন্ত্রাস)

(গ) "এখন খরা
আমাদের অক্ষরে অক্ষরে
বোধে
বোধিতে
ভালোবাসায়
নেই
এ দেশে এখন কোনো নেতা নেই
ঝুলন্ত সেতুর মতো নেতা সব টলমল উপদলপতি। ('খরা' নীরব সন্ত্রাস)

(ঘ) "বিশ্বায়ন মায়াময় TCDD
ভূতের পাহার
গ-এর নাড়ি কেটে আগেই বেরোয় ঘ
ঘ-এর নাড়ি ছিঁড়ে দাপিয়ে বেড়ায় ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
ঞ
উদ্ভট সময় জুড়ে ছ্যাঁচর প্রতিভা।"
('বেঁচে আছি / অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

(ঙ) "মেধা ও মননে। রূপবান শালপাতা সন্ত্রাসের ঠোঁটে
উড়ে আসে। প্রযুক্তির চতুস্তলকেই দ্রুততর সমাধান?
ন্যানো
বায়ো + ক্রাইয়ো
ইনফো
ক্রমাগত রক্তবমি, ছুটে আসে উপভোগ, নতুন কলোনি।"
('বেঁচে আছি'— অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

সচেতন শিল্পী মাত্রই প্রচলিত প্রথার দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয়। গণেশ বসুর মতো সময়-সচেতন কবি পাঠকের সামনে স্বতন্ত্র

দৃশ্যপট তুলে ধরার চেষ্টা করেন। শব্দের প্রচলিত অর্থকে ভেঙে নতুন নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ করে যান। তাঁর কবিতায় মানুষের চারপাশের পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকেই চিত্র উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু ছবির নির্মাণশৈলিতে তা অনন্য হয়ে উঠেছে। প্রতিটি কাব্যসংকলনে সময়ের সাথে সাথে চিত্রকল্প নির্মাণ পর্যায়ক্রমিক ভাবে ক্রমপরিণতির পথে হেঁটেছে।

(ক) আর কোনোদিন দেখব না আমি তাঁবুর মতো
আকাশ মেলেছো ও-মাথা ঝুঁকিয়ে আমার বুকে।
(৩ সংখ্যক, বনানীকে কবিতাগুচ্ছ)

(খ) জলজগুলোর ঘ্রাণ নিয়ে জেগে থাকো, জাগো, জাগো
নিশিন্দা পাতার চোখ পাকা কামরাঙার শরীর
(৩৪ সংখ্যক, বনানীকে কবিতাগুচ্ছ)

(গ) আকাশের দিকে তাকাতেই সামনের মাঠে হাঁপিয়ে-ওঠা ন্যাড়া গাছটায় বসন্ত এলো। (শুন্যতার পাশাপাশি', নিজের মুখোমুখি)

(ঘ) দামাল স্মৃতিরা বুনো শুয়োরের দাঁতে...(অধিকার রক্তের কবিতার)

(ঙ) পায়ে পায়ে ভুবনডাঙায়
শিক কাবাবের লালে মা আমার...
('অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ)

(চ) কুমিরের লেজের মতো জীবন ভর
ক্লান্তিকর সন্ধ্যা। (বাঘের থাবার নিচে। বাঘের থাবার নিচে)

(ছ) কিছু কিছু প্রশ্নচিহ্ন ঝুলেছিল বিষপোকা আমার শরীরে।
(তোমার মুখের দিকে, অন্ন অশ্রু ভায়োলিন)

(জ) উলের বলের মতো হাঁটু যেন র‍্যাফেলের দাড়িহীন জোসেফের মুখ।
(ওয়াক্সবাথ, ভাসানদরিয়া)

(ঝ) সংবাদপত্রই আমি পড়ে যাই দ্রৌপদীর শাড়ির মতন।
('তাকানো তার মধ্যে দিয়ে', ভাসানদরিয়া)

শব্দ ব্যবহার এবং নির্বাচনে গণেশ বসুর কবিতায় বেশ কয়েকটি মাত্রা আবিষ্কার করা সম্ভব। এক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্যময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বেশ কিছু কবিতায় কবি দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেন। আবার কোথাও কোথাও একাধিক ভিন্নার্থক অথবা সমার্থক শব্দকে জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ বিজাতীয় অর্থে তাকে ব্যবহার করেন। যেমন—

(ক) দ্রাবিড়দ্রাঘিমাচোখে, অক্ষম চিৎকার?
(খ) ধমনীনিদ্রিতসিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে।
(গ) দাঁতালশুয়োরঈর্ষা জ্বলে তার ক্ষমতাবিহীন।
(ঘ) কীসের দমকে দাবি যৌবনের
সংঘর্ষবিনয়জয়ভালোবাসা।
(ঙ) এমন সময় গর্জে ওঠে
ইতরঅরণ্যদীপ্রদাবানল
(চ) তরাইতৃষ্ণারচরে রক্তিম উল্লাস
(ছ) অশ্রুভালোবাসাবাসি
সত্তরের ঘূর্ণি ঠোটে...
(জ) কালো বেড়ালের পেটে চলে যাবে ঝড়বৃষ্টিআগুনহতাশা ?...

এ-সবের পাশাপাশি যন্ত্র ও বিজ্ঞান-সম্পর্কিত শব্দের ব্যবহার করেছেন। গণেশ বসু তাঁর কবিতায়। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় মনে করেন "সম্ভবত গণেশ বসুই প্রথম তরুণ কবি যাঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক নানা পরিভাষা চিত্রকল্পের রূপ নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।" এ-রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

(ক) পায়ে হাতে ধরা বোঝো? হাড়ে হাড়ে কান্না জমে, কেউ কিছু
বলতেও পারে না,
প্রিপেট এবং এইচপিএম্পসি পিসিআর পিসিআর
ক্রোমাটোগ্রাফিও।

(খ) হাইটেনশান বিদ্যুতে দুর্জয়
(গ) বুলডোজারের
প্রবলতা এ বন্ধ্যাভূমির
চারদিকে
(ঘ) আবাদে ফসল তোলে রাশি রাশি আমাদের ক্রেনের উচ্ছ্বাসে।
(ঙ) চোখের তীব্র মণিস্ক্রীনে...
(চ) দামার স্মৃতির ঠোটে ক্ষিপ্তমুখ আর্মেচার বেল্টে দাপায়।
(ছ) ব্যাটনবিদ্যুতে ভাড়া গুটিকয় কঙ্কালের দাঁত।
(জ) কৃষ্ণার জেটিতে প্রপেলার।

এ-ছাড়াও 'DNA',–'RNA',– 'ব্লাডপ্রেসার', 'লোকাল অ্যানিস্থিসিয়া' 'ওয়াক্সবাথ' — এ-জাতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুষঙ্গে আসা শব্দগুলোর প্রয়োগ ফিরে ফিরে এসেছে কবির কবিতায়।

তবে শব্দ-ব্যবহারে লৌকিক কিন্তু সাহিত্যে অপ্রচলিত শব্দের দিকে কবির ঝোঁক সর্বাধিক। 'তিরিক্ষে মেজাজ', 'মিড়ে মিড়ে', 'ইলিশগন্ধা, 'খবুট', 'হাজামজা'

ডোবা, 'খলসে', 'মুই খলসে', 'কাবাব মে হাড্ডি', 'চিড়িক পিড়িক', 'আদাড়পাদাড়ে', 'ফককারাম', 'ঘন্টুরাম', 'মস্তি মারছে, 'উড়নচণ্ডী', 'ধ্যাস্টামো', 'পালটি খায়' — এ ধরনের একেবারে লৌকিক কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে প্রান্তিক এবং ব্রাত্য শব্দেরা গণেশ বসুর কবিতাকে একটি বিশেষ সর্বজনীন ইমেজ দিয়েছে।

গণেশ বসুর কবিতার ভাষা জনগণের মুখের ভাষার কাছাকাছি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করতে পিছু পা হয়না। লৌকিক শব্দের ব্যবহারে এ ভাষা হয়ে উঠেছে সমাজের প্রান্তবাসী জীবনের দর্পণ। ভাষিক কাঠিন্য বা ধ্রুপদী মায়ায় সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণুদের ভাষার মতো তা জনগণের কাছে সংজ্ঞাপনের সূত্রবিচ্ছিন্ন হয়নি। আর ঠিক সে দিক থেকেই জনগণের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার তাগিদে তাঁর কবিতার শরীরে সংবাদের ছাপটিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। নিপুণ সাংবাদিক প্রজ্ঞা এ কবিতাগুলোকে কালের ক্ষতে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সেদিকে তাকিয়ে কবি বলতেই পারেন—সংবাদ মূলত কাব্য।

গণেশ বসু আরম্ভ করেছিলেন সেই ষাটের দশকে। হাংরি আন্দোলন, শাস্ত্র বিরোধী আন্দালনের বর্ণমালা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। তিনি বরং ব্যক্তিজীবনের কথা বলতে বলতে, প্রেমের গান গাইতে গাইতে চলে গিয়েছিলেন এক সামষ্টিক গণজীবনের মাঝখানে। সেখান থেকেই কালের ঝোড়ো হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের সংকট ও মাত্রাহীনতা সম্পর্কে জনজীবনকে সচেতন করে যাওয়ার লড়াই করে যান। 'John Duan'-এ লর্ড বায়রণ ঘোষণা করেছিলেন আমি সমস্ত প্রস্তরখণ্ডকে শেষ পর্যন্ত শেখাব পৃথিবীর স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহে রুখে দাঁড়াতে। গণেশ বসু প্রায় একই সুরে জীবনকে ভালোবাসে অন্তহীন লড়াই-এ জীবন ভাসিয়ে দেন—

"লড়ছি কারণ শিরায় ভালোবাসার ডাগর সাধ
লড়ছি আমি, লড়াই আমার রৌদ্রহাতিয়ার।"

(রৌদ্রহাতিয়ার, অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলা)

স্বেচ্ছাচারী আলোময় অদ্ভুত আঁধার

ঋতম্ মুখোপাধ্যায়

'আমি একজন কবি। তাতেই আমি আলাদা। কবিতাই আমার বিষয়— বাকিটা শুধু ভাল শব্দ খুঁজে পাওয়া।' (ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি)

যে যাই ভাবুক, আমাকে বলতেই হবে,
জীবনানন্দের থেকে অনেক অনেক দূরে সময় সরেছে
তবু কিছু জমা থাকে কোল্ড স্টোরেজেই।

ক্ষমা করো।

গভীর প্রেমের মতো আলোড়ন, অবচেতনার ছায়া, রহস্যের ঘেরাটোপে সেসব
কবিতা অদ্ভুত শীতল,
অন্য মহাদেশ। (জীবনানন্দ, বর্ণময় পৃথিবী, ২০১৩)

রবীন্দ্রোত্তর নয়, আমরা কি তবে জীবনানন্দোত্তর বাংলা কবিতার কথা ভাববো এখন? ষাটের অশীতিপর কবি গণেশ বসুর উৎকলিত কবিতাটি পড়লে তেমন একটা আভাস যেন টের পাই আমরা। তাঁর সাম্প্রতিক দুটি কাব্যে (বর্ণময় পৃথিবী, বল্‌গা হরিণের শিং) অদ্ভুত আঁধারের যে কথকতা, তাকে তিনি উত্তর-জীবনানন্দীয় প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে চান। আসলে গণেশ বসুর কবিতাবলী প্রেম ও রাজনীতিকে একবৃন্তে ধারণ করে হয়ে উঠতে চায় তীক্ষ্ণ আয়ুধ। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'র রোম্যান্টিক উত্তরাধিকার আপাতত শেষ কাব্যেও বহন করে বলেন কবি 'তোমার জন্য রেখেছি নক্ষত্রপুঞ্জ বন্দি করে আমার অস্থিতে'। অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী শাসকের প্রতি আনুগত্যে নয়, শিরদাঁড়া খাড়া রেখে তিনি প্রতিবাদের অঙ্গীকার করেন : 'কোমায় আচ্ছন্ন শুভবোধ, ভবিষ্যৎও ভয়ঙ্কর, তবু যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে পারি না'। ব্যক্তিগত জীবনে মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কবি শিল্প ও সৌন্দর্যকে নিছক আনন্দের উপকরণ ভাবেন নি, তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। ক্ষমতার কাছে নত হয়ে নয়, ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি আমাদের বিবেকের সহচর হয়ে ওঠেন। দেশজোড়া উন্মাদ আশ্রমের মধ্যে দাঁড়িয়েও ভাঙাচোরা আলো হয়ে জেগে থাকে কবি ও কবিতা।

। ২।

'ক্ষমতার কাছে গেলে কবি আর কবি-ই থাকে না' (দ্র. বর্ণময় পৃথিবী) অমোঘ এই উচ্চারণে গণেশ বসু সমকালীন সাহিত্যজগতে আনুগত্যের রাজনীতিকে বিদ্রুপ করেন। যদিও সেই বিদ্রুপে মিশে থাকে নিবিড় বেদনা। তাঁর 'অথ প্রভুপাদকথা' কবিতাটি ক্ষমতাবান জনৈক কবির দ্বিচারিতাকে ঠাট্টা করেছেন 'হিসেব কষেও কেউ মিথ হতে কখনো পারেনি প্রভু, অথবা কিন্নর, পারেনি কখনো হতে/আলোর উন্মাদ।/আমার প্রভুকে আমি চিনি, আবার চিনি না'। একই সুর শোনা যায় তাঁর 'জেব্রারা বেরিয়ে পড়ে' এবং 'ঘুঙুর' কবিতায়। এই চিড়িয়াখানার মতো সমাজে মেধাজীবীরাও রঙ বদলায়, তাই শাসকের বৃত্তের ভিতরে পৌঁছে গেলে পাওয়া যায় সব। কিন্তু সেইভাবে পায়ের ঘুঙুর হয়ে বেঁচে থাকা কবির কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং মানুষকে পাশে নিয়ে মানুষকে ভালোবেসে তিনি সাদামাঠা জীবনকে বরণ করে নেন, বলন 'ভাঙা কাপ আমার ঈশ্বর'। 'বল্‌গা হরিণের শিং' কাব্যের প্রথম পর্বে ছোট-বড় একাধিক কবিতায় তাঁর রাজনীতি সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে সাম্প্রতিক শাসক, তাপসী মালিকের মৃত্যু, সিঙ্গুর-লালগড় মিলেমিশে আমাদের শোনাতে চায় এক ছিন্নমস্তা শাসনতন্ত্রের গল্প। যেখানে টেনিসবলের মতো মানুষের মাথা নিয়ে খেলে শাসকহৃদয়। 'এইভাবে বাঁচা আর না-বাঁচা সমান অর্থহীন' বলে তিনি হাহাকার করেন। উজ্জ্বল এই নৈরাজ্য যেন ইয়েট্‌সের 'দি সেকেন্ড কামিং'-এর সেই উচ্চারণ 'Mere anarchy is loosed upon the world'। তবু ওরই মাঝে মুক্তির পথ খোঁজেন দ্রষ্টা কবিরা, আস্তিক ইয়েটস্ খ্রিস্টীয় পুনরাবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর নিরীশ্বর এই বাঙালি কবি যে কবিতালোক সৃজন করেন, তার গভীরে সাহসী হৃদয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন রচিত হয়।

। ৩।

প্রথম কাব্যে যিনি উচ্চারণ করেছিলেন 'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার', তিনিই বার্ধক্যে এসে বলেন 'তবু যদি দিতে চাও শেষ উপহার/দিতে পারো তোমার বাহুর মধ্যে ছুটে যেতে' কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো। বৃষ্টিকে শিকড়ে ধারণ করে কবি প্রেমহীনতার দাহ ভুলতে চান। যদিও তিনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবী শাসন করে ভালোবাসা আর অশ্রুময় অনুশোচনা। তাঁর কবিতায় শূন্যতার নানা স্বর শুনতে পাই দ্বিতীয় কাব্য থেকে আপাতত শেষ কাব্যে। সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে ভয়ংকর শূন্যতাকে পাশে নিয়ে কবি হেঁটে চলেন, যেখানে বোবা না হয়েও বোবা সময়, স্বদেশ, আবেগ ও আগুন। কবি দেখেন 'বোবা না হয়েও বোবা রাস্তা ও পতাকা'। তবু স্মৃতিচিহ্ন রূপে ধরে রাখেন শূন্যতাকেই। সেই শূন্যতার রঙ

খুঁজতে গিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে বলেন 'শূন্যতার রঙ বুঝি শূন্যতাই চেনে'। এই শূন্যতার বোধ তাঁর মনে মৃত্যুচেতনাকে জাগিয়ে তোলে। মৃত্যুকেই একামাত্র সত্য ভাবেন কবি, সম্ভ্রমে বলেন : 'মৃত্যু হলো মন্দাক্রান্তা ছন্দের দোসর/রহস্যের সেরা শিল্প, নিবিড় সম্ভ্রম'। জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুকে বিশল্যকরণী বলেন। শ্মশানস্থলীতে নিজেকে নিঃস্ব করে দিতে চেয়ে কবি একতারা হাতে বিনীত বিদায় চান। এইসব শূন্যতার বোধের মাধ্যমে একাকিত্ব ও মার্কসীয় বিযুক্তিকে ছুঁয়ে কবির লেখনী নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। 'নাথিংনেস' নামক যে-শূন্যতার দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অস্তিত্ববাদীরা, তাকেও যেন কবিতায় রূপায়িত করেন কবি। এই শূন্যতার দর্শন আমাদের অস্তির নিরিখেই বিচার্য। হাইডেগার বলেন : 'Human existence cannot have a relationship with being unless it remains in the midst of nothingness' (What is metaphysics– 1929)।

আর জাঁ পল সার্ত তাঁর অস্তিত্ববাদে অস্তির (thingness/being) এর বিপরীতে এই নাথিংনেস-কে স্থাপন করেন। আবার অ্যাবসার্ডবাদী কাম্যু দেখেন, এই অমূর্ততা ব্যক্তিমনে বা বস্তুতে নেই, তা উদ্ভুত হয় চারপাশের পরিস্থিতি থেকে, সঙ্ঘাতের ভিতরেই এর জন্ম। যদিও শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ববাদ চায় অস্তিত্বের সংকটকে দূর করে মানুষের স্বাধীনতা বা মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের কবিতা 'প্রথম দিনের সূর্য' 'তোমার সৃষ্টির পথ' ইত্যাদিকে সত্তাবাদের নিরিখে পড়াই যায়। অবশ্যই পড়া যায় জীবনানন্দের 'বোধ' বা 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো কবিতাকেও। আর তাঁদের উত্তরজাতক গণেশ বসু লেখেন :

প্রার্থনার মতো সব শূন্য আজ
অথচ আমিও মোটে শূন্য নই, অবাধ অসীম
ভাঙাচোরা আলো। (ভেঙে ভেঙে যায় আলো)

আরেকটি নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন জীবনানন্দের মতো দেখতে পারেন না কবি। খড়ির গণ্ডিতে বন্দি হয়ে হারানোর ভয় তাঁকে তাড়া করে ফেরে। তবু জানেন 'কেবল দেয়াল নেই শিশুদের, কেবল দেয়াল নেই প্রজাপতিদের'। সেই মুক্তির আস্বাদটুকু মনে লেগে থাকে তাঁর। এমন এক উজ্জ্বল নৈরাজ্যপীড়িত সময়ে এও একরকম আত্ম-উন্মোচন বলা চলে।

। ৪।

'বর্ণময় পৃথিবী' (২০১৩) থেকে 'বল্‌গা হরিণের শিং'(২০১৫) — আপাতত শেষ এই দুই কাব্যে গণেশ বসুর কবিতা যেমন সময়ের জ্বলন্ত অভিজ্ঞান তেমনই আঙ্গিক সচেতন। বিশেষত পাহাড়ী বল্‌গা হরিণের শিঙের আঁকাবাঁকা গঠন আর

লড়াকু স্বভাব তাঁর কবিতার শরীর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাই। কখনো এক বা দু-লাইনের অণুকবিতা, কখনোবা দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন কবি। ছোট লিরিক তো রয়েইছে একাধিক। বিদ্রুপ আর বেদনা যুগপৎ তাঁর কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। জখম বেঞ্চি আর জংধরা ক্রাচ— উভয়েই তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে। টীকাসহ ১৬০ পাতা ব্যাপী 'বল্‌গা হরিণের শিং'-এ অতিকথনের দোষ যে নেই, তা বলা যায় না। মোটামুটি সমগ্র কাব্য জুড়ে প্রতিবাদ, প্রেম আর কবির বেদনা বিকীর্ণ হয়েছে দেখি। তবে ভালো লাগে পর্যায় বিভাগ করে কবিরতাগুলির সজ্জা:

১) হাঙরের দাঁতে দাঁতে উদারীকরণ খেলে উদরীকরণে
২) সারাটা জীবন যেন তুষের আগুন
৩) যত মানচিত্র থাক অন্ধকারে সবই অর্থহীন
৪) মহাভাষ্য বৃদ্ধাশ্রম বিস্মৃতিই অজেয় আশ্রয়
৫) প্রজ্ঞা নেই, অন্ধকার/রহস্যটাই সভ্যতার

পর্যায়ের নামকরণগুলি কবিতাগুচ্ছের মেজাজকে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। কবি এই কাব্য উৎসর্গ করেছেন পঞ্চাশের মেধাবী কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে, যাঁর কবিতায় বিশ্বের মানচিত্র পাঠকের মনচিত্রে ধরা পড়ে। আর হয়তো সে-কারণেই এ-কাব্যে বিশ্বকবিতা ও দেশ-বিদেশের অনুষঙ্গ এসে পড়েছে। গ্রন্থ শেষে টীকা সংযোজনের উদ্দেশ্যও বোঝা যায়। গ্যালিলিও, মেকিয়াভেলি, মার্কস, এঙ্গেলস্, মাও, কুইসলিং, রাজকার, হিলারি ক্লিন্টন, মেরিলিন মনরো, শেক্সপিয়র, শেলি, কবি চার্লস বুকোওস্কি, সুইডিশ কবি এভা স্ট্রম, মার্কস পত্নী জেনি, বিষ্ণু দে, বেগম রোকেয়া, বুনো রামনাথ, যামিনী রায় প্রমুখ তাঁর কবিতার অনুষঙ্গে এসেছেন; যাঁদের অনেকেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় টীকায় রয়েছে কবিতা ধরে ধরে। এমনই একটি কবিতা 'আলোকস্তম্ভের মতো'। সেখানে মার্কস ও তাঁর পত্নী জেনি মার্কসের সমাধি খুঁজতে খুঁজতে কবি মার্কসের কবিতায় আশ্রয় খোঁজেন আর শেষে মোবাইলের আলো জ্বেলে অবহেলায় পড়ে থাকা সমাধি খুঁজে পাওয়া যায়, কবি পড়েন সমাধিলিপিও। প্রশ্নাতুর হন 'এখানে য়েনির সমাধি ছিল কি কোনোকালে'? শোনা কথা, চুরি হয়ে গিয়েছিল মার্কসের কফিন। কবির প্রশ্ন 'চুরি হয়ে গেলেও কফিন মনীষা কি চুরি যায়, মার্কসের মগজ'? মার্কস ও তাঁর বিচক্ষণ পত্নীর সমাধিভূমিতে কবি খুঁজে পান 'আলোকস্তম্ভের মতো জীবনের প্রার্থনা'।

এমনই আরও কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা আমরা পাই, যেখানে কবির কলমে বিশ্বকবিতা ও রাজনীতির প্রসঙ্গে শিল্পিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন : ক্ষমতা, অথ মেষতন্ত্রকথা, চোখে চোখ রেখে, দাঁড়াও পথিক বর। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ইতস্তত চয়ন করা যেতে পারে :

১) ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফসফরাস মানুষের মুখ,
নক্ষত্রপুঞ্জের মতো মানুষের চোখ
আগে আগে
স্বপ্নের ব্যানারে যায় ঢেউ
লাঠি হাতে কবি
গান্ধি নেমেছেন যেন পুনরায় ডাণ্ডি অভিযানে
'Poets are the unacknowledged legislators of the world'.
(ক্ষমতা)

২) মানুষের প্রজ্ঞা
মেধা
বোধ
এভাবেই একরঙা বলয় ঘিরেই
দেশে দেশে মেষতন্ত্র পুঁজির খোঁয়াড়ে...
(অথ মেষতন্ত্রকথা)

৩) চীনে নয়া পুঁজিবাদ
ইতালিতে মাফিয়া বিস্তার
সাহিত্যে এখনও সেই পশ্চিমের ছোঁয়া
কবিতার মতো কোনো কবিতাই নেই
মানমন্দিরের চুড়ো খাঁ খাঁ করে
ঝরে পড়ে তারার যন্ত্রণা
যা নেই তা নিয়ে হোক সকলের শিল্প সাধনাই
[লাও-সে (চোখে চোখ রেখে)]

৪) বাতাসে কম্যান্ড ...., দাঁড়াও পথিক-বর! দাঁড়িয়ে পড়তেই—
অবাধ বিদ্যুৎ জ্বলে বৃষ্টির ভিতরে
অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটা এদেশের শিকড়ে শিকড়ে
বৃষ্টির ভিতরে তীব্র আর্তনাদ, অসীম শূন্যতা
Out, out brief-candle
Life is but a walking shadow. (দাঁড়াও পথিকবর)

লক্ষণীয়, ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বা আন্তর্বয়ানযোগ্যতাকে তাঁর কবিতার অনিবার্য অঙ্গ করে নিয়েছেন গণেশ বসু। তাই মার্কস, এঙ্গেলস, হাইনে, শেলি, শেক্সপিয়র, লাও-ৎসে, লেনিন, কাস্ত্রো, চর্যাপদের পঙ্‌ক্তি অনায়াসে তাঁর কবিতায় স্থান করে নেয়। এসে যায় রাজনীতিবিদ হিলারি কিংবা নরেন্দ্র মোদীর বাচনও। আবার

জীবনানন্দ দাশের একাধিক পঙ্‌ক্তিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন কবিতায়, কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইরকম :

১) যাঁদের ধর্মই আছে শকুনের খাদ্য হল তাঁদের হৃদয়। (প্রার্থনা)

২) গভীর গভীরতর অসুখ তখন নামে আমাদের চিড়িয়াখানায়।
(জেব্রারা বেরিয়ে পড়ে)

৩) তুমি কি কখনো লেখা ভুলেও পড়েছো বলো পিত্তল প্রতিমা?
(কিছুই করার নেই)

৪) এরই মাঝে/কবিতার/ক্রমমুক্তি ঘটে/এরই মাঝে/ফণা তোলে মেঘ...
(চোখে চোখ রেখে)

৫) কল্লোলিনী আমাদের অশ্রু ঘাম ভালোবাসা বিবাহবিচ্ছেদ। (ক্ষমতা)

৬) অবাধ ক্ষমতা পেয়ে কমিশন স্বেচ্ছাচারী আলোময় অদ্ভুত আঁধার।
(নির্বাচন এসে গেলে)

কবিতায় পূর্বজদের আত্মস্থ করে কবি সময়ের চোখে চোখ রাখেন, হাহাকার করে বলেন 'রবীন্দ্রনাথের দেশে লাশ হয়ে পড়ে থাকে গণতন্ত্র আজ।' তবু লেনিনের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে মার্কসবাদী কবি বিশ্বাস রাখেন 'কল্পনার বসন্ত আদতে/এক পা এগিয়ে, দুই পা পিছিয়ে লেনিন/স্বাধীনতা/এবং কবিতা'।

। ৫।

স্যুররিয়ালজম যেমন অবচেতনের তথা মগ্ন চৈতন্যের ভাষাকে চিত্রে ও কবিতায় ধরে দেয়, তেমনি কিউবিজম চায় রেখা ও রূপের আশ্চর্য সম্মিলন। উনিশ শতকের ফরাসি কবি আপলিনের ঘোড়া কিংবা বৃষ্টি নিয়ে লেখা কবিতাকে চিত্রময় করে তুলেছিলেন। আমাদের ষাটের বাংলা কবিতার জগতে শ্রুতি আন্দোলনের রূপকারেরা কবিতা দিয়ে ছবি আক্ষরিকভাবেই ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন। আমাদের গণেশ বসু ষাটের কবি। তাঁর এই আপাত শেষ কাব্যের একদম শেষ অংশে এমন পাঁচটি চিত্রল কবিতার দেখা মেলে। যেমন, সেমিকোলন আর নিম্নমুখী তীরচিহ্ন সাজিয়ে লেখেন 'এবং মেঘেরা' কবিতা, যার একটিই পঙ্‌ক্তি 'মরমি মেঘেরা খোলস ছাড়ে' — মেঘ এখানে মানুষের রূপক। আবার 'ভালোবাসা' কবিতায় জিজ্ঞাসাচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন এবং ঊর্ধ ও নিম্নমুখী তীরচিহ্নগুলির এলোমেলো বিন্যাসে জানিয়ে দেন 'উপেক্ষার অদ্ভুত সরণি'। অনুরূপভাবে 'সংবিধান', 'বুদ্ধিজীবী', 'স্বর্গ পুড়ে যায়' কবিতা তিনটিতে যথাক্রমে অসমান বৃত্ত, উল্লম্ব ও আনুভূমিক ড্যাশ, তীর, কোলন ইত্যাদি চিহ্ন এবং অন্ধকার ঘনক এঁকে অর্থকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। প্রতিটি কবিতার নাম

ও একটি লাইন নিয়ে দুটি মাত্র লাইন প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমেই পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব।

একালের পোস্টমডার্ন কবিদের কবিতাতেও এই চিত্রময়তার প্রয়াস লক্ষ করা যায়, এতে আঙ্গিকের নতুনত্ব আছে। চিলির নেরুদা-পরবর্তী কবি অ্যান্টি-পোয়েট্রির অন্যতম প্রবক্তা নিকানোর পাররাকেও আমরা এ-জাতীয় কবিতা লিখতে দেখেছি। এছাড়াও আবার কোথাও বা শব্দসজ্জা দিয়েই আঁকেন নিঃসঙ্গতার ছবি :

চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ...
নিঃসঙ্গ বয়স
ব
য়
স (বয়স)

তবে এই চিত্রল কবিতা ছাড়াও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে গণেশ বসু পুনরাবৃত্তির নীতিতে বিশ্বাসী। শৈলীতত্ত্বে একে চল ও চালকের বিন্যাস (PCOB) হিসেবে দেখানো হয়। যেখানে বাক্যের একটা অংশ অপরিবর্তিত রেখে অপর অংশটিকে পালটে পালটে কবি তীব্র অভিঘাত নির্মাণ করেন। তাঁর কবিতা থেকে পাওয়া দু'টি দৃষ্টান্ত এইরকম :

১) আমাদের জানা আছে কীভাবে মিডিয়া নাচে পুঁজির বিলাসে
আমাদের জানা আছে গণতন্ত্রে স্বৈরাচার কীভাবে পতাকা তুলে ধরে
আমাদের জানা আছে সংকটের মধ্য দিয়ে কীরকম এদেশ চলেছে
(কুশল কামনা করি)

২) কৃতজ্ঞতা ফিরে আসে সমুদ্রের কাছে;
কৃতজ্ঞতা ফিরে আসে পাহাড়ের কাছে;
কৃতজ্ঞতা ফিরে আসে জীবনের কাছে। (দাঁড়াও, পথিক-বর)

এছাড়াও গজল্লা, খচরামি এ-জাতীয় মুখের চলতি শব্দকে তুলে আনেন কবিতায়। পদ্য ছন্দের চেয়ে আস্থা রাখেন গদ্যছন্দে, মাঝে মাঝে লেখেন দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির কবিতাও। বর্ণপ্রতীকের ব্যবহারেও তিনি সাবলীল; তাই 'বর্ণময় পৃথিবী'র 'নীল' কবিতার নীল বর্ণ হয়ে ওঠে প্রথাগতভাবেই বেদনার অভিজ্ঞান ('এখন শরীর নীল, নীলপদ্ম থরে থরে মর্গের চাতালে')। অন্যদিকে 'বল্‌গা হরিণের শিং'-এ 'লাল' কবিতায় লাল রঙকে সর্বত্রব্যাপী দেখেন, যা তাঁর মার্ক্সীয় বিশ্বাস ও বিপ্লবী চেতনার চিহ্নবাহী হয়ে ওঠে ('লাল নেই? লাল আছে সর্বত্রই, এবং রয়েছে তা-ও/জ্বলন্ত চাকায়')।

। ৬।

'বল্‌গা হরিণের শিং' কাব্যে এই বিশেষ রূপকল্পটি বেশ কয়েকবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন কবিতায়। কখনো লেখেন 'ঘড়ি ছিল প্রতিপক্ষ, প্রতিটি দরোজা ছিল বল্‌গা হরিণের শিং', কোথাও বা বলেন 'মৃত্যু যেন খেলা করে হরিণের তরবারি শিঙে' কিংবা 'বল্‌গা হরিণের শিং হয়ে আছি, ভালো নেই, বিশল্যকরণী নেই, কণ্ঠে মিশে আখ্‌তেওন আছে'। আখতেওনের মতো বীর শিকারীর অভিশাপে হরিণ হয়ে যাওয়া যেন আমাদেরও নিয়তি। শিং হয়তো আত্মরক্ষার সহায়ক কিন্তু সভ্যতার ক্রুর নেকড়েরা হরিণকে খাদ্য বানাতে সদা উৎসুক। কাব্যের শুরু হয় 'নেকড়ের দাঁতের মধ্যে শাসকের সূর্যোদয় চিরকাল ঘটে' আর শেষে পাই 'নেকড়েরাও লজ্জা পায় সভ্যতার আশ্চর্য আঁধারে'। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ সন্ত্রাসের চোখরাঙানি দেখতে দেখতে কবি স্বর্গ পুড়ে যাওয়ার বেদনায় ব্যথার্ত হন। নেরুদার মতো কবিতাকে প্রতিটি লোকের জন্য জরুরি অন্ন ভেবেও বিশ্বাস করেন 'শব্দই কবিতার কারু'। সমকালের বিভীষিকাই আমাদের ভবিষ্যৎ মেনে নিয়েও শেলির মতো কবিতায় ধরে দিতে চান নিজের বিশ্বাস আর হৃদয়ের নন্দিত মুহূর্তমালাকে, হতে চান কালের শিক্ষক। বলেন, এক পা এগিয়ে আর দুই পা পিছিয়ে কবিতা মগজ ও হৃদয়ের যুগলবেণী রচনা করে। কবির এই উচ্চারণে আমরাও তাঁর সহপথিক হই :

কী দেয় কবিতা?
কবিতা তো রুটিভাত নয়।
কবিতাই ধরে দেয় সমস্ত আকাশ।
আবার কুড়িয়ে নেয় বিষণ্ণ ঋতুর ঝরাপাতা।

কবিতা তাঁর 'জীবনের বেলাশেষের ধুলোবালির কিছু আলো-অন্ধকার', মানেন কবি। তবু এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর আদৌ আছেন কিনা এই প্রশ্নও জাগে তাঁর মনে। এই অসুখী সময়ে তাঁর দেখা নেই কেন তবে? পূর্বজ ঈশ্বর-ভাবুক কবি অলোকরঞ্জনও এই মিলেনিয়ামে ঈশ্বরের ভাবমূর্তি বজায় রাখা নিয়ে চিন্তিত

দেখি। প্রথম যৌবনে 'বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে' উচ্চারণের পরেও একুশ শতকে এসে তাঁকেই বলতে হয় : 'একটু একটু অনীশ্বর হয়েছি, এখন অস্থি জুড়ে/প্রেতপিশাচের দল ডম্বরু বাজায় শর্বরীতে' (ভাবমূর্তি)। অনুজ কবিরও মনে হয় 'দেখেছি ঈশ্বর গড়াগড়ি খাচ্ছে ধর্ষিতার চোখের তারায়'। কবি চলার রাস্তাকে ঈশ্বর ভাবেন কিংবা বলেন 'মৃত্যুই ঈশ্বর যদি মৃত্যু ধ্রুবপদ' অথবা 'মানুষ থাকে মানুষ,/ঈশ্বর মারা যান,/মিথ্যে কথার ফুলঝুরিতে দিনগুলি খানখান'। এখানে তাঁকে কিছুটা মায়াকোভস্কির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনিও ভাবতেন সম্মিলিত যাত্রার কথা, সেখানে দৈবকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন 'Our God is speed / The heart is our drum.'] আমাদের মানবপ্রেমিক কবি বল্‌গা হরিণের শিঙের অদ্ভুত প্যাঁচে খুঁজে পান জীবন-মৃত্যুর অগ্নিদহন। আর সেই দহনদানে কবি গণেশ বসুও আমাদের সহনেশ্বর হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি সেই শব্দের কারিগর, যিনি এই অদ্ভুত আঁধারেও সাহসী মন নিয়ে ভাবতে পারেন :'লেখা ছাড়া কিছুই করার নেই নিরন্তর উপেক্ষায়, লিখে যাব ততদিন যতদিন মৃত্যু এসে থাবা না বসায়!'।

ঋণস্বীকার :

১) বল্‌গা হরিণের শিং। গণেশ বসু। ২০১৫। কবিতা সীমান্ত। কলকাতা
২) গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ। জয়গোপাল মণ্ডল সম্পাদিত। জানুয়ারি ২০২০। দিয়া পাবলিকেশন। কলকাতা
৩) সত্তাবাদের প্রেক্ষিতে কিয়েরকিগার্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সার্ত। সান্ত্বনা মজুমদার। জুলাই ২০১২। দি এশিয়াটিক সোসাইটি। কলকাতা
৪) আধুনিক কবি, কবিতার শৈলী। উদয়কুমার চক্রবর্তী। ১৯৯৭। উত্থক প্রকাশনী। কলকাতা
৫) পদ্যপত্র : শ্রুতি। সম্পাদক : অর্পণ পাল। ২০১৪ (বিশেষ সংখ্যা) এবং উইকিপিডিয়া এবং অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

অপরাহত প্রজাপতি : গণেশ বসুর অগ্রন্থিত কবিতা

জয়গোপাল মন্ডল

সেপ্টেম্বর ১৯৭০, প্রকাশিত হল দুই বাংলার প্রথিতযশা কবিদের কবিতা নিয়ে 'স্বনির্বাচিত' কবিতার সংকলন। স্মরণে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং এপার বাংলার অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে ওপার বাংলার জসীমউদ্দিন, কায়সুল হক, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ প্রমুখ এমন ষাটদশক পর্যন্ত প্রথম সারির কবিদের কবিতা ও তাঁদের ছবি দিয়ে অভিনব সংকলন। নির্বাচিত কবিতার সাথে সাথে আছে কবির নিজস্ব অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিও। এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে ষাট দশকের বলিষ্ঠ ও প্রতিশ্রুতিমান কবি গণেশ বসুর কবিতা 'সমুদ্রমহিষ'। যে কবিতা পাঠের অভিব্যক্তিতে কবি বিষ্ণু দে লিখেছেন "তখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ/নীলে লাল আহিরভৈরবে,/আর দশপ্রহরণ হাতে হাতে তুলে দেয়/তোমার কাব্যে যিনি মরণমর্দিনী।" না, কবি বিষ্ণু দের এ কাব্য-প্রশস্তিপত্র তাঁর কবিতা সমগ্রে মুদ্রিত হয় নি। তবে পঞ্চাশ বছর আগের এ লেখায় কবি গণেশ বসুর কবি-জীবনের মূল সুর নির্ধারিত হয়ে গেছে। ব্যক্তি মানুষের সুখ সন্ধান নয়, অন্তরের গহনে গুমরে ওঠা আপোসহীন সংগ্রাম। কালের পালাবদলে কিংবা ব্যক্তি সুখের সবকিছু পেয়েও না পাওয়ার যন্ত্রণা আজও হেঁচকি তোলে আত্মবীক্ষায়। দেশ, দেশের মানুষ, মানুষের স্বাধীনতা কেমন যেন বিব্রত করে তাঁকে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে। এমনই কবি স্বনির্বাচিত কবিতার সংকলনে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা পাঠকের জানা কর্তব্য। "কবিতা হঠাৎ আবেগের ফেনায়িত উচ্ছ্বাস নয়। কবি-ব্যক্তিত্ব তাতে সক্রিয়। সমাজ তাই কাব্যে প্রতিফলিত। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও তার সারাৎসার কাব্যের উপকরণ। সোজাভাবে বলা যায়, কবিতা হচ্ছে রোজকার ঘটনার সবচেয়ে সক্রিয় এবং সম্ভবত অব্যর্থ শিল্প আঙ্গিক। ফলে যথার্থ কবিতায় বর্তমান শতকের ক্ষোভ ক্রোধ জিজ্ঞাসাকে যেমন, তেমনি আগামী দিনের প্রশ্নকে, সম্ভাবনাকেও মূর্ত হতে দেখা যায়। কবিতা হচ্ছে বিশ্বজনীন শিল্পেরই নান্দনিক ফসল। রৌদ্র হাতিয়ার।" (স্বনির্বাচিত : সেপ্টেম্বর ১৯৭০/পৃষ্ঠা— ২০৬)।

এ প্রস্তাবনা গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মতো। কবি গণেশ বসু যে কথা বুক চিতিয়ে গর্ব করে ঘোষণা করেছিলেন সত্তরে সে পথে তিনি আজও অবিচল ও পরাক্রমশালী। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশে যে কবিতাকে জীবন ও জগতের রাজনৈতিক ও সামাজিক হাতিয়ার করেছেন, ডাক দিয়েছিলেন সংগ্রামের, আহ্বান করতেন মিছিলে সামিল হওয়ার এবং তিনি হয়েছিলেন পদাতিক, কবি গণেশ বসু সেই ধারার যেন যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই একবিংশ শতকেও ষাটের কবির বিশ্বাস— দর্শন একটুও টোল খায় নি। তাঁর সাম্প্রতিক ও অগ্রন্থিত কবিতাগুলি একত্রিত করলে দেখবো সময়ের সুয়োরানি ও দুয়োরাণি কবিতার পরতে পরতে কেমন নীরব ও সরব প্রতিবাদের ঢেউ তুলছে। যে প্রেম তাঁর কাব্যস্পন্দনে দেশপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়, সেই প্রেম আজও অটল প্রতিমার মতো কবিতার অঙ্গনে মূরতি লাভ করে। দেশের বিষণতায় ও বিপণতায়, মানুষের বিষাদে— যন্ত্রণায়— মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ সতত অস্থির-আর্ত ও অতিষ্ঠ। এই অস্থিরতার জন্যই এখনও কবিতার লালন চলে দৃঢ় পায়।

কালে কালে শাসক বদলায় কিন্তু শাসকের চরিত্র কি বদলাচ্ছে? এই জীবন জিজ্ঞাসার কবিতা 'যোগ্যতা'। সমাজে গাঙশালিকের মতো সাধারণ ব্রাত্য ও উপেক্ষিত মানুষ কেবল হল্লা করে— এটাই তাদের যোগ্যতা। অন্যদিকে বুলবুলির মতো ঝুঁটিযুক্ত সুকণ্ঠী পাখি তথা নাটুকে নেতার দল 'ভাষণ বেচে বাঁচতে চায়'— এই জীবনসত্য যা সভ্যতার সংকটের অন্যতম কারণ। এই নির্মম সত্য উপস্থাপন করে কবি যেন চোখে আঙুলদাদা হতে চেয়েছেন। জীবনের শেষধাপে দাঁড়িয়ে অশক্ত শরীরে অজর জ্ঞানবৃদ্ধ এটুকুই তো করতে পারেন। কবি এখানে অপরাহত প্রজাপতি। বেদনার অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারিত হয় সত্যের অমোঘ কথা :

বাউন্ডুলে বাতাস মাতাল
উড়নচন্ডী ঘূর্ণিতে
অহংকারও তলিয়ে যায়
শীর্ণকায়া চূর্ণিতে
উচ্চমঞ্চ নাগরদোলা
অস্থিরতা কুরসিতে
চমকানিও ফাঁকা বুলি
মেঘমালার খুপরিতে
মহাকালের ঊর্মিতে।

কবি মানবতার পক্ষে। যেসব মহামানব মানুষের জন্যে, দেশের জন্যে আত্মবলিদান দিয়েছেন, শাসককের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে 'স্বপ্ন' ছড়িয়ে দেন 'চৈত্রের বুকে', কবির প্রত্যয়ে উচ্চারিত হয় মানবতার সেই মূর্ত দূতদের জয়গান,

ভবিষ্যতেও যেন গীত হয়। কবি পদ্যের সুললিত কাঠামো ছেড়ে কখনো কখনো গদ্যে লেখেন—প্রত্যাশার বাণী। মানবতার পূজারি কবি তাই প্রার্থনা করেন :

'তৃতীয়ত আমি প্রার্থনা করি যারা লাশ হয়ে আগুনের মুখ
একদিন ছিল, এখনো রয়েছে এবং থাকবে ভবিষ্যতেও
পতাকা যাদের কখনো পোড়েনি, কখনো পোড়ে না, হাত থেকে হাতে
উঁচুতেই ধরে স্বপ্ন উসকে, স্বপ্ন ছড়িয়ে চৈত্রের বুকে
যাদের কণ্ঠে মানবতা ছাড়া কোনোদিন পাপ কখনো ছিল না।
যুদ্ধবিরোধী ইশতেহারের জন্যেও আমি প্রার্থনা করি'

যখন শাসক স্বৈরাচারী হয়, সংখ্যাগুরুর খেল দেখায় তখনও কবির কলমে আঁকা হয় 'অদ্ভুত প্রহসন' এর ছবি। যখন হরিনাম করার কথা, সাধারণ চেতনায় পরকালের চিন্তা গ্রাস করে মনন— তখনও কবি তাঁর জীবনের সেতারে সুর তোলেন ব্যঙ্গের মধুর গান। তাঁর এ বিস্ময় নবজাত নয় অন্ধকারের ভিতর অন্ধকারের পুনর্নির্মাণ :

বসতিকে করা ঘুঘুচরানোর ভিটে,
সংখ্যাগুরুর আধিপত্যের চাঁদ,
দমচাপা ভয়, আগ্রাসী জাতীয়তা,
ধর্মের নামে, শহিদের নামে অদ্ভুত প্রহসন
ক্যাডারের মতো ন্যায়দন্ডের কিম্ভূত কথাকলি,
প্রশাসনও হয় খালাসিটোলার মদিরা মঞ্চ যেন,

কী দরকার! জীবনের প্রান্তসীমায় গা বাঁচিয়ে বিদেশবাসী সন্তানের থেকে ডলার প্রত্যাশী যখেরধন পাহারাদার হওয়ার কথা। তা নয়, কেবল বসে বসে কাটিমারা। আসলে যথার্থ কবির কাজে তাঁর মনন এখনও সক্রিয়। তাই বেদনায় উচ্চারণ করেন, "স্বভূমি এখন ছেঁড়া পালকের মতো"। যখন জীবন থেকে 'মেধা ও মনীষা' বিগত, উপেক্ষার গোপন গহ্বরে মুখ লুকায়, আর পদক প্রদানের প্রহসন কবির মনে বিষাদ গড়ে তখন কবি হতাশাগ্রস্ত না হয়ে প্রত্যক্ষ করেন "আকাশে আগুন, মাটিও আগুনখেকো", হৃদয়ের মুখগুলো ঝলসে যাচ্ছে চড়া তাপে। সময়ের এই করুণ পরিস্থিতিতে কবিমন যন্ত্রণাদগ্ধ। ব্যথিত চিত্তে লেখেন—

বৃষ্টি উধাও, খরায় ধুঁকছে স্মৃতি
বন্দিশিবিরে একরোখা সম্প্রীতি!

এমন সত্য উচ্চারণ আজ ক'জন কবি করেন! হ্যাঁ অগ্রজ কবি শঙ্খ ঘোষ এখনও আছেন, যিনি সরাসরি ঘোষণা করেন, "গণতন্ত্র? গণতন্ত্র তন্ত্র মাত্র, গণ শুধু শোভা"। কবি গণেশ বসুও এমনভাবে চেতনায় ধ্বনিত করেন অনিবার্য সত্য

"বোমা বন্দুক হয়ে কি কখনো শিশুরাই জন্মায়?/রাষ্ট্রেই ঘটে রাষ্ট্রের পরাজয়।" হিটলারি রাষ্ট্র কবির প্রত্যাশিত নয়। তাই তার পরাজয় চান। কবিতার নাম দিয়েছেন '২০১৯', 'পরাজয়'। শুধু তাই নয় কবিতার নাম হয়ে যায় 'ব্রেখট'। ব্রেখট জার্মান কবি ও নাট্যকার। সবাই জানেন। সারাজীবন তিনি মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কট্টরবাদী মার্ক্সবাদী হিসেবে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে জেরার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ১৯৪৭-এ মার্কিন — সোভিয়েত ঠান্ডা যুদ্ধের জের হিসেবে অনেক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁকেও এই জেরার সম্মুখীন হতে হয়। যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে, ক্ষমতার লালসায় কমিউনিস্ট রাজনীতিও বিপন্ন, এদেশেও বাম রাজনীতি ক্রম ক্ষীয়মান, তখনই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত কবি গণেশ বসু আশ্রয় নিচ্ছেন ব্রেখট-এর ভাবনার পরম্পরায়— "মানুষ মানুষই থাকে, মানুষের বদলে মানুষ অমোঘ"— এ সত্য 'দ্বান্দ্বিক নিয়মে' শাশ্বত, 'আবহমানের'।

তবুও কবি দেখেন 'দেশটা তুমুল অন্যরকম'। নিজের স্বপ্নের দেশ কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। কী করবেন কবি? এই চরম সংকটে কি স্বাধীন চিন্তা থেকে দূরে সরে যাবেন? কী লাভ ঘরের খেয়ে বিলেতের মোষ তাড়ানো! তিনি দেখেছেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ। কৈশোরে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন শাসকের অমানবিক আচরণ কতটা অসহনীয় হতে পারে। লক্ষ করেছেন স্বাধীন ভারতের সূচনালগ্নে কী লড়াই করতে হয়েছে— আন্দোলন— বিক্ষোভ। তাঁর প্রার্থিত মুক্তবায়ু কিছুকালের জন্য এসেছিল এই বাংলায়। কিন্তু আবার প্রশ্ন 'সুস্থতা' কি পেয়েছিল এ দেশ? হয়তো কিছুকাল। আবার যেমন ছিলো: "স্বাধীন-চিন্তা নিরুদ্দেশ/পদ্মগোখরো বিষ ছড়িয়ে/সুস্থতাকে করছে শেষ।" কবি সোজাসুজি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন পাঠক, শাসক— সবার দিকে "নির্বাচনিক খোলস পরে/স্বৈরতন্ত্র দাপায় যদি/কীসের গণতন্ত্র তবে?" এ তো সমকালীন সময়, অগ্রজ ও তৎপরবর্তী অনুজ উভয়ের কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে একই জিজ্ঞাসা। এমন সৎ কবির বেঁচে থাকা শ্লাঘনীয়।

সরাসরি কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে কবি গণেশ বসু পাঠকের গোচরে আনতে চাইছেন নির্মম বাস্তবতা : "অন্ধকারে রাষ্ট্র কাঁপে, সান্ত্বনার চিহ্ন নেই, আপেলের গায়ে গায়ে অস্ত্রের জৌলুষ"। দেশের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের রক্তাক্ত জীবনের কথকতা রূপ পাচ্ছে কবিতা। এখানে কবিমন একা। তবুও পিছপা নন, কলমের কালিতে দাগ দেগে দেন শাসকের পোশাকে : "কী চায় শাসক বলো? সব মৃত্যু— ফেরিওয়ালা মুসোলিনি-হিটলারের আনন্দপ্রভ।"

শরীর যখন আর নামতে পারে না পথে, মন তখন একমাত্র হাতিয়ার। স্বাধীন শাসক পরাধীনতার গান গায়, গণতন্ত্রের নামাবলি পরে ইতালি-জার্মানির সেই

প্রাচীন ন্যাৎসীশক্তির হুঙ্কারে পদদলিত করতে চায় জনগণকে। এ ছিল কবির কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই প্রৌঢ় কবি তাঁর মানস-সুন্দরী কবিতার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিরোধিতা করছেন, একটার পর একটা কবিতা প্রণয়ন করছেন বিষাদ-বেদনা আর আহত অশ্বের হ্রেষায়। কখনো কখনো ব্যঙ্গ করে বলেন, "পুতুল পড়শিই চায়—/ শাপলার মতো ফাঁপা, নমনীয় শিরদাঁড়া/চোখ রাঙালে কেন্নো হয়ে যেতে পারে।" (চিরদিন প্রভুত্ববাদীরা)। কবি এভাবে উত্তরাধিকারকে চেনাতে চেয়েছেন শাসকের রূপ। তবুও মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আর কোনো কোনো অনুজ কবিও প্রলুব্ধ হয়, ক্ষমতার লালসায় লালা ঝরে ঠোঁটে, বলে, "এসো নুন খে' নুন স্বীকার করি"।

কবি গণেশ বসু একালের অন্যতম বিবেক, অভিভাবক। তাই স্বাধীনতার অবমাননায় চিন্তিত, স্বাধীন চিন্তা চেতনার, মেধা ও মনীষার পলায়নতায় রুষ্ট, নানা শব্দাস্ত্রে শাসককে যেমন আঘাত করতে চেয়েছেন তেমনি মানুষকে জাগাতে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন দর্পণ। অগ্রজ কবি শঙ্খ ঘোষ যেমন সঘোষ কণ্ঠে বলেন, "রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে/দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন ", কবি গণেশ বসুও সময়ের চিত্র অঙ্কনে দৃঢ়— পিনদ্ধ : "মনীষার রৌদ্র নয়,/শিকড়ের জল নয়, স্বপ্ন— গান কিছু নয়/রিমোট কন্টোল শুধু দাঁতে চায় চিতা"। কবিজীবনের শুরু থেকেই কবি জাগরণে ও মুক্ত প্রয়াসী। ইতিপূর্বে 'ভাসানদরিয়া' (২০০৮) কাব্যগ্রন্থের 'পবিত্র ভণ্ডামি' কবিতায় দেখেছি কবি কীভাবে নিঃশঙ্কোচে, যে সাংবাদিকতা তাঁর যৌবনের অন্যতম ব্রত ছিল, সেই গোষ্ঠীকে নিয়ে নিজস্ব দাবিতে এবং কর্ম-ধর্ম রক্ষায় গড়েছিলেন ইউনিয়ন; সেই সাংবাদিকতা আজ অবনমনের মুখে। কবি কঠোর ব্যঙ্গে লিখেছিলেন "সংবাদজীবীরও নাকি স্বাধীনতা প্রিয় শব্দ। কার স্বাধীনতা?/যত জারিজুরি ওই খাঁচার ভিতরে/কীভাবে কতটা লাফ, দৌড়ঝাঁপ, মেপে রাখা আছে।" (কবিতা সংগ্রহ— ২০২০,/পৃষ্ঠা— ৩২২)। ২০০৮এ প্রতিবাদের যে সুরে চড়া নাদে ধুন তুলেছেন আজও সে সুর চড়াম চড়াম দামামায় যেন বাজিয়ে চলেছেন। এখন তাঁর অবসর নেই। কেবলই উচ্চকণ্ঠে বলছেন। গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ 'সংবাদমাধ্যম', শাসকেরই অঙ্গুলিহেলনে যেভাবে চলছে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে না। তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, অগণন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না যে ক্রমে ক্রমে তারা পরাধীনতার পোশাক পরে নাচছেন, নাকি এ এক পরম মজাদার স্বাধীনতা! 'স্বাধীনতা' নামক খাঁচার ভিতরে একে একে সবাই বন্দী হচ্ছে, অবশ হচ্ছে শরীর— মন-তন-মনন ও মেধা। কবি তাই জীবনের তারে বেঁধেছেন বাউলের একতারা— পারলে বেরিয়ে পড়তেন এই আশিতেও।

উন্নয়নের এক অদ্ভুত ম্যাজিক লক্ষ করেছেন কবি। কালো ঘোড়া সাদা হয়, তুঘলকিরাজ তবুও 'তুমুলধামাকা', সেখানে পোশাক বলে কিছু বাঁচে না।

'কামানো মাথায়' 'বাজ শকুনের জমকালো ভেদবমি' 'শব্দেরা মৃত', তবু 'ফাঁকা কলমির ধ্বনি' আকাশ ফাটায়। এ এমন এক সময় 'কারো সঙ্গে কারো নেই আর সামান্য যোগাযোগ'। এ তো শাসকের অক্ষয় কামনা। এভাবেই কেবল ক্যাডার নয় জনগণ বোকা বনে যান। তিনি লক্ষ করছেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শাসক সমগ্র দেশটাকে 'কবর' বানাতে চাইছে। তাই তিনি অভিভাবকের মতো সাবধান করছেন : "ভুলে আর যেও না ওদের কাছে/ওদের হাতে বারুদ না কি ছোরা?" চিলচিৎকারে যেন প্রশ্ন করেন "ঢের হয়েছে চাই না এমন তামসঘর/ স্বদেশ কেন বধ্যভূমি শুধু?"।

যখন কাব্যময় পরম্পরায় ছন্দে ছন্দে কারো টনক নড়ে না, জাগে না চেতনা, কারো হৃদয়ে উৎসারিত হয় না জাগরণের গান তখনই কবি সোজাসাপটা গদ্যে লেখেন "মানুষ কোথায় যাবে?" মানুষের জন্যে তাঁর শব্দের খেলা, শব্দলীলা, মানুষের জন্য "নীরব সন্ত্রাসের" ছবি আঁকা। শব্দ দিয়ে বোনেন ধানতলা বীজের মতো নতুন বিপ্লববীজ

"সূর্যচন্দ্র রাহুগ্রস্ত। অমানিশা আমিষাশি। নদীনালা শনির বলয়।
গণতন্ত্র ছিন্ন শির। উদারতা মৃত পেঁচা। সহিষ্ণুতা হিমার্ত ফসিল।
বিরোধিতা তুলো ধোনে। আউসভিৎস উঠে আসে। স্বেচ্ছাচার উজ্জ্বল শাসক।
বিচারক খোঁড়া ঘোড়া। মানবতা গ্রন্থকীট। স্বপ্ন পঙ্গু আঁধার অরণ্যে।"

সমকালের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি যে বিন্যাস ঘটিয়েছেন তা যদি অন্যভাবে সাজানো হয় তাহলেও কবির ক্যানভাসের মনন, মূল্যবোধ বিসর্জনের বেদনা একটুও পাল্টে যাবে না। কবির কথায় যেকোনো অবুঝ মনও চিৎকার করে বলবে "মানুষ কোথায় যাবে?"।

এমন শ্মশান— শান্তিতে 'স্বপ্নদর্শন' লেখেন কবি। সাদা পাতা ভরে যায় সশব্দে সাহস-শক্তিতে "ধ্রুবতারার রূপোর ঝোরায় সুদিন মাতে/উড়ছিল সব হৃদয়পুরে মানবতার ইচ্ছগুলো।" এভাবেই মানবতার মন্দির গড়া হয়। কবিও একজন কারিগর। বহুবছর বাঁচে যে সেই 'ফিনিক্স ঘুমোয়'। পাশ্চাত্যের রূপকথার এই পাখিকে যেন কবি জাগাতে চাইছেন, যে মরেও পুনরুজ্জীবিত হয়। কেননা সময় বড় রহস্যময়— "ইতিহাসের ঘুরছে চাকা, মেরুকরণ/হাহাকারের/মধ্যে থেকে, রিক্ত ভ্রষ্ট ইতস্তত/মানুষগুলোর হাতে হাতে রোদের মতো/গড়ার সাহস, খোলা হাওয়া অবিরত।" এখানে কবি 'মেরুকরণ হাহাকারের' মধ্যে মানুষের, মৃত মানুষের ফিনিক্স পাখির মতো পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশাকে মূর্ত করতে চেয়েছেন। স্বপ্ন যেভাবে আসে হৃদয়ের অলিন্দে কবিও তেমনি স্বপ্ন দেখছেন আজও। ঘুরেফিরে সেই 'সমুদ্রমহিষ' যেন 'শিরাফোলা' মুগ্ধতার শিহরনে আবার মূরতি

ধারণ করে জীবন-জিজ্ঞাসার প্রান্তসীমায়। তাই 'সৃজনবতী প্রস্তুতি নেয় শিরায় শিরায় ভবিষ্যতের'।

কেবল দেশ নয়, আন্তর্জাতিকতা বোধে কবির চিন্তন ও মানবতা এবং দর্শন— আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের শাশ্বত ভাবনার ভিত্তিতে জারিত। তাঁর স্বপ্নদর্শনের পরশপাথর যেই আবার আগুনের মধ্যে পড়ে : 'ডান-বাম-অতিবাম' ক্রমে ক্রমে লক্ষচ্যূত হতে হতে কোন বিষাদে নিমজ্জিত— এ প্রশ্ন কবিকে ব্যথিত করে। যে ধ্রুবতারা মানস-প্রত্যয়-কমিউনিস্ট— সংকল্প, সে যেন দিশেহারা। তিনি লক্ষ করছেন একদিকে সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ববাদীদের স্বেচ্ছাচারিতা, দমন পীড়ন নীতি। তাই ব্যঙ্গবাণে লেখেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যেন 'বিশ্বের জেঠু'। আবার শান্তি— নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত সু-চির দেশ মায়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া ১৯৪৭-এ কবির ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণায় যেন একীভূত। হয়তো এ অনুভূতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কারণ মায়ানমারের প্রকৃত স্থিতি কবির গোচরে কতটুকু ছিল সে প্রশ্ন থেকেই যায়। তথাপি রোহিঙ্গাদের ছিন্নমূল হওয়ার সঙ্গে কবির শৈশবের দেশভাগের বেদনা অনুভূত হওয়া স্মৃতির মুকুরে অস্বাভাবিক নয়— "সমুদ্রতীরে লণ্ডভণ্ড নুড়ি/স্বভূমি থেকেই রোহিঙ্গা বিতাড়িত।" কবি কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাননি। সমকালীন সময়ের অস্থিরতা অঙ্কন করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ স্বাভাবিক নদীর স্রোতের মতো উচ্চারিত হয়েছে। তাই এরপরে দেখি কবি নিজ দেশে যে অদ্ভুত মায়াখেলা চলছে তাঁর চেতনায় তা ধিক্কৃত "গণতন্ত্রের মরকতমণি মুসোলিনী-কঙ্কালে/খাঁচার তোতারা ইসি ইডি সিবিআই "। যে বয়সে পুরস্কারের লোভে মনকে মননকে বিক্রি করে, হয়তো বলে "মারো আমায় আবার মারো, পেট ভরলে সইতে পারি মূলোর পরে শূলও"। কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এমনভাবে রাজার চেলা কিংবা তোষামোদকারী পোশাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সেখানে কবি গণেশ বসু নিজস্ব-বীক্ষায় অবিচল। কোনো করুণা তিনি চান নি, অন্তত তিন কাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে যাঁর, তাঁর কবিতায় এমন ভাষা বা শব্দ বয়নের দুঃসাহস থাকাই প্রমাণ করে কবির হৃদয়ের তেজোদৃপ্ততা।

১৯৭০-এ 'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার' কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন স্বপ্নের বাস্তবতায় 'শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসার লেনিন', দীর্ঘ একটিমাত্র কবিতায় কীভাবে যৌবনে এনেছিল সংগ্রাম করার উদ্দামতা, এনেছিল 'ইতিহাস গড়বার অধিকার'। ২০১৭-তে তাঁর মগজে-চিন্তায়— প্রত্যাশায় মার্কসের উপস্থিতি ঘটে সুনিশ্চিত বিশ্বাসে ও দর্শনের ধার নিরীক্ষায়। কার্ল হাইনরিশ মার্কস (৫ মে ১৮১৮— ১৪ মার্চ ১৮৮৩) একজন জার্মান দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবেত্তা, সমাজ বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী। সমগ্র

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের একজন মার্ক্স। মার্ক্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলোর মাঝে রয়েছে তিন খণ্ডে রচিত পুঁজি এবং এঙ্গেলসের সাথে যৌথভাবে রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮)। বিশ্বের এই অনন্য ব্যক্তিত্ব কবির শব্দবন্ধে 'মহামতি পিতামহ'। মহাভারতে যেভাবে নানা সমস্যায় মুসকিল আসান হয়ে উঠতেন পিতামহ ভীষ্ম, বর্তমান বিশ্বে কমিউনিস্ট রাজনীতির সংকটে জীবন যখন মহাফাঁপরে কবি তখনই স্মরণ নিচ্ছেন আধুনিক বিশ্বের পিতামহ কার্ল মার্কসকে। তাঁর স্থির বিশ্বাস এই মহাসংকটে শাশ্বত দর্শনের লালন ও সেই মহার্ঘপথে জীবনযুদ্ধের চাবিটা নিহিত : "একমাত্র মুনাফা যখন পুঁজির কাম্য হয়/অসাম্য ঘোর, মহাসংকট মানবসভ্যতার।/যতদিন রবে শ্রেণিবিভাজন তোমাকে এড়ানো দায়/আজো তুমি আছো, তুমি থেকে যাবে অপরিহার্যতায়।"— এখানেই কবি গণেশ বসু অগ্রজ পদিতিক ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র, বাধ্য সৈনিকের মতো দাঁতে দাঁত চেপে রাতুল নিশান উচ্চকিত করছেন।

তবুও সমকালের কথা আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান হয়েও চোখে আঙুল দিয়ে যথার্থ পরিস্থিতির রূপ অঙ্কনে সদা সচেতন। বারবার জীবনের শূন্যতা, বিপন্ন পৃথিবীর কথা ধ্বনিত হচ্ছে কবিতার অঙ্গনে : "বাতাসে বিষের ধোঁয়া, জলে মৃত জলচর—/মাটি আর মাটি নেই", এমনভাবে সাবধানবাণী কে দেবেন আমাদের, জ্ঞানবৃদ্ধ কবি ছাড়া। মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা/যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই —প্রীতি নেই— করুণার আলোড়ন নেই/ পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।" (অদ্ভুত আঁধার এক) তাহলে কি ধরে নিতে হবে পরাধীন যে আঁধারে বন্দী ছিল দেশ কিংবা পৃথিবী— সে আঁধার ঘোচেনি আজও। সে কি কবি গণেশ বসুর কথায় 'আজো বাজপাখির মতো ওঁত পেতে 'ছায়া' করে রেখেছে? ২০১৯-এ তাই বিস্মিত— "মানবতা অদ্ভুত নীরব"। আজও কবি শুনতে পান যন্ত্রণার্ত মানব-উপত্যকার কান্না, "স্বশাসন লণ্ডভণ্ড", নষ্ট বুঝি রাষ্ট্রধর্ম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত অদ্ভুত বৈরিতা, স্বাধিকার তলিয়ে যায় উপেক্ষার খাদে। কবি তাই বেদনাহত চিত্তে বলেন, "মানবতা অদ্ভুত নীরব/রক্তে ভাসে শিশুদের শব"।

যে শিশু আগামী, আমাদের স্বপ্ন— ভবিষ্যতের আলো, সেই শিশুরা আজ মৃত। কে রইল পৃথিবীতে! কবি কতটা আর্ত বোঝা যায় পরের পঙ্‌ক্তি পড়লে 'রক্তে ভাসে সুন্দরের শব'। ভাবা যায় যে সত্য সুন্দরের উপাসক ও স্রষ্টা ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই সুন্দরও আজ মরে গেছে মন থেকে। কবির জন্য রইল

না কিছুই। এবার কি যেতে হবে বনে? বনের জ্যোৎস্না তো মরেনি এখনও। কারণ পশুরা মানুষের থেকে কি ভালো নেই? প্রশ্ন আমারও। কবি গণেশ বসু সঘোষে উচ্চারিত করেন, ''অন্ধকারের আদিমতা একুশ শতকেও''। কবিমন যেন অলক্ষে চিৎকার করছেন— কুৎসিতের, মানবতার মৃত্যু রচনাকারী এ উপত্যকা মানুষের জন্য হতে পারে না। তাই প্রবল প্রতাপে ঘোষণা করেন এই ঘোর অমানিশা এতটা ঘনঘোর সংগঠন বা একা একাও বেঁচে থাকা নিরুপায়, এ সময় মারণযুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়তো ধ্রুবসত্য— ''সংগঠনী সমঝোতা নয় সত্য নিয়ে/মারণখেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা ঠিক''। মৃত্যুকে এভাবেই জয় করে কবি হতে চেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী? নাকি এই দৃঢ়সংকল্প কঠিনচিত্ত ও সংগ্রামী মনন তাঁর জীবনদর্শন? এভাবেই পার হতে চান জীবনের বৈতরণী, দুঃখের নদী, ধ্বংসের বিভীষিকা, গড়ে তুলতে চান মানবতার সত্য — মন্দির। হতাশা তাঁকে তবু ঘিরে ধরে 'পায়রাগুলো মুখ গুঁজে রয় ডানার ভিতরে/মেসেজ ছোটে আকাশ চিরে নেই কবি আর নেই" (ব্যক্তিগত শোক/১৭.০২.২০) কবিতার নামকরণে সময়ের ছবি সরাসরি প্রতিবিম্বিত : 'ভারতবর্ষ ২০২০'। আঁকা হয় ইতিহাস, ফুটে ওঠে বর্তমানের হকিকত "কৃপাদাসে ঠাসা এই দেশ কাঁদে, জাতি কাঁদে, সংসদীয় সন্ত্রাসের মধ্যরাত নাচে। হায় আজ! মানবতা খাড়াখাড়ি, মৃত্যু নিয়ে লেনদেন, ক্ষমতার একমাত্রিকতা।" (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০) আচ্ছা, আমদের পূর্বপুরুষ কি এই স্বাধীনতা প্রার্থনা করেছিলেন?

ষাটের তরুণ কবি এখন আশিতে। এখনো মেরুদন্ড সোজা রেখে কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে আঁকছেন কালের প্রতিচ্ছবি। পাঠকের সামনে তুলে ধরছেন সত্যদর্পণ। ক'জনের টনক নড়ে উঠল সে হিসাব করার দায় তাঁর নয়। চিত্রকরের মতো এঁকেছেন দুর্দশার চিত্র, যুদ্ধজয়ের কৌশল। কবিতা নির্মাণে কখনো মান্য ছন্দে গড়েছেন শব্দবন্ধের হৃদয়— ছোঁয়া ঘর, কখনো নিপাট গদ্যে, কখনো বিস্তারে অযুত শিল্প সৃষ্টি করেন। তবে শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে একবারও মৃত্যুচিন্তা গ্রাস করেনি তাঁকে। বরং যতটুকু সময় বাঁচে সবটুকু দিয়ে যেতে চান মানুষের জন্যে। সবমিলে তিনি এমনই একজন বহমান ব্যক্তিত্ব, যেমনটা শুরু হয়েছিল কোনো এক কৈশোরের যন্ত্রণায় অথবা যৌবনের উন্মাদনায় উৎসারিত চেতনলোক থেকে— সে হতে পারে মার্ক্স অথবা লেনিন। আজ এমন কবির দোসর ক'জন আছেন—! বড় একা মানুষ, কবিত্ত। তবুও কবি গণেশ বসু অপরাজেয়— যোদ্ধাক্রান্তিকারী— সময়ের অপেক্ষায়, তাঁর কলম সজাগ-সতর্ক— বহমান নদীর মতো কলতান তোলে। উচ্চকণ্ঠে যেন ঘোষণা করেন—জাগো, জাগো হে জনগণ।

প্রেমের কবিতা : গণেশ বসু

মৌসুমী সাহা

ষাটের দশকের কবি গণেশ বসু ছিলেন মার্ক্সসীয় মতবাদে বিশ্বাসী, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতাময় দিনগুলির মধ্যে বেড়ে ওঠা তাঁর জীবন। ছিন্নমূল হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এপার বাংলায় আসা মানুষটির কবি হয়ে ওঠার পথ খুব মসৃণ ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে উদ্বাস্তু বা দেশভাগে শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণায় তাঁর কঠিন জীবনসংগ্রাম এবং যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাঁর মনন, সেই সূত্রেই অলক্ষে একটা রঙিন জীবনের স্বপ্ন সুপ্ত থাকে তাঁর অবচেতনে। নিজের ভালোলাগা কিছু পুরনো স্মৃতিকে খোলা মনে কবিতায় তুলে ধরেন সেইসব অনুষঙ্গ। তাঁর কবিতায় একটা নিজস্ব আবরণে অনেক আত্মপ্রসঙ্গ সরাসরি জানিয়ে দেন পাঠককে। জীবনের শূন্যতা ঢাকতে গিয়ে প্রথমজীবনের এক কিশোরী মেয়ের প্রতি মুগ্ধতার আবেশ তাঁকে মাঝে মাঝে বিচলিত করে, সহজ সরল আনন্দে ভরিয়ে তোলে। যদিও সে ছিল কবির 'স্বপনচারিণী', সমস্ত অস্থিরতা-লড়াই-ভীরুতা অনিশ্চয়তা স্বত্বেও মাঝে মাঝে একটা অলক্ষ্য স্পন্দনে জেগে উঠত কবি-মন। ব্যথাময় পৃথিবীর সমস্যার মধ্যেও সে ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জগৎ—

'বনানী, এখনো ফের ভালোবাসা দোলা দেয়, এ বুকে তোমার
তোমার স্মৃতিকে ঘিরে আসে,' ... (১৯)

কবি শুধুমাত্র স্মৃতির শরিক হয়েই বেঁচে থাকতে চান, তাঁর অন্তরের শৈল্পিক চাহিদা শুধুমাত্র এই কিশোরীর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই। বনানীর সেই অনিন্দ্যসুন্দর ভালোবাসার সরোবরে আত্মসমর্পণ করেই তিনি জেগে থাকেন তৃষিত নয়নে। সকল ঘৃণা আর অবহেলাকে উপেক্ষা করে মহানির্জনে কেটে যাবে তাঁর সারাবেলা। এইভাবেই আমরণ তিনি নির্জনে প্রেমকে অনুভব করবেন। কুমারী নারীর ভালবাসায় আপ্লুত কবির হৃদয়ে স্মৃতিরা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, আর হীরকদীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। কবির বোধ তাঁকে নিবিড় ঘন আঁধারে ধ্রুবতারার মত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। তিনি কখনও ভাবেননি—

'ঈশ্বরী ওগো ভাবিতে পারি না কুমারী নারীর
ভালোবাসাহীন পুরুষ কী করে বাঁচে?' (৯)

যে ছিল একদিন কবির স্বপ্নশিয়রে শায়িত, তারই আঘাতে আজ কবিহৃদয় খন্ডিত। তবুও তার স্মৃতিকে আশ্রয় করেই পিপাসার্ত হৃদয়ে কিভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন, তা তিনি নিজেও জানেন না—

'যদিবা আত্মা লোটে শুধু পদাঘাতে
সুন্দরী ওগো উজ্জ্বলতম আমার জীবন
বাঁচাতে পারো না সেই মহাকরুণাতে?' (৯)

এমনি করেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে নয়নের জলে কবি স্মৃতি-তর্পণ করে যাবেন, যদিও জানেন না সেই প্রেয়সীকে কোনোদিন আবার ফিরে পাবেন কি না? তবুও তাঁর ভাবতে ভালো লাগে—

'অবসাদেই শীতল দেহ, নয়ন গাঢ় শোকে
তথাপি স্মৃতি জাগে'। (১০)

কবি স্মৃতিকে নিয়ে পরম নিভৃতে 'নিরবধিকাল' জেগে থাকবেন। অসহ স্মৃতি নিয়ে পৃথিবীর বুকে সমাধিভূমি রচনা করবেন, যদিও বঞ্চিত সেই নূপুরের নিক্কণধ্বনি আর কখনও সেই মিঠে সুরে বাজবে না। জীবনানন্দীয় ধূসর স্মৃতির আঘ্রাণে মগ্ন নির্জনতায়. 'সর্বনাশে'র চারিদিকের ধূসরতার মধ্যেও আন্তরিকভাবে বেঁচে থাকে তার স্মৃতি।

কবি গণেশ বসু-র জন্ম পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায় চাঁদশিতে, ১৩৪৭ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ। মাত্র আটবছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। একদিকে শিকড়ের প্রতি অচ্ছেদ্য টানে যন্ত্রণাদীর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মন, অন্যদিকে শহুরে জীবনের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের অংশীদার হয়ে অমানবিক রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় রক্তাক্ত হয় মানবিক অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিনতার সঙ্গে যুক্ত সকল বোধ-বিশ্বাস ছায়া ফেলে ব্যক্তিজীবনে। বিচিত্রতর ভাবাবেগ, নতুনরকমের শৈলী, পদচয়নের বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গি সব মিলিয়ে ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) পাঠ করলে এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক, ব্যক্তিগতভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন বলে কবি সুভাষের জীবনাদর্শের সঙ্গে তাঁর সমাধর্মিতা আছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন। তবে অন্যান্য বাঙালি কবিদের মতো গণেশ বসুও প্রেমাহত আবেগে ও বিষণ্ন অনুভবে 'বিরহগাথা' রচনা করে তাঁর কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন—

'একদিন এসেছিল ধীরে ধীরে এসেছিল বড়ো কাছাকাছি/সুবাতাস বয়ে গেছে তোমার চোখের মতো, পাশে বসে বসে' (২) সারাদিনের ব্যর্থ দুরাশা, বনানীকে ঘিরে হাহাকার ধূসর স্মৃতির অতলেই হয়তো তলিয়ে যাবে —'পাঁজরে বইছে করুণ

গান' আর তার মাঝেই 'একরাশ মেঘ ছুঁড়ে' দিয়ে 'সন্ধিকালের সন্ধ্যাতারা' বনানী দত্ত রায় কি স্মৃতি হয়ে যাবে? বনানীর প্রতি কবির মানসিক টানাপোড়েন তাঁর প্রতি মুহূর্তের অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুলছে—

'স্মৃতির কবর খুঁড়ে যে-সময় ক্লান্ত আমি হয়েছি রমণী
শীতার্ত নদীর মতো, অথবা আহত
অতীত অরণ্য থেকে চিতল-হরিণী-আশা উধাও যেমনি
আমার সে স্বপ্ন হল সূর্য-শরাহত।' (৫)

বনানী কবির জীবনে প্রথম মানসী, যে এসেছিল নিঃশব্দ চরণে। তখনকার দিনে, অর্থাৎ সেই ষাটের দশকে কফি হাউসে 'বনানী' নামটি খুবই চর্চিত ছিল। যৌবনোত্তীর্ণ কবি তাঁর সমস্ত মন উজাড় করে দিয়েছিলেন বনানীকে। বনানীর গৃহশিক্ষক হওয়ার সুবাদে তরুণ কবি তার সমস্ত অনুভব দিয়ে সেই কিশোরীকে একান্তভাবে চেয়েছিলেন—

'জাহাজ তোমার কোন বন্দরে ভিড়িবে?
কোন উপকূলে? বনানী, নিবিড়ে বলতো।
বেপথু বাতাসে কেবলি কি পাল ছিঁড়িবে?
হৃদয়ে রহিবে সংশয় শুধু সতত?'

বিগতদিনের স্মৃতির কবর খুঁড়ে খুঁড়ে ক্লান্ত কবি এই জটিল জীবনচক্রের পাকে পাকে জড়িয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, চঞ্চলা চিতল হরিণীর মত তাঁর আশা উধাও হয়েছে। স্বপ্নেরা সব এলোমেলো জগতে বিচরণ করছে। বনানীর অভিভাবকের ব্যবহারে তিনি আহত হয়েছেন—

'যখনি অঘ্রাণ আসে ভীত হই অতীত স্মরণে
কেননা বিগত দিনে কাছে ছিল। ও দুটি নয়ন
শুভ্র দ্যুতিময় ছিলো, অতএব স্মৃতির তর্পণে
বড়ো ব্যথা বাজে, চাই করজোড়ে অকাল মরণ।'

কবি শুধুমাত্র স্মৃতির শরিক হয়েই বেঁচে থাকতে চান, তাঁর অন্তরের শৈল্পিক চাহিদা শুধুমাত্র এই কিশোরীর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই। বনানীর সেই অনিন্দ্যসুন্দর ভালোবাসার সরোবরে আত্মসমর্পণ করেই তিনি জেগে আছেন বিরহ ধূসরতায়।

কবি গণেশ বসু আর 'সর্বনাশের' নেশায় মাততে চান না, অতীত স্মৃতির প্রতি তাঁর আর কোনো দায়বদ্ধতা নেই, 'কেননা অসংখ্য স্মৃতি অবিরল করিয়ে ক্রন্দন'। (১১) বনানীর ভালবাসায় ছন্নছাড়া কবি আজ উদভ্রান্ত—

...হায়
স্বর্গীয় সুষমা যেথা বহমান সে-সুন্দর নীড়ে

নির্জন বিকেল স্বচ্ছ পাখিনির সে ভালোবাসায়
মাত্রাজ্ঞান ছাড়া আমি, ছন্নছাড়া বিপন্ন শরীরে।'

প্রেম-অপ্রেমের দ্বন্দ্বে উদ্বেলিত কবি বাঁচতে চান, উন্নতর অনুরাগে মুমূর্ষু সমাজকে অতিক্রম করে আবার নতুনভাবে জেগে উঠতে চান—

বাঁচাও বাঁচাও তুমি, জেগে ওঠো, বনানী আমার
এবং আমায় তুমি দয়া করো, প্রয়োজনে আজ
তোমার নিবিড়তর ভালোবাসা, আমাকে তা দিলে
সহজে ফিরিয়া যাবো। ওহৃদয়ে আলোকে আবার।'

কবির শোকার্ত আত্মা আজও যেন উপবাসী। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তাঁর প্রেমার্ত হৃদয়ে মর্যাদা দেওয়ার মত কেউই নেই। কেউ তাঁর গভীর ভালোবাসাকে মর্যাদা দিল না, তাঁর ব্যর্থ হৃদয় 'মুমূর্ষু আঁধার ক্লান্ত, অবসন্ন', তিনি জানতেন অকাতরে কেউই ভালবাসা বিলোবে না। উদ্বাস্ত শিবিরেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে তাঁর হৃদয়! তাঁর মত মহান প্রেমিকের শোকে কেউই দু-ফোঁটা চোখের জল নিঃসরণ করবে না—

.....ক্লান্তি, অবক্ষয়
ঘিরিয়া রহিবে দেহ আপাতত, ভালোবাসাহীন
স্মৃতিরা বাঁচিয়া রবে আন্তরিক, অথবা বিলীন।'

সর্বনাশা ধূসর সন্ধ্যায় আজস্র স্মৃতির কোমল পরশ তাঁর আত্মাকে শোকার্ত এবং পিপাসার্ত করে তুলেছে। 'ফ্রকপরা কিশোরীর' অমলিন ধূসর হাস্যে অলৌকিক স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আজ অন্তর্হিত, চারিদিকে মুমূর্ষু আঁধারে ব্যর্থতাই পরম সত্যরূপে উদ্ভাসিত, হতভাগ্য কবি 'নিজেরই বাহুতে বন্দি' তবুও চাঁদের সোনালি আলো যখন প্রতিফলিত হয় তখন নতুনতর সৃজনের আবেগে যার মুখাবয়ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সে কি 'জন্মভূমি? অথবা বনানী।' (১৮)

কবির যে-দিন হারিয়ে গিয়েছে তা আজ স্মৃতির কঙ্কালে, আজ পর্যবসিত অথবা অপঘাতে তলিয়েছে 'সমুদ্র অতলে'। (১৯)

তবুও বনানীর ভালোবাসা এখনও মনে দোলা দেয়, এ বুকে এখনও 'জোয়ার' আনে। স্মৃতিকে ঘিরে ফোটে 'স্বপ্নসূর্যমুখী'। কিন্তু দুর্বাশার অভিশাপে এ ক্রুদ্ধ শহরে ধুলোয় লুটায় ''স্মৃতি-কঙ্কণ বনানী', সে এখনও চেতন-অচেতন প্রেমের দ্বন্দ্বে দোলায়িত— 'বনানী, এখনো তুমি চেতনাচেতন।' (১৯)

বর্তমানের প্রেক্ষিতে প্রেমের সংজ্ঞা আজ কবির কাছে মূল্যহীন, ভ্রান্ত, কবিহৃদয়ে আজ ভালোবাসার ভগ্নাবশেষই অবশিষ্ট আছে। শরৎজ্যোৎস্নায় ব্যথার্ত পৃথিবীর বুকে আর ভালোবাসার উদ্বোধন হবে না, নীরব স্মৃতির সাক্ষ্যে 'সমগ্র

বুকেতে জ্বালা, চোখে জ্বালা'। ঘাতকী হৃদয় পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট প্রথম যৌবনে যখন প্রেম এসেছিল নিঃশব্দে, তখন হৃদয়মন্দিরে বনানীকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রেম হাহাকারে ভেসে গিয়েছে। কখনও শান্তির মাধুরী নিয়ে কবির উপর বর্ষিত হয়নি। যন্ত্রণা, হতাশা, ক্ষোভেই তাঁর জীবনে পরম সত্য। কবি আজ অক্ষম যুবকের মত গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন। তবুও আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়-পটে সেই কিশোরীর ছায়া পড়ে আজও— 'দুর্বহ জ্বালায় কাঁদি নাই কতোকাল, ছিলে বড়ো বুকের নিকটে।' (২২) আজ ভালোবাসা তাই মুমূর্ষু-সংগীত, গভীর নৈরাশ্যে পর্যবসিত।

বনানীকে যোগ্য উপাচার পাঠিয়ে আহ্বান করার ক্ষমতা কবির নেই, তিনি সাধারণ গৃহশিক্ষক মাত্রা। আর তাই বনানীর পরিবার কবিকে যোগ্য মর্যাদা দিতে নারাজ। তার বাড়ির গুরুজন দ্বারা তিনি আজ বহিস্কৃত। এই দীন-হীন বেকার যুবকের কাছে ভালবাসার অর্ঘ্য ছাড়া আর কিছুই নেই। আসলে বাস্তব বাস্তবিকই বড়ই কঠিন, সময় খুবই নিষ্ঠুর। আজ এই গভীর দুঃসময়ে বনানীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বপ্নগুলো কবিকে কুরে কুরে খায়।

.....খাঁ খাঁ বুকে দুর্বোধ দুরাশা
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে, ছিন্নভিন্ন সাজানো বাগান' (২৩)

'মায়াবী কথার মায়া বিতরণ' ছাড়া কবির আর কোনো সম্বলই নেই। আগ্নেয়গিরির গর্ভে শান্ত দোল পূর্ণিমার নিবিড় ভালোবাসা কোনো 'নষ্টামির' ধার ধারে না। তবে বড়ো বেশি ভয় হয় তার প্রেমের অতৃপ্তি যেন তাকে বড়ো বেশী বিষাদমগ্ন করে না রাখে—

'প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে কোষে-কোষে শ্রুতিতে শ্রুতিতে তোমার সৃষ্টির বীজ, জেগে ওঠো, আমাকে জাগাও, বনানী, বাঁচাও তুমি দুর্নিবার মরিব সংগীতে। (২০)

হতাশ কবি অভিমানবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে জানতে চেয়েছেন, 'একবার চলে গেলে আর কি ফেরানো যায়?' আজ দীর্ঘদিন বনানীর দেখা নেই, কেন তার এই স্বেচ্ছা নির্বাসন? নষ্টনীড় এই সুন্দর সমাজে জটিল ভালোবাসা কেবল 'গিলে খায়'। (২৫)

বনানীর চোখের আলোয় সেদিন এ পৃথিবীর নতুন মাধুর্য্যময় রূপ দেখেছিলেন কবি। আজও তাই তাকে ভোলেননি তিনি। তাই প্রিয়তমা বনানীর স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। আজ এই বেদনার দিনে তিনি বড়ই একা, একাকী। ভুলেও কেউ আসে না নতুন অনুরাগে, কাজেই 'তুমি থেকো সপ্রাণ সুন্দরী'। (২৭)

বনানীর কাছে বার বার বিদায় নিয়েও তাঁর মনের রোমান্টিক বাসনা সেই কুমারী হৃদয়েরই সখ্যতা দাবী করে: 'বাঁচার সংগীতে তুমি জীবনের ময়ুখ মঞ্জরি'। বনানীর সঙ্গে চির বিচ্ছেদে তৃষ্ণাতুর বেকার যুবকের হৃদয় বড়ই বিষণ্ণ, রিক্ত,

নিঃসহায়, জন্ম অভিশপ্ত। তবুও এ জীবনে বনানীর আশ্রয় লাভের প্রত্যাশী, ঝড়ের দাপটে ছিন্নভিন্ন ভালোবাসার তরণী কোন্ তটরেখা ধরে অগ্রসর হবে তিনি জানেন না— 'নিভৃতে এখনো তুমি চেনা আলো, চেনা অন্ধকার'। (৩০)

সময় ফুরিয়ে গেলে সকলই চলে যাবে, সকলই যায় চলে। কেউ পড়ে থাকে না এখানে। ক্ষীণ আয়ুরেখার হাত ধরে 'বেপথু হৃদয় কিছুই রাখে না ধরে।'/ ঝরে যায় দোপাটির দল'। (৩১)

শোকার্ত কবি দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানিতে এখন মগ্ন, নিঃসঙ্গ আঁধারে অনন্ত স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত কবি ভালোবাসার 'বিষসাপ' বুকে নিয়ে 'গুমরে' কাঁদেন নিঃসঙ্গ রাতে। বনানীকে না পাওয়ার বিষণ্ণ প্রেমের স্মৃতি নীরবে ভুলে যেতে চান আর তাই বনানীও যেন তাঁকে ভুলে যায় 'এইমাত্র মিনতি আমার'—যদিও বনানীর স্মৃতি জীবন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন জন্ম নেয় শুধু। বিষণ্ণ বাতাসে ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি নিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকা তাঁর মতো অবহেলিতের পক্ষে কি সম্ভব?

'স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে পদাঘাতে তীব্র অবহেলা'? তবুও এই ক্ষণজীবী ভালোবাসাই আবার কবিকে বাঁচার ইন্ধন যোগায়—

'তোমার কাছেই আমি নতজানু বেশি কিছু নয়/ তোমাকেই চাই আমি, চাই চাই তোমার হৃদয়'।

শব্দের ভিতরে শব্দ ভাষা খুঁজে বেড়ায়, তৃষিত নয়নে কবি বনানীকে খুঁজে বেড়ান, বিষাদকাতর হয় কোনো এক গোধূলিবেলা, অমলপ্রাণের সূর্য দিনশেষে পরাজয় মেনে আপন স্মৃতিকে হাতড়ে বেড়ায়। আঘ্রাণের স্পর্শকাতর ঝরা পাতা নীরব সংগীতে মুখরিত হয়। কিন্তু বিষণ্ণ কবির এমন ক্ষমতা নেই—

'যা দিয়ে তোমাকে পুনঃ ফিরে পাই বিষণ্ণ আমাতে'। (৩৫) মেঘবতী বুকের তলে সজল স্মৃতির আনাগোনা, নয়নে নয়ন মেলে তাকিয়ে থাকার দিনগুলি— সবই মনে পড়ে কবির, যখন নির্জনে জেগে থাকেন। সেই উত্তাপভরা দিনগুলি আজ ম্লান, নিস্তেজ। সেজন্য কবির মনে হয়—

'ভালোবাসাহীন হয়ে বেঁচে থাকা মস্ত অভিশাপ'। (৩৫) দুঃখময় এ জীবনে বনানীর প্রতি পরম নির্ভরতা কবির হৃদয় জুড়ে এখনও, তার আশ্রয় কামনায় মগ্ন— 'শিরা উপশিরা ছিঁড়ে চাই চাই তোমার আশ্রয়'। (৩৬)

কবি স্বদেশ ছেড়ে আজ বাস্তুচ্যুত অবস্থায় এ পরবাসে ঠাঁই নিয়েছেন। ভালোবাসার মন্ত্রই তাঁর জীবনের উজ্জীবনী মন্ত্র। জীবন পলাতক না হয়ে ভাবাবেগমুক্ত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন—

'প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকা অলক্ষ্যে শেখায় ভালোবাসা।'...

উদ্বাস্তু কবি বাস্তুচ্যুত অবস্থায় সাময়িক বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েও এক গভীর জীবদর্শনের মুখোমুখি হয়েছেন। জীবনরসিক কবি আর ভুলেও চান না স্বদেশ ত্যাগ করে উপেক্ষিত কাল যাপন করতে—

'বাস্তুচ্যুত হতে ফের ভুলেও চাহি না আমি, চাই / দীপাবলি হয়ে ওঠো, আমৃত্যু তোমারই গান গাই।' অন্ততঃ তাঁর কবিদৃষ্টির স্বভাব, চিন্তার মৌলিকতা, শব্দযোজনার মৌলিক ভঙ্গি, পরিমিতি বোধ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি সবকিছু তাঁর মার্জিত স্বভাবরুচির পরিচায়ক। এভাবেই কবি গণেশ বসুর প্রেমবোধ ব্যক্তি থেকে স্বদেশপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ তো বিরহবিধুর স্বপ্ন থেকে আসল পবিত্র প্রেমের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

তথ্যসূত্র :

গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ / সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল/ দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা।

জীবন-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-অপচয়ের দহনগাথা : 'নীরব সন্ত্রাস'

নবনীতা বসু

২০২০ এর জানুয়ারিতে কবি ও অধ্যাপক ড. জয়গোপাল মণ্ডল সম্পাদিত দিয়া পাবলিকেশন প্রকাশিত 'গণেশ বসুর কবিতাসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের 'ভূমিকা লিখতে গিয়ে স্বয়ং কবি জানিয়েছেন, ''এখন সীমাহীন দুর্ভোগ, অনিঃশেষ অভিযোগ, নিদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্ট, অবক্ষয় ও আত্মপীড়ন, বশ্যতা ও বিক্ষোভ, গণতান্ত্রিক একনায়কতা ও জাতিবৈরিতা... এমন সময়ে শব্দই কবিদের আশাভরসা, আশ্রয়স্থল।'' সময়ের কাছে ঋণী হয়ে তিনি কবির ব'কলমে বলেন, 'তাঁর সময় সমাজ নিয়ে নিজের বিশ্বাসের কথা, লক্ষ্যপূরণের কথা, স্বপ্নের কাছে সমর্পিত হবার কথা।' সময়ের এই জরুরি পাঠ নিয়ে তৈরি হয় স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের প্রতিবেদন। কবির বীক্ষা ধীরে ধীরে রূপ নেয় শব্দের কারুকার্যে, ভাষার স্বাদিষ্টে ও সুস্থ জীবনের ভাঁড়ারে, আর এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইতিহাসের আধারে রাজনৈতিক সময়ের নিগূঢ় কথন। কবি গণেশ বসু সময়ের উচ্ছ্বাস ও উত্তাপকে আত্তীকরণ করে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। তিনি জেনেছেন, 'শব্দ একা পৃথিবীকে বদলাতে পারে না' তিনি করেছেন চকমকি আলোয় রাজনৈতিক অবস্থানকে, দেখেছেন সম্পর্কের আলো-অন্ধকার পেরিয়েও 'রাজাবাদশা, সামরিক বাহিনী, কর্তাভজাদের সংসদ-সাধারণ নাগরিকদের বঞ্চিত করে বিনা ট্যাক্সে গুচ্ছের সুবিধাভোগ, কর্পোরেট শক্তি, ডলার দাপট, সিকিসত্যের মিডিয়া, আধিপত্যবাদীদের তিমির বিলাস বিনাশ করতে পারেনা শব্দের নিহিত গৌরব।' এই সব জানতে জানতে কবি পথ থেকে পথান্তরে এগোতে থাকেন আর তাঁর কবিতাবিশ্ব বিবর্তিত হয় রূপ থেকে রূপান্তরে। এই রূপান্তর প্রবণ সময়-স্বভাবের কাছে নিয়েছিলেন জীবনের সহজপাঠ। তাই তাঁর কবি-মনীষায় আমরা খুঁজে পাই-জীবনের অজস্র সমৃদ্ধি ও বিপন্নতার এক অপূর্ব বিনুনিবদ্ধ সহাবস্থান।

জীবনের মুখোমুখি হয়ে সাধ্য-অসাধ্যের যন্ত্রণায় কবি খোঁজেন গোটা মানুষকে। সময়ের সচেতন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কবি বিশ্বাস করেন, 'কবিতায় আত্মার আগুন, সময়ের আলো-অন্ধকার, যন্ত্রাণার উপশম, রয়েছে অনির্বচনীয় আনন্দ দেবার সামর্থ্য, সমাজ বদলানোর নিশানা, বিপন্নতার মধ্যে বরাভয়, বস্তু-সর্বস্বতায়

ক্ষতিপূরণের কেরদানি।' [৪]—সময় যেখানে বহ্নিমান, জীবন যেখানে স্ববিরায়িত, অন্ধকারে ডুবে থাকা সমাজে রাজনীতি যেখানে মঞ্চসাজ তৈরি করে সেখানে কবি গণেশ বসুর কবিতা প্রকরণ, বিন্যাস ও বিষয়-উপস্থাপনার চিরাচরিত অভ্যাসে শেকল ভাঙার আয়োজন করে। তাঁর কবিতাভাবনা এই পর্বে নিজস্ব পথ ও পাথেয় খুঁজে নেয়। অশান্ত পরিসরের যাপনচিত্রে কিংবা রাজনীতির চুল্লীতে যে আগুন আছে, সেই আগুন পুড়িয়ে দেয়, ঝলসে দেয়— সেই আগুনে বিষয়তত্ত্বের অবভাস খুঁজতেই পারতেন কবি, কিন্তু তাঁর অন্বেষণ ঝলসানোর প্রক্রিয়ায় শুধু নয়, বরং অভিব্যক্তির নিত্য নতুন বিন্যাসে। তাঁর কবিতার অন্বিষ্ট, সামাজিক, নান্দনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিদম্ভ দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দ্রোহাত্মক মনোভাবের প্রকাশ, পুনর্নির্মাণের আর্তি ও উত্তরায়ণ মনস্কতা।

বিচিত্র বিষয়বস্তুর বিন্যাসে ও স্বতন্ত্র নান্দনিক নির্মিতিতে গড়ে ওঠে কবি গণেশ বসুর কবিতার পৃথিবী। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৪), 'নিজের মুখোমুখি' (১৯৬৭), 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' (১৯৬৯) 'লেনিন: অধিকার রক্তের কবিতার' (১৯৭০), 'বাঘের থাবার নীচে' (১৯৮২) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে যেন জীবনের সাহিত্য বিস্তার। বাস্তবের মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনু ও সমাজেতিহাসের মধ্যে রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভক্ত কীভাবে বয়নে-অন্তর্বয়নে নতুনভাবে উদ্বেলিত ও আবিস্কৃত হতে পারে তা কবি অকপটে দেখিয়েছেন আমাদের। সমান্তরালে কবিতার মতো সূক্ষ্ম সংরূপের মধ্যে তাঁর জীবন-দীক্ষার চমৎকারিত্ব ও কুশলতা আমাদের মুগ্ধ করে। যে জীবন, যে সমাজ, যে ব্যক্তি অফুরাণ, অগাধ, নিগূঢ়, শাস্বত যা সত্য-মিথ্যা, প্রেরণা-কুহকের আচ্ছন্ন তাঁর একটা স্পষ্ট ছবি আঁকছেন, অভিনব কৌশলে। এক তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিবাচনিকতায় সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার বিমূর্ত ও স্পষ্ট রূপ সম্পৃক্ত হয়েছে তাঁর আত্মবীক্ষায়। নান্দনিকতার পরিপাটে। আসলে সাংবাদিকতা, দীর্ঘ অধ্যাপনা, রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব, নানা অভিজ্ঞতায় তাঁর মধ্যে একটু একটু করে তৈরি হয়েছে জীবনের প্রচুর ঝাঁপি, যাতে সমাজের সরল ও জটিল অবস্থান, মুখ ও মুখোশের আড়ালে মানুষের বীভৎস রূপ অফুরান বৈচিত্র্যে স্থান পায়।

কবি গণেশ বসুর কবিসত্তায় প্রথম থেকে প্রতিফলিত হয়েছে অভিযোজিত সমাজ-বাস্তবতার ভিতরকার অপর এক বাস্তবতার অন্বেষণ। ষাটের দশক থেকে দ্রুত বদলে যাওয়া বিশ্বের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক প্রকোষ্ঠগুলি যখন দ্রুত ভেঙে যাচ্ছিল, ভেঙে পড়া কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে মানুষ যখন অনিশ্চিত সম্ভাব্য ও নিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে সেই অস্বাভাবিক, পরপর বিচ্ছিন্ন অথচ সংলিপ্ত এক ঘেরাটোপ পরিবেশ কবির কবিতার বিষয়ে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে।

ফলত কোথাও কবিকণ্ঠের অমোঘ উচ্চারণ দৃশ্যমান, আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন থেকে সেই উচ্চারণ কবিতার মূল বয়ানের যাত্রাপথকে চিহ্নিত করে। আসলে সময়, সমাজ ও নান্দনিকতার সমসত্ব দ্রবণ নির্মাণে কবির অভিনিবেশ কখনো বিচ্যুত হয় না, ভাষার গ্রন্থনায়, বিষয়ের প্রতিষ্ঠায়, অন্তর্বয়নের বহুবাচনিক উপস্থাপনায়, প্রকরণের স্তরান্তরে সবক্ষেত্রেই কবি গণেশ বসু স্বতন্ত্র, অনন্য উপস্থিতি নিঃসন্দেহে এক অন্য বিশ্বকে নির্মাণ করে, প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে কবিসত্তার বৈদগ্ধ্য ও অনুভূতির সংশ্লেষে গড়ে ওঠা কবিতার আবাদ-ভূমি।

তাঁর কাব্য পরিক্রমায় নানা অভিজ্ঞতার বহুরৈখিক ও বহুবাচনিক বুনটের স্তর থেকে স্তরান্তরে সংবেদনশীল আগ্রহী পাঠককে নিরন্তর পথ চলতে হয়, খুঁজে নিতে হয় বয়ন ও নন্দনের ভিতরকার সম্ভাবনা ও ইঙ্গিতের দ্বৈরথকে। পর্ব থেকে পর্বান্তরের ধারাবাহিক যাত্রাপথে কবির সহযাত্রী হয় তাই পাঠকও, আলোচ্য নিবন্ধ 'নীরব সন্ত্রাস' (১৯৯৯) কাব্যভাবনার অন্তহীন বৈচিত্র্যের আস্তরণ সরিয়ে কবিকে ও তাঁর সৃষ্টিকে দেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

(২)

'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার,
বিষণ্ণ প্রেমিক জানি এই কথা বলে
নিভৃতে মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে, করুণা সবার
শেষ হয় পৃথিবীতে অন্ধশোকে মৃত্যু তার হলে
কিছুই রহে না জানি, সব কিছু বড়ো স্মৃতিময়
মনে হয় শূন্যতায়, তুমিহীন কাটে না সময়।'

(বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-১)

এই অনুভূতিনিবিড় উচ্চারণে প্রেমের সঙ্গে মিশে থাকা জীবন-মৃত্যু সমার্থক হয়ে আসে, গোপন আর্তনাদে ধ্বনিত হয় কবির একলা মনের নিঃসঙ্গতা। কবিতার ভাষা বাস্তুচ্যুত মনের গভীর উপলব্ধি, গূঢ় ব্যঞ্জনা,— পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বকে পাথেয় করে প্রবাহিত হয় চেনা-অচেনার গতিপথে, সেই পথের গভীরে গোপনতা, বিক্ষত যন্ত্রণা, শিহরন, অভিমান এবং আরো যা কিছু রোমান্টিক দহনের উপাদান হিসাবে থাকে, তাকেই কবি এক আত্মীকরণের ধারায় কবিতায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে রোমান্টিকতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, ভালোবাসার যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুবোধের সংশ্লেষ।.... তাঁর কবিতার প্রতিবেদনে মিশেছে প্রেম, প্রশান্তি আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা, কখনো তাঁর কবিতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ব্যর্থতা, স্বপ্ন, স্মৃতি, যন্ত্রণার পূর্ণ নীরবতা। কবির কবিতাপাঠে মনে হয় কবি বোধহয় আবিষ্ট হয়েছিলেন জীবনানন্দীয় বোধে। তাঁর জীবনের

প্রথম কাব্য 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কবির নিজস্ব উপলব্ধি ও অনুভূতির লাবণ্য পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে রয়েছে ভালোবাসার এক নিভৃত আলাপচারিতা,

ক. বড়ো ভালোবাসি আমি ভাস্করিত গোলাপের উজ্জ্বল শোণিমা,
যেখানে তোমার মুখ আলোকিত অপূর্ব অদ্ভুত,
তুমি তো জানো না হায় হৃদয়ের মর্মজ্বালা প্রবল প্রতিমা
নির্জনে কেমন কাঁদে স্বর্গচ্যুত শান্ত দেবদূত।' (বনানী কবিতাগুচ্ছ-৮)

খ. 'ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা।'

(বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-১২)

গ. 'কী নিবিড় মায়ামন্ত্রে ভুলায়েছো, যাহার প্রতাপ তোমার,
হৃদয় ভিন্ন আর কোনো হৃদয় ভাবিতে কখনো পারি না আমি।' (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-১৪)

ঘ. 'চাহি সে দুর্লভ রৌদ্র, প্রেম যার সতর্ক প্রহরী
নিভৃত কোরকে তুমি ভালোবাসা রাখিও সুন্দরী।' (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-২৮)

ঙ. 'এখনো তোমার চোখে কাশফুল রয়েছে অক্ষয়
শিরা উপশিরা ছিঁড়ে চাই চাই তোমার আশ্রয়।' (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-৩৬)

এক প্রেমিকের অভিমানী হৃদয়ের উচ্চারণ রয়েছে কবিতার মধ্যে। কবির আহত প্রেম বেদনার সুরে সুর মেলায়। প্রেমিকাকে না পাওয়া কিংবা পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা শব্দবাহিত চিত্রে বিরহসন্তপ্ত রূপকথার জন্ম দেয়। তবু কত যন্ত্রণা বা শত আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও কবি প্রেমকে জেনেছেন শাশ্বত রূপে। তাই 'অশ্রুময় সজল স্মৃতির বেদনা এ বুকে নিয়ে' বিরহের মধ্যে প্রশান্তির আশ্রয় খুঁজেছেন, বলেছেন, 'কিছুই চাহিনা আমি, চাহি শুধু ভালোবাসা, বনানী তোমারে।' এক প্রেমিকের নিবিড় আত্মকথন চেতনার গাম্ভীর্যে, বিষাদের দ্যোতনায় এক নতুন রূপের আয়োজন করে।

কবি গণেশ বসুর কবিতায় রচিত, হয়েছে প্রেমের বহুমাত্রিক স্তরপরম্পরা। কোথাও ভালোবাসা পাওয়ার তীব্র বাসনার কথা, কোথাও অতীত কোনো স্মৃতি কবিকে ব্যথাতুর করেছে, কোথাও বিরহের ক্যানভাসে ধূসরতার ছড়াছড়ি, আবার কোথাও একটু সহজ বিশ্বাস অন্বেষণের নিবিড় আকুতি। কিন্তু তাঁর কবিতা কি শুধু কবির রোমান্টিক মনের আলাপচারিতা। নাকি বিরহের বাঙময় প্রকাশ অনতিক্রম্য সত্যের নেপথ্য চারণা কি এতে বিমূর্ত থাকে না, এ ভাবনা নিতান্ত অমূলক। বরং কবি প্রেমিকার ভালোবাসা ঘেরা স্মৃতির-সারণি বেয়ে বাস্তব

অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রেক্ষিত বা বিশেষ মুহূর্তকে একক ভাষারূপে গড়ে তোলেন। কবির চোখে বনানীর মুখ সময়- পরিসরের অনাবৃত রূপ, যে রূপে ছিন্নমূলের যন্ত্রণা যেমন আছে, তেমনি আছে নগ্ন বাস্তবের সত্য-মিথ্যা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলো-অন্ধকারময় বহুপ্রকোষ্ঠের ছবি— 'জাহাজ তোমার কোন বন্দরে ভিড়িবে/ কোন্ উপকূলে? বনানী এখন বলতো!/ হিংস্র নখরে কেবলি কি পাল ছিঁড়িবে?/হৃদয়ে রহিবে সংশয় শুধু সতত?' (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-৪) অথবা 'স্বদেশ' ছেড়েছি কবে আপাতত উঞ্ছজীবী আমি/ সন্ধ্যায় তোমার কাছে পেয়ে যাই অন্য পরিবেশ/এলাচের গন্ধ ওড়ে কাঁসার শরীর থেকে, দামি/জড়ানো শিল্কের শাড়ি, তুমি যেন সজ্ঞান স্বদেশ' (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ-৩৭)— এক গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে স্মৃতির বেসাতি কবির দ্রষ্টার উদ্ভাসনী-আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে।

'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'-এর ভালোবাসা সঞ্জাত জীবনদর্শন যে মৃদুভাষ্যে পাঠকের অনুভবের নিত্যনতুন দ্বার খুলে দিয়েছে, সেই দ্বার খোলার ধারাবাহিকতা 'নীরব সন্ত্রাস'-এর কবিতারাজ্যেও লক্ষ্য করি। বহিরঙ্গ সর্বস্ব ভোগবাদী জীবন, ভোগাকাঙ্ক্ষী পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন, ক্ষমতায়নের নিকৃষ্ট রূপ, ক্লীবতা, হৃদয়হীনতা কিংবা মনুষ্যত্বের গলন-পচন-হৃদয়ের উন্মত্ত যন্ত্রণার স্পর্শে, বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে কবিকে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, কবিকে নতুন জীবন দেয়, নতুন করে ভাঙা পৃথিবীকে চিনতে শেখায়। জীবনের আত্মদীর্ণ কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ মুহূর্তের দহনকথার আত্ম-উপস্থাপনায় কবি গণেশ বসু একজন ব্যর্থ প্রেমিক, তাই রোমান্টিকতার সমান্তরালে আধখাওয়া জীবনের কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের কোলাজকে তিনি পৌঁছে দেন রক্তমাংসের মানসীর কাছে, যেমন—

ক. 'তুমিই ঘন মেঘের চুড়ো, মেঘের গাঢ় ছায়া
সন্দীপিত দ্বিধায় থরো থরো
বুকের শিরা ছিঁড়ে বানাও কখনো মন্দিরা
সঞ্চারিত অবিশ্বাসই জড়ো (ট্রাজেডি/ নীরব সন্ত্রাস)

খ. 'তোমার পায়ে ছন্দ রচি, তোমার পায়ে লিখি
রেখো না আর ভয়
মেপেছি আমি অন্ধকার, গুহার জটাজাল
গভীরতর নয়।' (প্রার্থনা/নীরব সন্ত্রাস)

গ. 'তোর হৃদয়ে মেঘের ছায়া খুঁজি
বৃষ্টি পদাবলি

তোর বাহুতে নদীর ভাষা খুঁজি
মাটির কথাকলি।' (চিরজীবিতেষু/নীরব সন্ত্রাস)

ঘ. 'তোমার ভিতে আমার কত অশ্রু জমা
খাঁ খাঁ বুকের শুকনো পাতা জীবন্মৃত দুঃখ অমা।' (তোমার বাড়ি/ নীরব সন্ত্রাস)

ঙ. '.....মুখোশের ভার
বয়ে যাই চারুলতা, কোথায় পালাবো বলো, জাগে হাহাকার
কে আর হৃদয় বোঝে, আমাদের রক্তে কাঁদে ভ্রষ্ট নষ্টনীড়।' (নষ্টনীড়/নীরব সন্ত্রাস)

চ. 'কেন এত জটিলতা অভিমান তোমার হৃদয়?
কেন ভালোবেসেছিলে, ভালোবাসা অন্ধকার অলীক অধরা?
কত জ্বালা, ঈর্ষা, বুকে কত অপবাদ বয়ে ক্ষয়ে যেতে হয়?' (চন্দরা/নীরব সন্ত্রাস)

ছ. অর্জুন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনে খেতাম কামরাঙা
ডাগর চোখে সে তারিয়ে তারিয়ে দেখতো আমায়
তার চোখে উছলে উঠতো নিশিন্দাপাতার মায়া।' (খরা/নীরব সন্ত্রাস)

নিজের ভালোবাসার ঘরে নিঃসঙ্গ কবি প্রকৃতির নানা অনুসঙ্গে প্রিয়তমাকে খুঁজেছেন, খুঁজতে খুঁজতে জীবনের নয়াচরে জেগে ওঠা বদ্বীপের অন্তহীন দহনভরা কথকতায় তাঁর আকাশ বেদনাবোধের রামধনুতে সুগন্ধিত হয়ে ওঠে। রক্তমাংসে, দেহে মনে নারীর ভালোবাসার মাঝখানে জীবনের ঘ্রাণ, দীর্ঘনিঃশ্বাস রূপে ঝরে পড়ে, মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সাক্ষী রূপে সংশয়-সন্দেহ মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রেমিকার রূপকে ভালোবাসার বিষযাপন, জগৎ ও জীবনের ধূসর শূন্যতা ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবে স্বীকার্য। বিবর্ণতায় তাঁর কবিতা-শিল্পের ঝলক স্তিমিত হয়ে যায় না। বরং আবেগের উদ্‌গীরণের সঙ্গে বয়নশিল্পের দক্ষতায় তাঁর কবিতাগুলি বর্ণসমুজ্জ্বল শব্দের রঙে সমুদ্ভাসিত।

শব্দ ও নৈঃশব্দের যুগলমিলনে বেদনার্ত চৈতন্যের দহন-পীড়ন কবির মননে-চেতনায় অবিশ্রাম বয়ে চলা এক নিঃসঙ্গ নদীর আত্মকথা যেন। সেই আত্মকথায় প্রতীক ধর্মিতা, স্পর্শময় ইঙ্গিতে সঘন শব্দরাজি, শব্দ ও ভাষার মহাসঙ্গম বাক্-সাগরের উৎসমুখ খুলে দেয়। জীবনের গভীরতম আকুতি, সেইসঙ্গে সময়ের আবহসঙ্গীত ধ্বনিত মাধুর্যে, ছন্দের হিল্লোলে, দৃশ্যকল্পের দোল-দোলায় অনবদ্য রূপ লাভ করে।

জীবন ও মনের অসহ্য পরিস্থিতি, সমাজের পচা শরীরের বীভৎস সংক্রমণের সব খুঁটিনাটি কেমন করে ঢুকে পড়ে কবিতার অন্দরমহলে, কেমন করেই বা তাঁর সৃষ্টির সত্যভাষ্যে শ্লেষ বিদ্রুপের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে সহানুভূতি ও মরমিয়া আর্তি বিরহ প্রেমের অনুকম্পা ও দরদ তারই এক বিশ্লেষণী প্রত্যয় উপপাদ্যের মতো

নিয়ে এসেছেন কবিতায়। তাই এত আবেগ, এত যন্ত্রণার গোপন ক্ষরণে শব্দের অবয়বে লেখে কবিতার এপিটাফ।

কবি গণেশ বসু তাঁর কবিতায় খন্ডদৃশ্যকল্প নির্মাণে মন না দিয়ে একটি পূর্ণ বৃত্তাকার বক্তব্যবাহী দৃশ্যকল্প নির্মাণে মনোযোগী হয়েছেন। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি, ঐতিহ্য, পরম্পরা, স্বপন সব উন্মূলিত করে দিয়ে নগর-কলকাতার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হতে গিয়ে রাজনীতিক সর্বাত্মক সন্ত্রাস এবং গিরগিটিরূপী নরদেহের তাণ্ডব কবিকে নরকের নিরন্ধ্র অন্ধকারে তলিয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে এক জীবনের সময় সীমার প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন ও স্মৃতির মগ্নতায় অবগাহন করে ডুবুরির মতো শব্দের ঐশ্বর্য তুলে আনেন কবি। আর সেই শব্দের মায়া ছাড়িয়ে অর্থের গভীরতার মাত্রায় বক্তব্য বিষয়কে কবি নিয়ে যান পাঠকের হৃদয়ের মর্মস্থলে। তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে কবির জীবন-আকরের অনেক আখর।

(৩)

'মুখোশ, আমি দেখতে চাই তোমার মুখ
ছিল কি লাল, ছিল কি নীল গভীর সুখ
অথবা কিংশুক?' (মুখ ও মুখোশ/নীরব সন্ত্রাস)

—আমাদের সমাজের একাধিক মুখ, অনেক শিল্পিত মুখোশ, অন্তর ও বাইরে বিস্তর পার্থক্য, ভাবনা ও প্রয়োগে এক বিপুল অসামঞ্জস্য। কীটদৃষ্ট সময়ের ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বিরোধ বা অন্ধবিন্দুগুলি চোখে আঙুল দিয়ে চেনাতেন চেয়েছেন কবি গণেশ বসু। মানুষের অনৈতিক উপস্থিতি, শাসকের কপটতা, নৈরাজ্য, অনিশ্চিত আগামী—অনিবার্য কিছু সংকটের নখদন্তবিস্তারী থাবায় মানুষের পৃথিবীতে লোভ-রিরংসার বীজ সদম্ভে উপ্ত হয়েছিল। অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে সময়-সময়ান্তরে পরিব্যাপ্ত হয় মননবিশ্বের পঙ্গুতা, স্খলন, বিচ্যুতির ও অপূর্ণতার কিশলয়, দুর্ণিবার হয়ে ফুটে ওঠে আত্মবিনাশের কোরকগুলি। ফলত বামপন্থী ভাবনায় বিশ্বাসী কবিমনে, মেধায়, অনুভূতিতে রাজনীতির জট-জটিলতা, সামাজিক অন্ধত্ব এবং অভিজ্ঞতার উচ্চতা বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়েছে। বাঙালির ক্রমজায়মান অভিব্যক্তিতে রাজনীতির অজস্র সুড়ঙ্গপথে কীভাবে দিকভ্রষ্ট হচ্ছে, রাজনীতির অন্তঃস্বর কীভাবে পাল্টে দিচ্ছে চেতনা-চৈতন্যের সরগমকে তারই মুর্চ্ছনা শুনতে পাই 'নীরব সন্ত্রাস'-এর পাতায় পাতায়।

দানবায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান নির্ভরতায় সাধারণ মানুষের দমবন্ধ হয়ে যায়। নৈরাজ্যের অন্ধপ্রহরে দাঁড়িয়ে রাজনীতির মদতপুষ্ট কিছু মানুষ বিবেকশূন্য লুব্ধতাকে প্রকাশ করে। তাই কবি তথাকথিত কমরেডদের উদ্দেশ্য বলেন,

'তুমিই দেখি জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে করো খাক,
পাঁজরে-কাঁপা সুখের দিন ধু ধু
বাঁকানো ছোরা চালিয়ে যাও, গুঁড়িয়ে করো ধুলো
তুষের মতো ঈর্ষা জ্বলে শুধু।' (ট্রাজেডি: নীরব সন্ত্রাস)।

—রাষ্ট্রের দানবিক পীড়ন, 'সুখ বিলাসী' কমরেডদের তিমিরবিলাস সংবেদনশীল কবিমনে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। সংবেদনার অভিঘাতে তিনি প্রাণ-স্পর্ধায় লেখেন, 'বুকের শিরা ছিঁড়ে বানাও কখনো মন্দিরা/সঞ্চারিত অবিশ্বাসেই জড়ো' (ট্রাজেডি) রাজনৈতিক নেতাদের অবনমন, নেতি ও নৈরাজ্যের চোরাবালিতে ডুবতে থাকা মূল্যবোধ, জনগণের সামনে সত্যভ্রমের প্রিজমে নির্মাণ—এসব দেখি কবি নিজের ভেতরকার ক্ষোভের ছাইচাপা আগুনকে খুঁচিয়ে দিতে লেখেন, 'কখনো ফের লুকোনো ঘৃণা লুব্ধ প্রতিষ্ঠায়/অন্তরিন কিংবা পারমিতা/জীবন বড়ো জটিল ধাঁধা, কে যেন কড়া নাড়ে/খিদের গ্লানি নাকি সে বৈরিতা' (ট্রাজেডি) এক গভীর সংশয়ে আচ্ছন্ন কবিমন স্মৃতি-তন্ত্রীতে শুনতে পায়, 'চেতন অবচেতন জুড়ে সেতার বেজে চলে।' (ট্রাজেডি) এক ধ্বস্ত সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে সবকিছু মূল্যহীন বলে মনে হয় কবির। সুখে থেকো শ্রেণি-সংগ্রামের চেতনায় লালিত কবি প্রত্যক্ষ করেন, ভোগবাদ সর্বস্ব জীবনের নগ্নতাকে, "রিমোট কন্ট্রোলে চলে সব কিছু, আভাময় তোমাদের দিন। উড়ে যায় কনকর্ডে, ঘিরে থাকে বিলাসের সর্বস্ব মাতন।" (সুখে থেকো/নীরব সন্ত্রাস)

রাজনৈতিক সমাজের এই বিষণ্ণতা, গ্লানি, অন্ধকার, কুশ্রী রূপের চলচ্ছবিকে নির্মাণ করেছেন সচেতনভাবে।

যে সব সহজ পরম্পরাকে রাজনৈতিক দম্ভ চরম ঔদ্ধত্যে মুছে দিতে চেয়েছিল সেই মর্মান্তিক সত্য উন্মোচনের দায়িত্ব নিয়েছেন যেন কবি। তাঁর কবিতা প্রমাণ করে রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্কাঠামোর চিরাচরিত শোষণের, শাসনের অচলায়তনের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তিনি তো জীবনজিজ্ঞাসায় দেখেছেন, বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ও সামাজিক প্রতাপের চক্রব্যূহে বাঁধা পড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন, রঙিন মুখোশের আড়ালে অজস্র রেখার ভিড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠা তিক্ত মুখের চিহ্ন, 'সমীক্ষায়' নির্ভার বিশ্লেষণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, 'মুখের ভিড়'। মুখোশেরও। চেপে বসছে শঙ্কা। নীরব সন্ত্রাস। মর্মঘাতী স্বপ্ন। সমীক্ষায় হাহাকার ছড়ায় 'নিদ্রাহীন কাক' (সমীক্ষা) কাব্যপ্রতিম গদ্যে নির্মিত 'সমীক্ষা'র দৃশ্যপট যেন তাঁর যাপনের, দর্শনের গর্ভগৃহ। কবিতায় প্রত্যেক উপশিরোনামে হৃদয় ও মেধার সখ্য মিশিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক স্তর যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার কিংবা মুখোমুখি বসার নিরেট দর্পণ, তাই তো 'ফলাফল'

উপশিরোনামোল্কিত অংশে কবি বয়ানের উপযোগী ইঙ্গিত তৈরি করে দিতে দিতে বলেন,

১. 'পঞ্চাশ বছর ধরে গড্ডল প্রবাহে গেল স্বপ্নের শ্লোগান
২. শিকড়ের টান আজো মনিকর্ণিকায় জ্বলে, তবু সব ভালো
৩. মানুষের করতল ভূমধ্যসাগর।' (সমীক্ষা/নীরবসন্ত্রাস)

এ যেন কবি-জীবনের ইস্তেহার। শব্দের ভিতর জায়মান দার্শনিকতা অজস্র সম্ভাবনা ও আশঙ্কাকে মিলিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, সমাজপৃষ্ঠে তৈরি হওয়া নীরব সন্ত্রাসের গভীর খত যেন এক আততায়ী, যাকে অনুসরণ করে চলেছে হত্যা-প্রতিহত্যার রাজনীতি, নীরবে নিশ্চুপে।

কর্পোরেট জীবন, দুর্নীতিপ্রবণ আমলাদের নির্লজ্জ লোভের প্রকাশ কবি হৃদয়কে আন্দোলিত করে, আত্মার বিরাগ ছাড়িয়ে তাঁকে পৌঁছে দেয় বিদ্রুপের শাণিত ফলায়, 'ফাইলের ভাঁজে ভাঁজে টাকা ঘোরে— স্পিড মান্টি টি.ভি. ও বেতার/সন্ধ্যায় ঘোষণা করে বেনিয়ম বাড়ি সব ভাঙা হবে, হাহা করে হাসে/ আমার পাশের বাড়ি,/আমার বাড়ির পাশে খেলা করে অরণ্যের লেটেস্ট গরিলা।' (পাশের বাড়ি/নীরব সন্ত্রাস) 'অরণ্যের লেটেস্ট গরিলা'কে মানুষের হিংস্র জন্তুর রূপের প্রতীকী দ্যোতনায় নির্মাণ করেন তিনি।

'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যগ্রন্থের এক-একটি কবিতায় কবির আত্মপ্রক্ষেপণ অনায়াসভাবে উঠে আসে, মুখ ও মুখোশের সন্তর্পণে কবির বোধে তিক্ততার এক বাতাবরণ তৈরি করে। সেই কর্কশতায় কবি কবিতায় বন্দী করেন এক আশ্চর্য দক্ষতায়,

'নেই সে মুখ, নেই সে মুখ কেমন সাজ
রঙবেরঙ মুখোশ পরা এই-সমাজ
আত্মঘাতী আজ' (মুখ ও মুখোশ/নীরব সন্ত্রাস)

—যাবতীয় মুখোশ ছিন্নভিন্ন করে দেয় বোধির ভুবনকে। মূল্যবোধহীন ভন্ড মানুষের ছবি হিংস্র সময়কে কবি নির্মাণ করেন শব্দের আশ্রয়ে। কখনো বা শব্দের ছায়ার আড়ালে,

'মুখোশ ও রকমসকম
দেখে যে লজ্জা পেল
নেতাদের এ চালচলন
কীরকম এলোমেলো'

—কবি গণেশ বসুর কবিতা পড়তে পড়তে চল্লিশের অগ্রগণ্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু অসামান্য কবিতাময়, বিদ্রুপপ্রবণ অনুচ্ছেদের কথা মনে পড়ে

যায়— সেখানে সরকারি অনুগ্রহলোভী, হঠাৎ বামপন্থী বনে যাওয়া কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষের ভণ্ডামির কথা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে,

নেতা হলে পাটিতে।
পা পড়ে না মাটিতে
অথবা 'ট্যাকেকড়ি, হাতে দড়ি, মুখে হরি
অর্থাৎ কিনা, 'যার যা আছে হরণ করি'।

আজন্মলালিত যে রাজনীতির দর্শন কবিসত্তাজুড়ে, তাকে তিনি ছেড়েছিলেন ভিতরকার দ্বন্দ্ব বিরোধ-বিপর্যয়কে বুঝে নিয়ে। স্পষ্ট আক্রমণের ভাষায় তিনি লিখেছিলেন, 'লোভের কাঁটামারা জুতোগুলো/পায়ে পায়ে বেঁধে/ছিঁড়ছে' নীতিবর্জিত সুবিধাবাদী দল যখন উপড়ে নিচ্ছে রাজনৈতিক বিশ্বাসের শেকড় তখন একই রকমভাবে কবি গণেশ বসু তাঁর ভিতরকার যন্ত্রণাকে গড়ে তুলেছেন বিদ্রুপের আগুনে,

'চুটিয়ে সুযোগ নেবে
খোঁয়ারে গলাগলি
দেশটা কি বিকিয়ে দেবে?
না এটা কানাগলি?
জিগ্যেস করো সেইসব কমরেডকে
যারা ফোপরা করে দেয় সমাজতন্ত্রের ভিত
যারা আদর্শের বুলি কপচে দাপিয়ে বেড়ায় কাট্‌মানিতে
যারা নামতে নামতে
নামতে নামতে
গড়ে তোলে আমলাতন্ত্র

কিংবা মানুষ যখন আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুল হয়ে যায়, একজন দায়বোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে, সংবেদনশীল কবি হয়ে কি মুখোশের ও মুখোশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না? কবি গণেশ বসু কবিতার প্রতিবেদনে নানা জিজ্ঞাসার বিচিত্র সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন, মুখ ও মুখোশের নিরন্তর লড়াই দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই কবিতার শেষ পদে— সেখানে কবির নির্ভীক উচ্চারণে ঘাতক মানুষের জান্তব উপস্থিতি আমাদের চমকে দেয়,

'বলবে, তারা বলবে
সন্ত্রাসের থেকে ফের জন্ম নেয় আরেক সন্ত্রাস
বলবে তারা বলবে
নীরব সন্ত্রাস আজো বর্ণময় খরার দাপটে।' (বলবে তারা বলবে)

সন্ত্রাসের তীব্রতা কিংবা সংকটের জটিলতায় কবি বিমূঢ়, নির্বাক। সমাজের প্রবল ভাঙা চুরে কবি লক্ষ্য করেন 'নগ্নতাই সেরা সুন্দর', অনুভব করেন 'তমসার নির্জনতা' রূপী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকট অন্ধবিন্দু 'কুরে খায় উজ্জ্বল সুন্দর,' সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তির গর্জন ও তাদের নগ্নতার বহুমাত্রার সংযোজনে ব্যথিত কবি অভিমানে বলেন, 'বুঝবে না তুমি বুঝবে না/এ বুকে বিয়ের কুম্ভ তৈরি/আপনা মাংসে হরিণা বৈরী/বুঝবে না তুমি বুঝবে না,' (সুন্দর ও মৃত্যু) মানুষের গভীরতর প্রদেশের অনবরত পরিবর্তন, তাদের জটিল চেহারা, কুটিল বিভঙ্গে সমাজের হৃৎপিণ্ডে সে প্রবল ধাক্কা আসছে তাতে কবি আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত, 'ভয় পাই,/এখন তোমাকে ঘিরে খালি ভয়, তুমি বিভীষিকা'। তাই কবি প্রশ্ন করেন, জীবন ঠিক কীরকম— 'এভাবে কি বাঁচা যায়? একে কি জীবন বলো তুমি/নীরব সন্ত্রাস চলে চরাচরে, মাথার ভিতরে দ্রোহ, জ্বালা,/গূঢ়তর অভিমান, পায়ে পায়ে শিকলের শব্দ জাগে, পরতে পরতে/কাঁদে/একা একা হাহাকার দিনগুলি, বক্তব্যহীন।' (নীরব সন্ত্রাস) পরিবর্তনমান ইতিহাসে স্মৃতির ভূমিকা তাৎপর্যময়। অতীতের অভিজ্ঞতা ও অনুভব বারবার ফিরে ফিরে আসে, কাঙ্ক্ষিত বদল তো নিজের নিয়মে ঘটে না। বরং ক্ষয়ের বা বিনাশের দিকে ছুটে চলা সময়কে, সভ্যতাকে দেখতে দেখতে কবি লেখেন,

মনান্তর কি ঘটেছো কখনো? মতান্তর
মেঘের পোশাক পরে নিয়েছিল জারুল ফুল
কুর্নিশ আমি পারি না করতে নিরন্তর
কোন্ অভিশাপে ভ্রষ্টলগ্ন কাদের ভুল?' (একদিন ছিল)

রাজনীতির পণ্যায়নে, ঐন্দ্রজালিক সময় বাস্তবতায় কবির রাজনৈতিক দর্শন দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, কবি তাই প্রতিতুলনায় দেখতে চান পুরানো-নতুনের তফাৎকে এপাশ-ওপাশ থেকে, উপর থেকে নিচে, 'তারপর এল, এল তারপর নষ্টদিন,/যদুবংশের মিছিল চলেছে অন্ধকার/একদিন ছিল আমাদের দিন ঝড়ের মুখ/একদিন ছিল আমাদের দিন অলংকার।' (একদিন ছিল) সময়ের বড়ো পালাবদলের সঙ্গে নতুন খাতে চলা রাজনৈতিক ভাবনাকে কবি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্র জুড়ে ভন্ড মানুষের, ছদ্মবেশী রাজনৈতিক নেতাদের অবাধ রাজ্যপাটকে সময়ের অভিজ্ঞান রূপে নির্মাণ করলেন, লিখলেন মহাসময়ের ইতিবৃত্ত, 'প্রভু, তুমি বদলে গেলে, বদলে গেলে/অস্ত্রগুলো কোন্ শ্মশানে রাখলে ফেলে?/নিজস্বতায় অন্ধ/পাঁজর জুড়ে কুঠার কাঁপে বন্দি জরাসন্ধ।' (প্রভু) কবির পাঁজরে ভেঙে শুষে নেয় জীবনের রস ও রসদ— আর কি থাকে বাকি! সময়ের-সমাজের শূন্যায়তনে ডুবতে ডুবতে কবির মনে হয়, 'প্রভু, মেরুদণ্ডে পাপ/ স্বপ্নসম দেখা এখন পাপ/গানের সুরে ঘুন ধরেছে/ঘুমেও

অভিশাপ'। (প্রভু) কবিতার কোষে কোষে তিক্ততা-বিষাদের ঢের আয়োজন। এমন নিষ্ঠুর সময়ের উত্তাপকে প্রত্যক্ষ না করলে সমাজের মানুষের বিকারের রূপকে এভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না। সময়ের পরাক্রান্ত শক্তি কিংবা সমাজ মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা কবিকে ভাবিয়েছিল, জীবনের পরিণত পর্বে 'এলোমেলো' তে তিনি একেক শিরোনামে পঙ্‌ক্তিমালা লিখলেন তা বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের অমরকোষ। নৈতিকতা-আগ্রাসী ভোগবাদের বিষজীবাণু শ্বাস-প্রশ্বাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আত্মসর্বস্বতার এককেন্দ্রিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বেপরোয়া লুণ্ঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের বিশ্বাস, বিকিয়ে যাচ্ছে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠে। চোখ ধাঁধানো শাসনের দাপটে ভেঙে পড়ছে দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ, 'এলোমেলো' কবিতা এরই গুরুত্বপূর্ণ কোলাজ। কবির ধিক্কার ক্রোধ-যন্ত্রাণা-শ্লেষের সম্মিলিত প্রকাশ ঘটেছে শব্দচয়নের বেপরোয়া সাহসে, বাক্যবন্ধের অপূর্ব গ্রন্থনায়:

১. 'ইতিহাস।
উত্তাল ঢেউয়ের শীর্ষে লুটোপুটি' বিভ্রান্তিবিলাস
ব্যূহচক্রে কাঁদে ইতিহাস।'

২. 'পোখরান।
.....মিথ্যে বানানো ধ্বংসের জুয়াখেলা
হাজার দুর্যোধন
বিষাক্ত বীজকে বোনো মগজে কেন
শ্মশানে সমর্পণ?' (এলোমেলো)

—বিভ্রান্ত, আত্মবিক্রীত রাজনীতির প্রতীক এই কবিতাগুচ্ছ। যে ক্ষমতার প্রচ্ছায়ায় নিরাপত্তা ছিল, ছিল স্থিরতা—কবি দেখেছেন সেখানে নষ্টামির দূষণ। ক্ষমতা আজ কিনে নেয় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের স্মৃতি-হৃদয় স্বপ্ন-আত্মাকে, 'ক্ষমতাই এখন অফিস/ক্ষমতাই বন্দুকের নল/ক্ষমতাই ছেঁড়া বাসি রুটি/ ক্ষমতাই দু'চোখে জল' (এলোমেলো) সত্য নৈতিকতা প্রগতি-বিপ্লবের মহাযুদ্ধকে স্মরণ করে, সংশয়ে-বিষাদে-বিপন্নতায় বুকভরা অভিমানে কবি বলেছেন, 'থামুন, এবার থামুন দ্বিচারিতায় সওদা ছেড়ে এবার পথে নামুন'। এলোমেলো সরষের ভিতর ভূত ঢুকিয়ে দিয়ে যারা সমাজব্যবস্থাকে অপস্মারে পরিণত করে, মানুষকে অসহায় করে প্রতিষেধককে লুকিয়ে রাখে লোভের গহ্বরে, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দেন, 'ফেরার সময় আর বেশি নেই, মনে রেখো বেশি দেরি নেই/ মানুষের পাশ থেকে সরে গেলে মানুষ থাকে না কিছুতেই' (জমি)— কবির প্রকাশভঙ্গির ভিন্ন স্বরক্ষেপণে এক নতুন ইশারা খুঁজে পান পাঠক। তামসিকতার গাঢ়তায় আচ্ছন্ন

মানুষের, সময়ের কথামালা গভীর সংবেদনার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। এভাবে অসুস্থ সময়ের বিপুল প্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে কবি যেন সমাজ-সভ্যতার ও ব্যক্তিমানুষের অসুখের আকাইভ নির্মাণ করেন।

(৪)

সময়ের বৈচিত্র্যময় স্বভাব, নানারূপী বিভঙ্গ। সময়ের এই বিভিন্ন প্রেক্ষিতের মধ্যে সংঘর্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠল এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কবি কীভাবে গভীর ভাবনা ও সময়ের মুখোমুখি হচ্ছেন? ষাটের দশকের প্রহর থেকে জটিল মানসক্রিয়ার দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের মধ্যে সময়ের বিনির্মাণ গণেশ বসুর মতো কবির অন্বিষ্ট। তাঁর কবিতা আমাদের অবরুদ্ধ দৃষ্টিকে মুক্ত করে, সত্যভ্রমের মোহজালে বন্দী নিভৃত সত্যকে উন্মোচিত করে সময়ের আধারে। তিনি অনুভব করেন, ভাঙনেও ভাসানের বেলায় বুকের ভিতর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, 'ফোররা হয়েছে হাড়গুলো'। (ক্লান্ত দিশাশূন্য) সময়ের শূন্যতায় কবি খেয়াল করেন, 'পতন শুরু হলে পতন থামে না।' বিভ্রান্ত কবি এক সংশয় দীর্ণ সংকেতে প্রকাশ করেন, 'কথা বলার মতন মানুষ কোনখানে পাই/সামনে কটি জিরাফ হাঁটে, জেব্রা ডাকে/ গনগনে আঁচ নক্‌শিকাঁথায় কেই বা রাখে/... কার কাছে যাই,/কার কাছে যাই, আজকে বলো' (উত্তর পঞ্চাশ) ফাঁপা মানুষের ভরা পৃথিবীর গর্ভগৃহ। এদের চেহারা, আচরণ ইঙ্গিতে, প্রতীকে হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার কুশীলব। তিনি মনুষ্যত্বের স্তবগানে বিশ্বাসঘাতক মানুষকে জাগরিত করতে চেয়েছেন। কারণ আত্মজিজ্ঞাসায় কবি দেখেছেন আত্মিক বিপর্যয়ে মানুষ আর মানুষ থাকেনা, 'ক্ষমতার স্বাদ পেলে কেউ কেউ হয়ে ওঠে মাতাল গণ্ডার' (গণ্ডার) মানুষের পাশবিকতার নগ্নতা শব্দের বহুমাত্রিকতায় রক্তে ঢেউ তোলে। হৃদয়কে মন্থন করে জেগে ওঠে প্রশ্নের 'নিখিলের ঘোড়াগুলো কেন যে এমনভাবে বদলে যায় মাতাল গণ্ডারে।'

'বলগা হরিণের শিং' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেও অনুরূপভাবে কবি শাসকশ্রেণীর দানবীয় সন্ত্রাসকে চিহ্নিত করেছেন, 'নেকড়ের দাঁতের' সঙ্গে। কখনো হাস্যকর আত্মম্ভরিতাকে 'ভেড়ার' রূপকে উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন প্রাণীর অনুষঙ্গ ব্যবহার করে তিনি আসলে আত্মঘাতী সময়ের দর্পণে মানুষের পাশবিকতাকে, হিংস্রতাকে নতুন ভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

'নীরব সন্ত্রাসের' 'মানচিত্র' ও 'এখন স্বদেশ' কবিতাদুটির শব্দে চিত্রকল্পেও জ্বলে থাকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের বিস্ফোরক। মানুষের প্রতারণাকে চিহ্নিত করতে তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'শেয়ালে শকুনে আজ ছিঁড়ে খায় মজ্জা মাংস চেতনার ঘিলু।' অথবা 'নিরাপত্তা উলঙ্গ জোঁকের ঠোঁটে চোখে খেলা করে'।

কবির ব্যক্তিক, অন্তর্মুখী কতকগুলি ভাবনা তাঁর প্রতিবাদী, সমালোচনাত্মক ভূমিকাকে উদ্দীপিত করে। তাঁর কবিতা-পাঠে আমরা কখনো এগিয়ে যাই সন্ত্রাসহীন সমাজ ব্যবস্থার দিকে, আবার পিছিয়ে আসি অতীতের অজস্র সুখে, অ-সুখে। ভালোয়-মন্দয়, আকাঙ্ক্ষায়-হতাশায়, সমৃদ্ধিতে-অপচয়ে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে দায়ী— এই বোধ গণেশ বসুর কবিতাভুবনের প্রধান ভিত্তি। এই ভিত্তিকে শক্ত করে শব্দের অণু-পরমাণু, জীবনের সত্য শব্দের সত্যকে মূর্ত করে তোলে।

রাষ্ট্র, সমাজ, পার্টি, পরিবার, সম্পর্ক—সবক্ষেত্রেই কবির নিজস্ব ভাষার পরিচয় মেলে। সময়ের কুঠারাঘাতে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে কবি প্রবেশ করেন একসত্তা থেকে আরেক সত্তার গভীরে। অতন্দ্র সেই ভাঙার সাধনায় কবি জানতে পারেন আগুনের উত্তাপে ভস্মীভূত সময়ের কথালাপ, 'উলঙ্গ মুকুট নিয়ে মুখোমুখি শুয়োরেরা আমার বাগানে।/সময় পাথর হয়, মাথার ওপর ঝোলে মাকড়শার হাজার মশারি,.... ফুলের শিকড়-ছেঁড়া শিরাছেঁড়া বুকে ডোবে আগুনের মানে' (এখন স্বদেশ)। —আশ্চর্য প্রসারিত শব্দে কবি পাঠককে নিক্ষেপ করেন অন্ধকুহরে, চিনিয়ে দিতে চান সমকাল ও সমসময়ের ক্ষতচিহ্নকে। আসলে সময় ও মানুষ কবির নিত্যসঙ্গী, মানুষের অপচয়কে তিনি চিনে নিতে ভুল করেন না। মানুষের উদ্দেশ্যে তাই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'কোন্ অতলে নামো? বন্ধু, এবার থামো।/পচন দেখি, বোধে তোমার পচন' অন্ধ জীবনের বাঁক থেকে উঠে আসে সত্যের বীভৎস রূপ। কবি আজ অবগত, শাসকের অত্যাচার কিংবা দলীয় মানুষের কদর্যনীতি সন্ত্রাসীর থেকে নির্মম। মনুষ্যত্বের অবমননায় কবি বলেন, 'আর পারিনা সইতে/স্বাস শব বইতে/টানছো তবু সে কোন্ অন্ধকারে?' আত্মক্ষয়ের এই অপসময়ে জীবন-উপান্তে এসে কবি অবক্ষয়ের চিহ্ন সাজিয়ে দিতে দিতে বলেন,

'সেদিনও ছিল সরোদে পাখোয়াজে
ঝড়ের পাখি, দ্রোহের সুখ ছিল,
সুখের ভিড়ে সুখের ভাঁজে ভাঁজে
সে বীজ ছিল কারা তা কেড়ে নিল
হারিয়ে যায় কথা,' (স্বাধীনতা)

পঙ্‌ক্তির ভিতর দিয়ে বহমান বিদ্রুপের ঝংকার শুধু কবিকেই নয়, পাঠকের বোধ ভূমিকেও আসড়-স্তব্ধ করে দেয়। বিধ্বস্ত কবি গভীর যন্ত্রণায় বলেন, 'এভাবে বলো আর কী হবে বেঁচে থেকে/বরং আমাকে অন্ধ করো/দিয়েছি যৌবন তোমারই দু পায়ে/এখন আমাকে ভস্ম করো' (আমাকে অন্ধ করে দাও) এই অন্ধ

হওয়ার কামনায়, ভস্ম করার আকাঙ্ক্ষায় আত্মাধিকারের প্রতিকারহীন গ্লানি মিশে যায়। নীরবযন্ত্রণায় ভরে থাকা প্রাণ নিয়ে কবি লেখেন, 'শিকড়ে শিকড়ে তবু টান ধরে। সুখে আছো? সুখে থেকো তুমি?' (সুখে থেকো) সারাদেহে সর্বনাশের ক্ষত নিয়েও একটু বিশ্বাসে, নতুন আশ্বাসে কবি উচ্চারণ করেন,

'আমিও সে অপরাধী, মাথা নিচু করে আমি মেনে নিই সব অপমান
গোপনে লালন করি একা একা শাদা লাল ফুল।
দীর্ঘবেলা বয়ে গেল মেঘে রোদে ঝড়ে ও খরায়
এখনও তোমার গানে এ বুকে বেদনা জাগে ঘুম ভেঙে যায়।'

তবু সংবেদনশীল ও গভীর কবিতার এই স্বর নিঃসন্দেহে কবির বিবেকী প্রতিভাস। এই দিক থেকে তাঁর 'খরা' কবিতা জীবনের প্রচ্ছদে সমকালীনতার এক রক্তিম বাস্তবতা। 'খরা' হর্ষ-বিষাদের দিনলিপি, ক্ষয়িত কিছু স্বপ্নও জীবনের ইতিহাস, একটি দীর্ঘ কবিতার পরতে পরতে শৈশবের উচ্ছলতা পেরিয়ে কৈশোরের উন্মাদনাকে অতিক্রম করে যৌবনের ভয়াবহ অপচয়ের করুণ কাহিনি নির্মিত হয়েছে। সময়ের মতিভ্রমে যখন কিছু স্বপ্নের, স্মৃতির রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটে তখন এক কবির কাছে জীবনের অর্থ পালটে যায়, ম্লান-বিবর্ণতায় ঘিরে থাকা জীবন যৌবনকে মনে হতে থাকে বর্ণহীন, আর সেই বর্ণহীনতার বর্ণময় চিহ্নকে ধারণ করে আছে 'খরা'। যেমন—

১. 'হৃদয়ে হৃদয় নেই, হৃদয়ের বালিগর্ভে মরা টিকটিকি
ঘিরে আরশোলারা হাসে, থিক্‌থিকে পিঁপড়ে ইঁদুর।'
২. 'পচন শুধু পচন দেখা দেয়
বৃহন্নলার বেশ।'
৩. 'আপস করতে করতে
আপস করতে করতে
হারিয়ে যায়
হারিয়ে যায়
প্রজ্ঞা
বোধ
ভালোবাসা'

এমন অসংখ্য পঙ্‌ক্তি সভ্যতা, সংসার, সমাজের ক্ষয়রোধের যথার্থ প্রতিবেদক। কবিতায় দীর্ঘ আখ্যানের (ঠাকুরদা, মেজো জেঠু, বাবা, মা, কিংবা দেশভাগ, ভিটেমাটি ছেড়ে আসার গল্প)। বলয়কে সম্প্রসারিত করে উত্থাপিত হয় ইতিহাসের মলাটে কালচেতনার চলমান জলছবি, এ কবিতা যেন কবির আত্মজীবনী। আট বছর বয়সে স্মৃতির ভয়াবহতা (কলো বোরখার নিচে নোয়াখালি

ছড়ায় সংশয়/রুদ্রাক্ষের মালায় দুলতে লাগলো উদ্বেগ), ভালো লাগা-মন্দ লাগার নতুন পরিসর ('চোখের ভিতর ভাসতে থাকে চিত্রমালা/স্মৃতির ভিতর পা ডুবিয়ে হাঁটে সময়/মেদুর সময়'। দারিদ্রে ভরা পরিবারে সম্পর্ক-সৌন্দর্যে মূল্যবোধ (থির থির করে কাঁপত আম্রপল্লব/শঙ্খের ধ্বনি/মা-জেঠিমার জোকার), অপচয়ের ব্যাধিগ্রস্ত যৌবন (নষ্ট হতে হতে আমি সামলে নিই/নষ্ট হতে হতে শুধরে নাও তুমি' তুলির ছোট ছোট টানে ইঙ্গিতময় বাচনে প্রকাশিত হয়েছে জীবনের চলমানতার ছবি। আসলে এ সবই পরিপ্রেক্ষিত। কবির আসল অভিপ্রায়, রক্ত সঞ্চালনায় প্রবাহিত হওয়া বিষরক্তের বিষাক্ত দিনের নির্মাণ, 'নীরব সন্ত্রাস আজ ওদেশে এদেশে/ নীরব যন্ত্রাণা আজ ওদেশে এদেশে'। তাই তো সুড়ঙ্গালালিত পথে চলতে চলতে কবি বুঝতে পারেন, 'এখন খরা/আমাদের অক্ষরে অক্ষরে। বোধে/ বোধিতে/ভালোবাসায়।' কবিতার প্রবেশ ভূমির দ্বারপথে প্রাণের শিরায় বিনাশকে তিনি যে লক্ষ্যে করেছিলেন, প্রস্থানের মুহূর্তেও সেই রচিত অবক্ষয়ের দুর্মর উপস্থিতিকে সশঙ্ক বিস্ময়ে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি,

'খরায় এখন পোড়ে অশ্বমেধ ঘোড়ার কঙ্কাল
খরায় এখন পোড়ে জলজ্যান্ত মিথ্যার বেসাতি।
কেন যে খরায় পোড়ে নিমগাছ দলিত রণনীতি'
কেন যে খরায় পোড়ে ভালোবাসা মানব মনীষা'
খরার ভিতরে আমি খরা কেন? দেশজোড়া খরা!'

(৫)

ষাটের দশকের কবি গণেশ বসু পঞ্চাশের যুগ প্রেক্ষিতকে ধারণ করে, ষাটের দশকের আগুন-সময়-পাপ-তাপ-বিক্ষোভে পুড়তে পুড়তে সত্তরের টালমালার সময়ের আবহ অতিক্রম করে আশির স্বপ্নভঙ্গ ও যন্ত্রণাময় অবক্ষয় দেখতে দেখতে বৈপ্লবিক সমাজ পুনর্গঠনের স্বপ্ন-সততা ও নিখাদ ভাবাদর্শ নিয়ে জীবন ও শিল্পের এক নতুন প্রতিবেদন লিখবেন। তিনি কবিতার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে নিজের জীবনেতিহাস যেন আগাম রচনা করলেন, গণশত্রুকে চিহ্নিতকরণ, সমাজ-বদলের নামে ধ্বংসাত্মক কার্যনীতি কিংবা বিষণ্ণ প্রেমের নানা বর্ণছটায় তিনি আলো অন্ধকারের পাঠ নিতে পেরেছিলেন। আর সেই পাঠেই তিনি লিখে গেছেন গত-শতাব্দীর স্মৃতিবাহী জীবনের ধারাপাত, সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকেও কবি যে আত্মমগ্ন মৃন্ময় রূপের পূজারী, তাঁর ধ্যানমগ্নতায় মিশে থাকে গণমুখী কবিত্ব ও ব্যাক্তি কবির গহন-গভীরতা। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সহোদরার মতো লাবণ্যময়ী কবিতার ভূমিতে।

অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে কবিতা লিখতেও কবি নিভৃতবাসী, একাকী বিচ্ছিন্ন যাপন তাঁর। কর্মময় জীবনের ব্যস্ততাকে স্বীকার করেও কবি বিশেষভাবে প্রচারবিমুখ। শৈশবে উদ্বাস্তুর স্মৃতি, দুঃখে-কষ্টে জীবন নির্বাহ, প্রেমের ভিতরে খরা, তামসের স্রোতে ভেসে চলা, রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, বর্বর বিশ্বাসঘাতকদের নির্লজ্জতায় যন্ত্রণায় দাহে কবির সত্যোপলব্ধি কবিতার ক্ষেত্রে এক নির্জনবাসের ঠিকানা লিখে দেয়। ফলত তাঁর কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত না হলেও একনিষ্ঠ পাঠক নিঃসন্দেহে তাঁর কবিতার প্রত্যয়কে স্বীকৃতি দেবে।

বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র প্রমুখ কবির জীবন ও শিল্প নির্মিত যেভাবে রাজনৈতিক ও নান্দনিক ভাবাদর্শের যুগলবন্দিতে মুখর ছিল, ঠিক তেমনি মুখরিত ছিল কবি গণেশ বসুর জীবন ও সৃষ্টির জগৎ। তাঁর বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের বিচ্ছুরণ হিসাবে যদি আমরা তাঁর কবিতা-বিশ্বকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শৃঙ্খলার নামে দলবাজি এবং আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ব জীবন কীভাবে জীবনদর্শন ও শিল্পের মর্মমূলে আঘাত করে, এই বিবরণ কবির কবিতাভাবনার প্রেক্ষাপটকে পুষ্ট করেছে। দলীয় মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েও কবি কোনোদিন বিরোধী রাজনীতির মুখ হয়ে উঠতে পারেননি, পারেননি নিজের ব্যক্তি-অস্তিত্বকে বিকিয়ে দিতে। এই সবের উর্ধ্বে উঠে মার্কসবাদ নিয়ে তাঁর আজীবন ভালোবাসা ও লিপ্ততাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি শব্দের গভীরে।

প্রকৃতপক্ষে সমাজবদলের যুদ্ধে সংগ্রামী মানুষ তাঁর হাতের আয়ুধ আর গণশত্রুরা তাঁর প্রতিবাদের চিহ্নায়ক—সংগ্রাম ও সৃষ্টির এই দ্বিলাপে কবি শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথে। তাঁর প্রদর্শিত আলোয় কবি ফিরে পান নিষ্ক্রমণের পথ, 'তিনি জীবনের সংগীত/তিনি সত্তার নির্ভর/তিনি মুক্তির পথনির্দেশ। তিন চলমান সুন্দর' (রবীন্দ্রনাথ)। এই পথের অভিযাত্রায় বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি বিশ্বাস করেন তিমিরহননের কাল শুরু হয়ে গেছে, এবার রুদ্ধ হবে গণশত্রুদের চোরাপথ। আর তাই 'চিরযুবক' কবি ঘৃণার ঊর্ধ্বে, সংকোচের সীমা পেরিয়ে প্রাণোদ্দীপনায় লেখেন,

'মৃত্যুর ঠোঁটে ছুঁয়ে জ্বলে তবু পিনাকধ্বনি
একাত্তর' (একাত্তর)

কবিতার বিষয়, ভাষারীতি, সুর নতুন সংগ্রামের পথ ধরে এক চির আলোকিত সাম্যবাদী সমন্বয়ের প্রত্যাশী। সেই এক চিরন্তর প্রত্যয়ে, আশা ও জাগরণের বাণীতে কবির প্রার্থনা,

'বদলে যেয়ো শিশু আমার, বদল হোয়ো তুমি
ভিখিরিদের রুটি;
অথবা তুমি বদলে হোয়ো রোদের তরবারি
আমার তবে ছুটি।' (প্রার্থনা)

গ্রন্থসূত্র:-

গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ— সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল/দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা বইমেলা ২০২০

বাঘের থাবার নীচে : নি:স্বতা থেকে আশার পথে...

সোমা ভদ্র রায়

বাঘের থাবার নীচে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮২ খিস্টাব্দে। মোট ৩৭টি কবিতা আছে। এই কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘবিরতির পর লিখেছেন কবি। কবি গণেশ বসুর প্রথম লেখা 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। এরপর ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে নিজের মুখোমুখি (১৯৬৭), রক্তের ভিতর রৌদ্র (১৯৬৯) লেলিন: অধিকার রক্তের কবিতার (১৯৭০), অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ (১৯৭১)। এরপর অনেকটা সময়ের ছেদ। প্রায় এগারো বছর। তারপর প্রকাশ পেল কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবার নীচে'।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই গণেশ বসু স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, চিনিয়ে দিয়েছেন নিজের জাত; বামপন্থী চেতনায় তাঁর বোধের নির্মাণ, খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'সমুদ্রমহিষ' তাঁকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে দেয়, কবিতাটি সাড়া জাগিয়ে তোলে কাব্যমহলে। বিষ্ণু দে একটি কবিতা লিখে গণেশ বসুকে অভিনন্দন জানান—

'তখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ
নীলে লাল আহির ভৈরবে,
আর দশপ্রহরণ হাতে হাতে তুলে দেয়
তোমার কাব্যের যিনি মরণমর্দিমী।—'

এটি ছিল একজন প্রতিষ্ঠিত কবির একজন উদীয়মান কবির প্রতি অকুণ্ঠ অভিবাদন। এরপর কবিতাটি স্থান করে নিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় কবিতা' (১৯৭৩) শীর্ষক কাব্যসংকলনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের পাঠক্রমেও এই কবিতাটি ছিল একসময়ে। কবি গণেশ বসুর ব্যতিক্রমী কবিসত্তার স্বীকৃতির প্রমাণ এসব ঘটনা।

কবির জন্ম ১৯৪০ সালের ১ ডিসেম্বর (১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭) তাঁর মামার বাড়ি অভিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার দেহেরগতি গ্রামে। কবির পৈতৃক নিবাস বরিশালেরই চাঁদশি গ্রামে। তাঁর ঠাকুরদা অন্নদাচরণ বসু মজুমদার ছিলেন জমিদার। তাঁর পঞ্চম পুত্র সুমন্তনাথ বসু মজুমদার সপরিবারে ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতায়

এসে আশ্রয় নেন। শরণার্থী হিসেবে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁদের দিন অতিবাহিত হয়। সংসারে খানিকটা আর্থিক সংস্থান করবার জন্য কবিও ছোটবেলা থেকে কাজে যোগ দেন— শুরুর দিকে ঠোঙা বানিয়ে দোকানে বিক্রির মতো কাজও করেছেন। তারপর আরম্ভ করেন টিউশন। সেই অর্থে বলতে গেলে গৃহশিক্ষকতা দিয়ে কবির কর্মজীবন শুরু হয়। পরে গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় শ্রমিকের কাজ, কখনও গৃহনির্মাণের তত্ত্বধায়ক হিসাবে কাজ করেছেন। শিক্ষকতা করেছেন বিভিন্ন স্কুলে, কিছুকাল 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। পরে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এই বিচিত্রধর্মী পেশার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবনকে দেখতে পেয়েছেন বৃহৎ ক্যানভাসে, কাব্য রচনায় সেসবেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

কবি গণেশ বসুর পড়াশুনা শুরু হয় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে, তারপর চারুচন্দ্র কলেজে। এম.এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই-টি-আই-এর সিভিল ড্রাফটম্যান। পরবর্তী সময়ে বার্লিনের ইন্টারন্যানাল ইন্সটিটিউট অফ জার্নালিজমে ডিপ্লোমা করেন। বহু বিচিত্র পেশার মতো নানামুখী শিক্ষার ছাপ কবির জীবনে পড়েছে। এসব অভিজ্ঞতাই সমৃদ্ধ করেছে তাঁর কাব্যভুবন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকাকালীন সময়ে ১৯৫৯-এর ১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ছাত্রমিছিলে উন্মত্ত পুলিশের লাঠিচার্জ সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। কবিতায় তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট।

কবির মোট কাব্যগ্রন্থ ১২টি। ষষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবার নীচে'। কবি আস্থা রেখেছিলেন আন্দোলনে, নানা অধিকারের লড়াইয়ে। কারণ কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত কবি সংগ্রামকেই হাতিয়ার করতে চান। আগের কাব্যগ্রন্থগুলিতে তারই জ্বলন্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭০-এ প্রকাশিত 'লেলিন: অধিকার রক্তের কবিতার' নামক দীর্ঘ কবিতায় কবির ভাবনার মূলকথাটি ব্যক্ত হয়েছে। কবিতার নামকরণেও সে কথা ফুটে ওঠে; কবিতার নাম হয় 'কমরেড', 'অধিকার'—এগুলোই কবির মতাদর্শের অভিজ্ঞান। ৭১-এর আন্দোলন কবিকে নাড়া দিয়েছিল সমূলে। ছিন্নমূলের যন্ত্রণা কবি জানেন। যে বাংলাদেশ ছেড়ে বালক কবি চলে এসেছিলেন পরিবারের সঙ্গে এপার বাংলায়, দীর্ঘসময় ধরে সেই বাংলাকে আগলে রেখেছেন বুকে। লালন করেছেন ভাষাআন্দোলনের গরিমাকে। তাই লিখতে পারেন এত দীর্ঘ অবয়বের কবিতা— 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ'।

'বাঘের থাবার নিচে' প্রকাশিত হয় দীর্ঘ এগারো বছরের ব্যবধানে। সত্যের উপর আস্থা রাখতে চান, নির্মম হয়ে উঠেছেন কবি। একাব্যের প্রথম কবিতার

নামও কাব্যগ্রন্থের নামে। সেই কবিতা প্রথম স্তবকের পরে কথোপকথনের ভঙ্গি শেষে আবার কবিতার স্বাভাবিক প্রবাহ। কবিতার শুরুতে কবি বলেন—

জংধরা লোহার মতো তার কথা এখন ছেঁড়া মেঘের গান,
বুকের ভিতর বুক এখন ক্লান্তদীর্ণ মাকড়শার কুয়াশাকুহক স্মৃতি,

সেই স্মৃতির হাতে হাত রেখেই কবি লেখেন—

সময় থাকতে তাকে ফিরিয়ে দিল
জলের আশ্বাস দিয়েও তৃষ্ণামুখর তাকে ফিরিয়ে দিল নিঃস্বতায়।

নিঃস্ব একা কবি এবার কথোপকথনের অবতারণা করেন। শুধু কবিতার বিষয় বা ভাব নয় আঙ্গিক বা ভঙ্গি নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটছেন। কোলন দিয়ে দিয়ে লিখে যান দ্বৈত সংলাপ। আসলে কবি জানেন কবিতার অসীম সম্ভাবনার কথা, আধুনিক সময়ের পাঠকও জানেন কবিতার বিস্তার কতদূর, তার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়ে স্লোগান, নাটকের মতো কথোপকথন, চিন্তা, বিতর্ক। বহুমুখী ব্যঞ্জনার সঙ্গে জুড়ে যায় এসব চরিত্র— কবিতাকে করে তোলে বহুধাবিস্তৃত। কবি কাব্যকথার বিন্যাস

ঘটান এভাবে— : তুমি একা। দুপুরবেলার ছায়ার মতো হ্রস্বতম, একা, গুলিবিদ্ধ পাখির মতো স্বপ্নে ঝাপ্‌টাছো তোমার মন। কেঁচোর চেয়ে ক্লিন্ন তোমার শরীর, চিবুক তোমার কাঠপিঁপড়ের বাসা।

: কিন্তু আমার স্বরে ভাসে গরাদভাঙা আওয়াজ।

: ভুল, বাইরে বেরোও, দেখবে তোমার গলায় উকুনমারা ধ্বনি

: এই তো আলো, এই তো আকাশ!

: কি দেখলে?

: আয়ু দুপরবেলায় ছায়ার চেয়েও বেঁটে, ভালোবাসা তার চাইতেও ছেটো কিন্তু ক্ষুধা সাঁই সাঁই ঢেউয়ের তোলপাড়, বিশাল, ঘূর্ণিমুখর ঝড়ের চেয়ে ভীষণ।

আয়ু, ভালোবাসা সব কিছুর থেকেই ক্ষুধার তেজ বেশি, জোর বেশি এই নগ্ন সত্য উঠে এল কবির কলমে। উঠে এল নিঃস্বতার কথা। আলাপচারিতার শেষের স্তবকে আবার কবিতার স্বাভাবিক কর্ম সঙ্গীহীনতায় বিষাদে আছেন কবি—

স্পন্দিত বীজের মতো যে চেয়েছিলো মাদল হতে
সে আজ সঙ্গীহীনতায় পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া চিতার দাউ দাউ,

আবার এসেছে নিঃস্বতার কথা—

সময় থাকতে থাকতেই তাকে ফিরিয়ে দিলো
ফিরিয়ে দিলো তাকে নিঃস্বতায়।

কবিতার শেষ পংক্তিতে কবি লিখলেন—

'বাঘের থাবার নীচেই এখন তার স্বপ্ন... তার রৌদ্দুর।' 'এখন' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ সময়ের বিরতির পর কাব্যসৃষ্টিতে মগ্ন কবি উপলব্ধি করেছে নিঃস্বতার স্বরূপ। 'বাঘে'র মেটাফর বারবার ব্যবহৃত হয়েছে এ কবিতায়। শুধু এই কবিতায় নয় এই কাব্যের অন্য কবিতায়ও এসেছে বাঘের অনুসঙ্গ। গণেশ বসু নন, অন্য কবিরাও তাঁদের কবিতায় প্রতীক হিসেবে এনেছেন 'বাঘ'। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত কবিতায়—

মেঘলা দিনে দুপুর বেলায় যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুল বনে

আমরা জানি এটি প্রেমের কবিতা, তাই এখানে বাঘ ভালোবাসার বাঘ। আর গণেশ বসু বাঘকে অন্য তাৎপর্যেও গ্রহণ করেছেন, কবিতায় ব্যবহার করেছেন ভিন্নতর অর্থে। এ বাঘ ক্ষমতায়নের প্রতীক। তাই এই কাব্যগ্রন্থেরও নামকবিতার নামকরণ অন্য মাত্রা এনে দেয়। 'বাঘের থাবার নীচে'ই এখন কবির স্বপ্ন আর রোদ্দুর। কারণ কবি অনুভব করছে অদ্ভুত এক আশাহীনতা, একাকীত্ব তাঁকে নিঃস্ব করেছে। তিনি যেন নৈরাশ্যের শিকার, তিনি এমন পথে হাঁটছেন এখন যেখানে কোন পথনির্দেশ নেই যেন। দিশাহীন এক গোলকধাঁধায় আটকে গেছেন তিনি। যে মতাদর্শে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ভরসা রেখেছেন সেখানে আজ সবই অস্পষ্ট। তিনি বুঝতে পারছেন না কাকে আহ্বান জানাবেন, কার ভিতরে রয়েছে অমৃত সম্ভাবনা, অমোঘ উদ্দামতা, তাই তিনি হতাশ।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ কাজ কবির সত্যের অভিজ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জীবন সচেতন কবি তাই পরিস্থিতি সম্যক বুঝতে পারেন। তাই তিনি লেখেন—

'সন্ত্রাসের জন্ম দিতে দিতে দেশটা হয়ে যায় থানার লক আপ।' ক্ষমতার আস্ফালন চিনে নিতে পারেন কবি। সহোদর কবিতায় কবি অন্বেষণ করেন তেমন একজনকে যার উপর আস্থা রাখা যায়— 'কার করতলে আছে আগুনের আঁচ' খোঁজ জারি থাকে, যে বিপ্লবের পথে হেঁটেছেন কবি আজ তার অন্যরূপ তাঁকে নিরাশ করে। অধ্যাপক 'কবিতায় উঠে আসে' কবির ব্যক্তিজীবনের বা বলা ভাল পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। যে অভিজ্ঞতা কবিকে দাঁড় করিয়ে দেয় নির্মমতার সামনে। হতাশার ভাষা পাঠককেও ভাবিয়ে তোলে— কবি নিজের অস্তিত্বের এতদূর নিম্নগামী মেনে নিতে পারে না—

'হীনমন্যতায় ভুগতে ভুগতে আমি মফস্‌সলের অধ্যাপক:
ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতোই আমার অস্তিত্ব

পেশাগত জীবনের বিরুদ্ধ অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়—

কে জানত এদেশে অধ্যাপক মানেই করুণা
অধ্যাপক মানেই মন্ত্রী-আমলার গেরো, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গে পাঁচালি
অধ্যাপক মানেই সরকারের টালবাহানা, বিশ্বাসঘাতকতার দলিল।

প্রথাগত শিক্ষাকে ছাপিয়ে জীবনকে খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন 'রক্তকরবী' নাটকে অধ্যাপক চরিত্রের প্রতি কিছুটা শ্লেষ দেখান তখন তার ব্যাখ্যা বুঝে নিতে পাঠকদের অসুবিধা হয় না। শাসনতন্ত্রের একটা অংশ বলেই তাকে বেশ চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু একজন অধ্যাপক কবি যখন এমন পংক্তি উচ্চারণ করেন তখন তাঁর যন্ত্রণার ও হতাশার রূপটিকে উপলব্ধি করে পাঠকও যেন কবির মতোই অসহায় বোধ করেন।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে এই হতাশা কখনোই জীবনের শেষ কথা হতে পারে না। এ কখনোই কবির মজ্জাগত নয়, এসবই সাময়িক, আসলে কবি বিশ্বাস করেন সততায়, বিশ্বাস করেন বিশ্বস্ততায়, বিশ্বাস করেন শব্দই কবিদের আশাভরসা, আশ্রয়স্থল, জীবনের অভিজ্ঞতা কবিতার প্রতি কবিকে সৎ রাখবে। মার্কসীয় তত্ত্বে আস্থাশীল কবি মার্কসের বলা Arts is the highest joy man can offer himself এই কথাকে মান্যতা দেন। কবি বিশ্বাস রাখেন পল এলুয়ার তাঁর La Poésie dupassé-র ভূমিকায় যা লিখেছিলেন সেই কথাতেও—

Keeping your eyes open on yourself and on the world on the front of the mirror and on the back of the mirror in order to hold off the right.

কবিতার প্রতি দায়বদ্ধ কবি, শব্দকেই কবি কবিতার শুরু বলে মনে করছেন। সেখানেই কবির আশ্রয় ও আশা ও নির্ভরতা, কেননা কবির মতে—

> "বিশ্বজুড়ে এ সময় সভ্যতার সংকট, মানবিকতার অতলপর্স্পী অধঃপতন এখন সীমাহীন দুর্ভোগ, অনিঃশেষ অভিযোগ, নিদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্ট, অবক্ষয় ও আত্মপীড়ন, বশ্যতা ও বিক্ষোভ, গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও জাতিবৈরিতা, ম্যাকার্থিবাদের আগ্রাসন ও জিঙ্গোবাদের ভয়াবহতা। এমন সময়ে শব্দই কবিদের আশাভরসা, আশ্রয়স্থল। ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেটাই।"[১]

কবি স্থানিক ও কালিক সীমাকে বিস্তৃত করে বুঝে নিতে চান কবিতাকে, কবিতার পরিসর তাই বহুদূর, ব্যতিক্রমী কবি গণেশ বসু এভাবেই জীবন ভাবনার সঙ্গে জগৎভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে ফেলেন কবিতায়।

আগেই বলেছি বর্তমান সময়ে পটপ্রেক্ষায় কবি হতাশায় আচ্ছন্ন। 'বাঘের থাবার নীচে' কাব্যগ্রন্থে বারবার সেই ছোঁয়া অনুভব করা যায়। এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা— 'এখানে হৃদয় নেই'—সেখানেও বাঘের প্রতীকী ব্যবহার আছে। কবি বলেন— 'বাঘের থাবার নীচে স্মৃতির মেরুন মেঘ ডানাভাঙা পাখি'

শেষেও আছে বাঘের প্রসঙ্গ—

'আমারও হৃদয় আজ বাঘের থাবার নীচে সংজ্ঞাহীন, ডানাভাঙা পাখি
স্মৃতির মেরুন মেঘ, ভালোবাসা করুণ করাত।'

—তবে শুধু হতাশা বা বিষাদ আছে এভাবে ভাবলে পুরোপুরি ঠিক হবে না। কবির মধ্যেও আশা আছে, আছে উত্তরাধিকারের স্বপ্ন। 'সহোদর' কবিতায় যে স্বপ্ন সহোদরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কবি 'উত্তরাধিকার' কবিতায় যেন সেই উত্তরাধিকারীকেই খুঁজে পেলেন তিনি—

তোমার ভালোবাসাই আমার স্বপ্ন
আমার স্বপ্নই তোমার স্বাধীনতা

হতাশার গহ্বর থেকে বেরিয়ে কবি দেখেন নীল আকাশের স্বপ্ন। যার হাতে দিয়ে যেতে চান ভবিষ্যতের ব্যটন, সেই উত্তরাধিকারীকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। তাই সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হতে চান কবি— সম্বোধন করেন তাকে আগুন বলে—

তোমার মাথায় জ্বলে চিতা
হে আমার শস্য আমার স্বপ্নময় আকাশ
হে আমার শস্য আমার আগুন
তোমার পিঠেই চাপিয়ে দিলাম বোঝা
ঝুঁকে পড়লে তুমি, পায়ে তোমার সেতু
তুমি বদলে গেলে শস্যে
তুমি বদলে হলে রুটি
হে আমার শিশু, আমার উত্তরাধিকার।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য— "একজন কবি এই বোধের জন্যই পাঠকের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, স্মরণীয় হন। ভিন্নতর তাৎপর্যে তিনি যেমন একজন যোদ্ধা, অন্যতর পরম্পরায় তিনি স্বপ্ন-প্রেমিকও; যে কারণে জীবন পুষ্পিত হয় প্রতিক্ষণে।"[২]

প্রকৃতপ্রস্তাবে কবি শেষপর্যন্ত আশার আলোক জ্বালাতে চান, সদর্থক বোধ চারিয়ে দিতে চান পাঠকের মধ্যে। তাঁর ভাবনায় স্নাত হয় পাঠকের অন্তর। এই সংযোগ বা Communication-ই জরুরি কবি ও পাঠকের মধ্যে। একজন লড়াকু মতাদর্শে কবি একজন সৈনিক, তাঁর চোখে স্বপ্নও আঁকা। জীবন তো একমাত্রিক নয়। বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়েই কবির কাছে ধরা দেয় সে। আর তাই কবির কাব্যে উঠে আসে স্বপ্ন ও ভালোবাসার বার্তা। 'বাঘের থাবার নীচে' কাব্যগ্রন্থটির মূল অভিব্যক্তি হতাশা ও দ্বিধা— আপাতভাবে একথা মনে হলেও কবি তাকে অতিক্রম করে যান অপ্রতিরোধ্য আশায়। কবিতায় উঠে আসে স্বপ্নের কথা। তখন এটাই প্রতিভাত হয় যে নিরাশা ও নিঃস্বতার পথ পার হয়ে কবি খুঁজে পেয়েছেন যোগ্য উত্তরাধিকার। এই স্বপ্নই বাঁচিয়ে রাখে কবিকে, পাঠককেও।

তথ্যসূচি :—

১। গণেশ বসু, গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ ভূমিকা, সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২০, পৃ-ভূমিকা।

২। ড. জয়গোপাল মণ্ডল, গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ, পরিচিন্তন, সম্পাদকের কথা, সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০ পৃ-পরিচিন্তন, সম্পাদকের কথা।

জীবনের আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে কবি গণেশ বসু

নিখিল কুমার মাহাতো

গণেশ বসুর পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার চাঁদশি গ্রামে। তাঁর বন্ধু অনিল দে এই গ্রাম সম্পর্কে বলেছেন—"সদর থেকে অনেক দূর। কিন্তু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাকা রাস্তা। পাকা বাড়িই বেশি, একতলা, দোতলা। নানা মাপের জমিদার, ডাক্তার-কোবরেজ, শিক্ষক, স্বদেশি, নায়েব-গোমস্তা থেকে পণ্যাঙ্গনার আশ্রয়। হাট বসে নিয়মিত, বাজারও; উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। হয়তো গোড়ায় নাম ছিল চন্দ্রশ্রী। খালের ওপারে যেমন বিখ্যাত ফুল্লশ্রী, বিজয় গুপ্তের জন্মভিটে। ক্ষত চিকিৎসার স্বতন্ত্র পদ্ধতির জন্য চাঁদশির খুব নাম-ডাক ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস (পিতা ব্রজকিশোর বসু) ছিল চাঁদশিই।"[১]

কবি গণেশ বসুর পিতামহ অন্নদাচরণ বসু মজুমদারের বাড়িটি ছিল এল (L) প্যাটার্নের, দোতলা। গ্রামের লোকের কাছে পরিচিতি দারোগাবাড়ি হিসেবে। তাঁর বারোটি সন্তান, ছ'টি ছেলে, ছ'টি মেয়ে। পঞ্চম পুত্রের নাম সুমন্তনাথ বসু মজুমদার। প্রজারা ডাকত রাঙাবাবু বলে। সুমন্তনাথ বসু মজুমদারের বিয়ে হয় বরিশালেরই দেহেরগতি গ্রামের বিলাসচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা পারুল দেবীর সঙ্গে। সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ও পারুল দেবীর আটটি সন্তান। তৃতীয় সন্তান হলেন গণেশ বসু। তাঁর জন্ম মাতুলালয়ে অর্থাৎ দেহেরগতি গ্রামে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর (১৫ অঘ্রাণ, ১৩৪৭), রবিবার, বিকেল চারটে নাগাদ।

সচ্ছল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও গণেশ বসুর বাল্যজীবন বেশিদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়নি। কেননা ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের অভিশাপ নেমে আসে। ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। সুমন্তনাথ বসু মজুমদারও স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বরিশাল ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, গণেশ বসুর বয়স তখন মাত্র আট বছর। চাঁদশির জমিদার পরিবার কলকাতায় এসে নতুন পরিচয় পেলেন—উদ্বাস্তু, শরণার্থী।

শিয়ালদহ থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় পদ্মপুকুরের কাছে, এক পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পে, আশ্রয় শিবিরে। আরো অনেক শরণার্থী পরিবারের সঙ্গে শুরু হয় ক্লিষ্ট জীবন-যাপন। এই দুঃসহ জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তিনদিন পর ৩১/০৮/১৯৪৮-এ সুমন্তনাথ বসু মজুমদার সপরিবারে আশ্রয় নেন ছোটো বোনের বাড়িতে ভবানীপুরে, ৩ বি কুন্ডু লেনে। কয়েকদিন পর সরকারি ভাবে রিফিউজি হিসেবে নথিভুক্ত হলেন, মিলল রিফিউজি কার্ড। সাউথ সাবার্বান স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য দুই ভাই ইন্টারভিউ দেন, কিন্তু বহুবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯-এ দুই ভাই ভর্তি হন ভবানীপুর নাসিরুদ্দিন স্কুলে।

সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ছোটো বোনের বাড়িতে ছিলেন প্রায় দু-বছর। তারপর নানাবিধ সমস্যার কারণে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তাঁরা চলে আসেন টালিগঞ্জের একটি বস্তিতে। একটা সস্তার ভাড়াবাড়িতে অনেক ভাড়াটের সঙ্গে নিত্য কলহদীর্ণ পরিবেশে থাকেন কয়েক মাস। তারপর আশ্রয় নেন ২ বি চন্দ্র মন্ডল লেনের একটি বাড়িতে। সেই বাড়িটি আসলে একটি দোকান ঘর। গণেশ বসুর ছোটো মামা সেটি ভাড়া নিয়েছিলেন একটি ছোটো-খাটো আইসক্রিম কারখানা তৈরি করবেন বলে। এই সময় ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন অতিবাহিত হয়। কোনোদিন একবেলা খাবার জোটে তো অন্য বেলা উপোস। কোনোদিন খুদের জাউ খেয়ে থাকতে হয়, কোনোদিন কাটে শুধু মুড়ি চিবিয়ে।

সুমন্তনাথ মাঝে মাঝে দেশে যেতেন এবং সামান্য কিছু খাজনা-টাজনা নিয়ে আসতেন। একসময় তাও বন্ধ হয়। তার উপর তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন গ্যাস্ট্রিক আলসারে। স্ত্রী পারুল দেবী সংসারের হাল ধরেন। সর্বংসহা হয়ে তিনি আগলে রাখেন পরিবারটিকে। অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ ও কাঁথা সেলাইএর কাজ নেন তিনি। পরে এক প্লাস্টিক কারখানায় দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন। অথচ দেশে থাকতেন রাজরানির মতো। তাঁর চুল বেঁধে দেওয়া ও পরিচর্যা করার জন্য ছিল নিজস্ব সেবিকা। গ্রামের গরিব প্রজাদের কাছে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনিই হয়ে পড়লেন অন্যের অনুগ্রহ প্রত্যাশী।

পরিবারের এই দুর্দিনে বালক কবিকেও কাজে নেমে পড়তে হয়। দিদির সঙ্গে খবরের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে তা বিক্রি করতেন। দাদা কার্তিক বসু দোকানে দোকানে চানাচুর সাপ্লাই দেওয়ার কাজ নেন। পরে অবশ্য তাঁরা প্রাইভেটে ছাত্র-ছাত্রী পড়াতেন। গণেশ বসু যখন ক্লাস ফাইভে পড়েন তখনই ক্লাস টু-থ্রির ছেলে মেয়েদের পড়াতেন। সীমাহীন দারিদ্রের কারণেই একদিন কবির ছোটো বোন মারা যান। তখন তাঁরা ছিলেন সাহানগরে কবির ন'মামা

সুরেশচন্দ্র দত্ত-র বাড়িতে। কবির এই মামা ছিলেন বিপ্লবী। অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের ডান হাত। এখানে থাকার সময় একদিন সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে কবির কচি বোন স্বপ্না ঢলে পড়েন কবির কোলে। এই ঘটনা কবির মনকে ভয়ানকভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারেননি কবি। তারপর তাঁরা আর সে বাড়িতে থাকেননি।

কবির পরিবার এরপর আশ্রয় নেন ৩৭ গোবিন্দ ব্যানার্জি লেনে মেজো পিসিমার (কবি তাঁকে বড়ো পিসিমা বলে ডাকতেন, কারণ বড়ো পিসিমাকে কবি কখনো চোখে দেখেননি) বাড়িতে। পিসেমশাই সুবোধচন্দ্র গুহমুস্তাফি ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। কিন্তু তাঁরা থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। স্থানাভাব হওয়ায় সেই বাড়ির বারান্দাতে রাত কাটাতেন কবির পরিবার। এই সময় তিনি পড়তেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে। এই ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি ছিলেন ব্যারিস্টার ও রাজনীতিক শিশির কুমার দাস। কবি সারা বছর বিনা মাইনেতেই পড়াশোনা করতেন। তারপর রিফিউজি স্টাইপেন্ড-এর টাকা চলে এলে স্কুল কর্তৃপক্ষ সারা বছরের বকেয়া মাইনে কেটে নিত। এ ছাড়া বই কেনার খরচ হিসেবে সরকার থেকে পেতেন চল্লিশ টাকা।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় গণেশ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় অনিল দে-র (অনিল দে পরবর্তীকালে নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা হয়েছিলেন। এঁর পরিচালনায় স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও অভিনয় করেছেন দূরদর্শনে)। তিনি ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কবির মেজো পিসিমার বাড়ির কয়েকটি বাড়ি পরেই ৪৭ গোবিন্দ ব্যানার্জি লেনে ছিল তাঁদের বাড়ি। তাঁর মা-বাবা, দাদা, দিদি, বোনেরা কবিকে খুব ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। তখন গোবিন্দ ব্যানার্জি লেন থেকে পায়ে হেঁটে কবি স্কুলে যেতেন। বাড়ি থেকে কোনোদিন খেয়ে যেতে পারতেন না। অনিল দে মাঝে মাঝে কবিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ক্রমে গণেশ বসু তাঁদের পরিবারেরই একজন হয়ে ওঠেন। এমনকি তাঁদের পারিবারিক নিমন্ত্রণেও তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

বন্ধু অনিল দে-র সাহচর্যে আসার পর গণেশ বসুর জীবন নতুন মোড় নেয়। অনিল দে কবিতা লিখতেন, গান বাঁধতেন, অভিনয় করতেন। তাঁর দেখাদেখি গণেশ বসুও কবিতা লিখতে শুরু করেন। অভিনয়ও করেছেন। জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'জাগো রে ধীরে', শিবরাম চক্রবর্তীর 'পন্ডিত বিদায়' নাটকে তিনি অভিনয় করেন কখনো অনিল দে-র নির্দেশনায়, কখনো অন্যের পরিচালনায়। অনিল দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা কাহিনী'-র নাট্যরূপ

দেন, গণেশ বসু সেখানে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'বৈকণ্ঠের খাতা'-য় ঈশান চরিত্রে বহুবার অভিনয় করেন। নাট্যায়ন প্রযোজিত 'কম্পন'-এ হেডরিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে। যাত্রাতেও অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ'-সহ 'গুপ্তধন', 'শাস্তি' গল্পের অভিনয় করেন। 'শিবাজী' পালাগানে অনিল দে হয়েছিলেন শিবাজীর অনুগামী তানাজি, আর তানাজির বালক অনুসারকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গণেশ বসু।

অনিল দে-র সঙ্গে গণেশ বসু পি.সি.সরকারের ইন্দ্রজাল সম্পর্কিত বই কিনে ম্যাজিক, হিপনোটিজমও প্র্যাকটিস করতেন। পরবর্তীকালে সাহানগর স্কুল, চেতলা বয়েজ স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় ম্যাজিক শো করেন তাঁরা। গণেশ বসুকে কবিতা লিখতেও উসকে দিয়েছিলেন বন্ধু অনিল দে। যদিও কবির প্রথম লেখা হল একটি গদ্য, যার বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধি। ১৯৫৩-য় তা প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনে। ১৯৫৩-তে কবি 'পথের বাণী' নামে এক দেওয়াল পত্রিকায় প্রথম কবিতা লেখেন, কবিতাটির নাম ছিল 'মৃত্যু'। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'যুগ ও জীবন' পত্রিকাতেও তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮-তে বীথি বসু ছদ্মনামে কবিতা অনুবাদ করেন যা মাসিক 'বসুমতী'-তে বের হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী বিধানসভার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে। তাঁর সমর্থনে কচি-কাঁচাদের মিছিলে অংশ নিয়ে চোঙা ফুঁকতেন, শ্লোগান দিতেন— 'ভোট দেবেন কীসে / কাস্তে ধানের শিষে', 'হারে গা জী হারে গা / জোড়া বলদ হারে গা' (কংগ্রেসের প্রতীক ছিল জোড়া বলদ)। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র অরুণোদয় গুহ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁর নির্দেশে কবি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের জনসভায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। ১৯৫৩-তে ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি পেলে, তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় কৌতূহলবশত তাতে যোগ দিয়ে এক স্টপেজে ট্রামে উঠে কয়েকটি স্টপেজ পরে নেমে যেতেন, ভাড়া দিতেন না। ১৯৫৪-র শিক্ষক ধর্মঘট তাঁকে খুব নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তী দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ীর সমর্থনে মিছিল করেন, রাত একটা, দুটো, আড়াইটা পর্যন্ত জেগে পোস্টার লিখেছেন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে রাজনীতিতে বাড়ে তাঁর সক্রিয়তা।

গণেশ বসু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরীক্ষা দিয়েই তাঁরা চলে যান বাঁশদ্রোণীতে। কবির ন'মামা সুরেশচন্দ্র দত্তকে স্বাধীনতা সংগ্রামী

হিসেবে সরকার বাঁশদ্রোণীতে জমি দিয়েছিল। ন'মামা সেই জমি কবির বাবা সুমন্তনাথ বসু মজুমদারকে দিয়ে দেন। একখানা ছাপরা বানিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন তাঁরা। এই সময় কবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন টালিগঞ্জ-এ সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ পড়তে যান। সেখানেও সরকার থেকে চল্লিশ টাকা করে মাসে মাসে স্টাইপেন্ড পেতেন।

১৯৫৯-এ সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ পড়া শেষ করে কবি বঙ্গবাসী কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হন সায়েন্স নিয়ে। উদ্দেশ্য দিনের বেলায় চাকুরি করা এবং রাত্রে বিজ্ঞান পড়া। কিন্তু কয়েকদিন পর, বন্ধু অনিল দে-র সঙ্গে পড়ার জন্য চারুচন্দ্র কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হন ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে। দিন দশেক পরে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসেন ডে-তে। বাঁশদ্রোণী থেকে কবি বেশিরভাগ দিন হেঁটেই লেক মার্কেটের কাছে চারুচন্দ্র কলেজে আসতেন। কোনোদিন পান্তা ভাত খেয়ে, কোনোদিন কিছু না খেয়ে। তখনও তিনি টিউশন পড়াতেন, ঠোঙা বানাতেন।

এই চারুচন্দ্র কলেজেই কবির জীবনে অনেকটা বাঁক এনে দেয়। কলেজে ভর্তি হয়ে কবি দেখেন সেখানে ছাত্র ফেডারেশনের কোনো ইউনিট নেই। চারুচন্দ্র কলেজের ইউনিয়ন দখল করে কখনো পি.এস.ইউ. (পি.এস.ইউ. হল আর.এস.পি.-র ছাত্র সংগঠন), কখনো ডায়ানা। আসলে এরা কোনো দলের নয়, যদিও কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন। ডায়ানাকে সমর্থন করতেন চারুচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ড. ক্ষেত্রমোহন বোস। গণেশ বসু ও আরো কয়েকজন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছাত্র মিলে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন। যথাসময়ে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন হয় এবং ভোটে দাঁড়িয়ে কবি রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেন। কবিতা লেখার সুবাদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক নির্বাচিত হন। পি.এস.ইউ.-র প্রণব মুখার্জী এবং ডায়ানার অমূল্য সেন এক মত হয়ে সমর্থন করেন তাঁকে। ছাত্র-রাজনীতি করার কারণে এই সময় কবি নানান সমস্যার সম্মুখীন হন, কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রধান শান্তিগোপাল সিংহরায় সেই সব ঝড়-ঝাপ্টা থেকে আগলে রাখেন। কবি তাঁর কাছ থেকে পিতার মতো স্নেহ পেয়েছেন। পরে ১৯৬৩-তে অবশ্য শান্তিগোপাল সিংহরায় চারুচন্দ্র কলেজ ছেড়ে চলে যান ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে।

১৯৫৯-এর ৩১ আগস্ট শুরু হয় ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ প্রায় ৮০ জন খেতমজুর, কৃষককে গুলি করে হত্যা করে। এই বর্বরতার প্রতিবাদে পরের দিন সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় সমাবেশ ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। সেখান থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির

দিকে যাত্রা করে। হিন্দ সিনেমার সামনে পুলিশ মিছিলের গতি রুদ্ধ করতে তিনদিক থেকে ঘেরাও করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন গণেশ বসু। সেই আঘাত আজও পীড়া দেয় তাঁকে। এখনো অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তাঁর কোমরে ব্যথা হয়। সেই সময়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনকেও ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এই আন্দোলন। এই পটভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাবা ও ছেলেকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা—'বাবা ফিরল, ছেলে কেন এল না।' এই সময়ের পুলিশ-মন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি বিখ্যাত কার্টুন বেরিয়েছিল। 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায়। তাতে দেখা যায় কালিপদ মুখোপাধ্যায় দু'হাত দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন, আর সেই রাজভোগ হল মানুষের মাথার খুলি।

১৯৬১-তে আই.এ. পরীক্ষা। কিন্তু কবির এক বছরের বেতন বাকি। কর্তৃপক্ষ জানায় বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিতে না পারলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তখন কবির পরিবারের যা আর্থিক অবস্থা, তাতে অত টাকা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। নীতিগত কারণে ইউনিয়ন থেকেও কোনো টাকা নেবেন না, যেহেতু তিনি ছিলেন ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক। অনোন্যপায় হয়ে ভাইস প্রিন্সিপাল ড. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরির অনুমতি নিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-সহ অন্যান্য কয়েকটি খবরের কাগজে। ১৯৬১-র ৬-ই জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সেই চিঠি বের হয় - 'সাহায্যের আবেদন : অর্থ না জুটিলে পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ'- এই শিরোনামে। চিঠিটি প্রকাশিত হলে দমদম নাগেরবাজারের এক পান বিক্রেতা যুবক ৫ টাকা দিয়ে প্রথম সাহায্য করেন। ধানবাদ, ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিকেরা মানিঅর্ডার করে পাঠায় কিছু টাকা। বেলেঘাটা জোড়ামন্দিরের কাছে থাকতেন ডা. মাধবচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁর পত্নী সকন্যা এসে কবিকে দেড়শো টাকা দেন, তার উপর পরীক্ষার সময় ভালো খাবার-দাবার খাওয়ার জন্য আরো কিছু টাকা দেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা হাতে আসায় কবি বাড়তি টাকা ড. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরির হাতে তুলে দিয়ে বলেন গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাড়তি টাকা বিতরণ করে দিতে। ডা. লাহিড়ীর পত্নী এই ঘটনার পর থেকে কবিকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন যে গণেশ বসু যতদিন পড়াশোনা করবেন তাঁর পরীক্ষার ফি তিনিই দেবেন। প্রত্যেক বছর অষ্টমীর দিনে তাঁর বাড়িতে কবির নিমন্ত্রণ থাকত। এমনকি বিশেষ বিশেষ নেমন্তন্ন বাড়িতে তিনি সঙ্গে করে নিয়েও যেতেন।

আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে কবি তিন মাসের জন্য ক্যালকাটা অটোমোবাইলস নামে একটি মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ নেন। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন বাংলায় অনার্স নিয়ে। এই সময় দুপুরবেলা কলেজের ক্লাস কেটে টিউশন পড়াতেন, মাইনে ১৪ টাকা। ছাত্র-রাজনীতির চেয়ে এবার তাঁর ঝোঁক বাড়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে। দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেটের কাছে সি.পি.আই.-এর অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। ১৯৬১-তে পার্টির সদস্য হন। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। পিকিং রিভ্যু ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও কবি তা পড়তেন গোপনে। এই নিয়ে কিছুটা বিপদগ্রস্তও হয়েছিলেন।

১৯৬৩-তে কবি একটি কাজ পান রাঁচিতে। শালিমার প্রোডাক্টস তখন রাঁচি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আবাসন নির্মাণের ঠিকাদার। কবি সেখানে ওয়ার্ক সরকারের কাজ করেন। থাকেন রাঁচি মেন রোডের উপর, রায় হোটেলে। কিন্তু কুলি-কামিনদের সঙ্গে গালাগালি দিয়ে কথা বলতে হত বলে এ কাজ তাঁর ভালো লাগেনি। মাস দেড়েক বাদে সেই চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এরপর সাউথ সাবার্বাণ মেন স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি মূলত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিতেন। কয়েক মাস পরেই কবি মণীন্দ্র রায়ের আহ্বানে 'অমৃত' সাপ্তাহিক-এ সাব-এডিটরের কাজে নিযুক্ত হন। মণীন্দ্র রায় তখন আমেরিকার ইতিহাস অনুবাদ করছিলেন। মণীন্দ্র রায় বলে যেতেন, কবি তা লিখতেন। অমৃতে কাজ করতে করতেই বি.এ. পাস করেন। মণীন্দ্র রায় তাঁকে এম.এ. পড়ার পরামর্শ দেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এম.এ.-তে ভর্তি হন। কবি 'অমৃত'-এর অফিসে আসতেন দুপুর ১টার সময়, ৭টার সময় 'অমৃত' বন্ধ হত। এছাড়া বুধবার 'অমৃত' বন্ধ থাকত। সেইদিন তিনি ইউনিভার্সিটিতে যেতেন ক্লাস করতে।

কবি গণেশ বসুর জীবনে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই (১৯৬১-তে) কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অগ্রজ কবির স্নেহ লাভ করে ধন্য হন তিনি। 'বনানীকে' নামে একটি কবিতাও প্রকাশিত হয় এ সময় 'অমৃত'-এ। বি.এ. পড়ার সময় এক বাড়িতে দু'জন মেয়েকে টিউশন পড়াতেন, একজনের নাম ছিল বনানী। তাঁকে নিয়েই কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হলে কবির টিউশনটা যায়। যাই হোক, ১৯৬৪-র এপ্রিলে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' বের হয়। কবিপত্র প্রকাশভবনের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬১-র ২ অক্টোবর থেকে ১৯৬৩-র ৮

অক্টোবর। উৎসর্গ পত্রে লেখেন - 'আমরণ যে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। দাম ছিল দু'টাকা। প্রথম প্রকাশেই যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন কবি। এম.এ. ক্লাসে সাহিত্যিক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে বইটি দেখিয়ে বলেছিলেন, আমাদেরই ছাত্র, আশা করি ভবিষ্যতে একজন কবি হবেন।

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অধুনালুপ্ত 'অমৃত' সাপ্তাহিকে কাব্যগ্রন্থটির উপর বিস্তারিত মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। কবি তরুণ সান্যাল 'সমকালীন' পত্রিকায় (১৯৬৫) বিশদ আলোচনা করে লেখেন—'সব কবিতাই যেহেতু প্রেমের আর্তিতে মুখর, বলা যেতে পারে এই তরুণ কবি নতুন কবিতার গড্ডলধারায় হারিয়ে যাননি। অন্য বহু তরুণ যখন রমণীর প্রতারণাকে মুখ্য করে পৃথিবীর দিকে তাকান, তখন গণেশ বসু পৃথিবী ও সমাজের ম্লানতার জন্যই প্রেমের পরাজয় দেখেন। কবি প্রেম ও শিল্পকে এক কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন। শিল্পই প্রেম এবং প্রেমই শিল্প।'[২]

বনানীকে নিয়ে কফি হাউসে কবির বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হত। সেই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন-পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, কল্যাণ সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ প্রমুখ। এই সময় থেকেই কবি তরুণ সান্যাল গণেশ বসুর প্রতি বিশেষ নজর দেন। বনানীকে নিয়ে সেই সময়ের এক গল্পকার দিলীপ মিত্র একটি গল্পও লিখেছিলেন। যা বেরিয়েছিল সাপ্তাহিক 'বসুমতী'-তে।

১৯৬৫-তে এম.এ. পাস করেন, ১৯৬৬-তে ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজে ইভনিং-এ পার্ট-টাইম পড়াবার সুযোগ পান। তিনি তখন দিনে কাজ করতেন 'অমৃত'-এ, রাত্রে পড়াতেন কলেজে, সুযোগমতো টিউশনও করতেন। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে গোটা রাজ্য তখন আবারো তোলপাড়। এই সময় অর্থাৎ ১৯৬৪-র আগস্ট থেকে ১৯৬৬-র ডিসেম্বর পর্যন্ত কবি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি'-র কবিতাগুলি রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪, ইংরেজি ১৯৬৭-র মে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও তাঁর বন্ধু মৃণাল দেবের সৌজন্যে বীক্ষণ প্রকাশ ভবনের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নিতাই ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পীও নিতাই ঘোষ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬০। দাম তিন টাকা। ছাপেন ডি ডি প্রিন্টার্সের পক্ষে দেবিদাস মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ করেন কবি বিষ্ণু দে-কে।

গণেশ বসুর বহু আলোচিত কবিতা 'সমুদ্রমহিষ' এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাটি পড়ে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সীমান্ত' পত্রিকায় লেখেন—'সম্প্রতি বাংলা কবিতায় যখন সব-ছড়ানো সব-হারানো দেউলেপনার

যুগ, যখন পুরো জাতটার সঙ্গে বাংলা কবিতা ও পি.এল. ৪৮০-র মুষ্টিভিক্ষার মুখ চাওয়া, তখন কবি গণেশ বসুকে আত্মীয় বোধ করতে পেরে স্বস্তি পেলুম। মনে হল আমারও 'রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।'[৩]

কবিতাটি পাঠ করে কবি বিষ্ণু দে একটি আস্ত কবিতা লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গণেশ বসুকে -

'মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাস্ফীত সমুদ্রমহিষ
তোমার কবিতা ওঠে জ্বলে জ্বলে ফসফরাসরাশি,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশপাতাল জুড়ে, চুল ওড়ে, বাহুর গারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল
সফেন উন্মার্গ নৃত্যে বিশ্বময় ভাষা খোঁজে
তখন নিজেকে লাগে অপরাধী, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
চেনা চেনা মুখে ক্ষিপ্র ধ্বংসের সেবার
ঊর্ধ্বশ্বাস, কেউ খোঁজে কংকালের কঠিন বিবর
বিমিশ্র হৃদয়ে শুধু অসহায় আর্তনাদে, আর
ঊর্ণাজাল গেঁথে চলে উত্তরে দক্ষিণে।
তখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্তমহিষ
নীলে লাল আহিরভৈরবে,
আর দশপ্রহরণ হাতে হাতে তুলে দেয়
তোমার কাব্যের যিনি মরণমর্দিনী।'[৪] (১৯৬৮-র ১৮ই এপ্রিল কবি গণেশ বসুকে লেখা বিষ্ণু দে-র চিঠি।)

প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী লেখেন-'কবি গণেশ বসুর শিল্প-মনন কোনো বোধহীন একদেশদর্শিতা কখনো স্বীকার করেনি। তাঁর চিত্তলোকে আছে সেই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, মনন-লোকে আছে সেই ক্ষমতা যার ফলে তিনি প্রগতিক পদযাত্রায় বহুমুখী ধারাগুলির বিচিত্র সংশ্লেষ বুঝে নিতে পারেন।'[৫]

১৯৭৩-এর মার্চ মাসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রকাশনা থেকে যে 'স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় কবিতা' শিরোনামে 'বাংলা কবিতা সংকলন' প্রকাশিত হয় তাতে 'সমুদ্রমহিষ' কবিতাটি স্থান পায়। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্‌স্নাতক পর্যায়ে পাঠ্যও ছিলো একবার।

১৯৬৯-এ কবি অস্থায়ীভাবে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পান। পাকাপাকি ভাবে অধ্যাপনার সুযোগ পান ০১/০৯/১৯৭০-এ। 'অমৃত' থেকে বিদায় নিয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দেই কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' প্রকাশিত হয়। জয়ন্তকুমারের সৌজন্যে অনুভব প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। বইটির দাম ছিল দু'টাকা। ছাপেন কুমার প্রিন্টার্সের পক্ষে জয়ন্তকুমার। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি মণীন্দ্র রায়কে। এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৬৭ থেকে অক্টোবর ১৯৬৯। খাদ্য আন্দোলনের পর তখন শুরু হয়ে গেছে নকশাল আন্দোলন। একদল তরুণ রক্তের বিনিময়ে সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের 'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন''।[৬] বলা বাহুল্য সে স্বপ্ন কবির রক্তেও খেলা করে। তাই শাসকের জল্লাদবৃত্তিতে কবির 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র ফেটে পড়ে লক্ষ লক্ষ ক্রোধের ফার্নেস'[৭] অথবা 'ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে'।[৮]

'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কথাশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লেখেন— 'রৌদ্র কিংবা অন্ধকার হতে দ্রুতবেগে বর্শার ফলক প্রথমে স্পর্শ এবং তারপর, পর পর স্নায়ু, মাংস, রক্ত ও অস্থি ভেদ করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। রক্তের বন্যা নয়, মোহময়ী বেত্রবতীও নয়, কমনীয়তায় স্নেহময়ী অঞ্জনা তো নয়ই। কালো কাঠের গুঁড়ি, শক্ত পাথরের চাঁই আর শুকনো বালির মাঝে মাঝে ছড়ানো-ছিটানো তিস্তা। ভিতরে ভাসান। মাঝে মাঝে প্রতিশোধ-অস্থির প্রলয়। কিন্তু রক্তের। এই হল রক্তের ভিতরে রৌদ্রের মেজাজ, গণেশ বসুর কবিতা। এ গ্রন্থ এই মেজাজেরই ঊর্ধতর সোপান। কঠিন জটিলতা, ক্রোধ আর নিশার মাঝখানে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমুদ্রমহিষ হয়ে, 'রক্তের ভিতরে রৌদ্রে' এসে তা যেন বিস্ফোরণের উচাটনে দুটি শক্ত হাত হয়ে ওঠার অধীর প্রয়াসে অশান্ত।'[৯]

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় লেখেন-'আমি স্বভাব-সংগতভাবে কবিতায় বা যে কোনো শিল্পে রাজনীতি চর্চার বিরোধী, শিল্পীর স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশই শিল্প এই বিশ্বাস একান্তে লালন করে এসে বিরোধী বিশ্বাসের সম্মুখীন হওয়ামাত্র বিপরীত মতাদর্শের গভীরতা ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলাম। উপলব্ধি করেছি যে, কোনো বিশ্বাস যদি স্রষ্টার অন্তর্জগৎ থেকে উদ্ভুত হয় তাহলে তার জোর সৃষ্টির প্রতিটি কোষে কোষে শক্তিশালী জীবনীশক্তি সঞ্চার করে, তাকে অপছন্দ হতে পারে, অবহেলা করা চলে না, এমনকি বিশ্বাসের ভিন্নভূমিতে অবস্থান করেও অভিভূত

হতে হয়; গণেশ বসুর কবিতার প্রাণশক্তি এইখানে, বিশ্বাস ও আচরণে তিনি সৎ, নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া এতই বিবেকসংগত, সেই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য লড়াই করতে তিনি পিছপা নন; এই বিশ্বাস তাঁর কবিতার অন্তর্শক্তি, সৃষ্টির ও সমৃদ্ধির অন্তর্গত প্রেরণা ও প্রাণশক্তি।'[১০]

১৯৭০-এর মার্চে কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন কাব্যটির নাম ছিল 'অধিকার রক্তের কবিতার', পরবর্তীকালে কবি এই কাব্যের নাম পরিবর্তন করে 'লেনিন : অধিকার রক্তের কবিতার' রাখেন। কাব্যটি আসলে একটিই দীর্ঘ কবিতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন দীপেন রায়। পরিবেশক মনীষা গ্রন্থালয়। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ, অলংকরণ ধ্রুব রায়। দাম দু'টাকা। ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস থেকে মুদ্রিত। রচনাকাল জানুয়ারি, ১৯৭০। উৎসর্গ করেন কবি তরুণ সান্যালকে। কাব্যের ভূমিকায় কবি লেখেন—'গত বছরই 'লেনিনের যুগ' কাব্য-সংকলন সম্পাদনার সময়ে মাথায় এসেছিল এক ঝোঁক। দীর্ঘ কবিতা লেখার রোখ চাপে। তবে এর মাশুলও কম গুনতে হয়নি। লেনিন আর লেনিনবাদের সারাৎসারে নিজের অক্ষমতার সান্ত্বনা নেই।'

'লেনিন:অধিকার রক্তের কবিতার' কাব্যটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— 'দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তখন রঙের বদল ঘটেছে। দুঃশাসন কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে দু'বারের যুক্তফ্রন্ট। ভুল হোক শুদ্ধ হোক গ্রামে গঞ্জে উগ্র বামপন্থীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে মার্কস-লেনিন-মাও-এর নাম। বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু শব্দ। উত্তরের হাওয়ায় রাশি রাশি ফেটে যাওয়া শিমূল তুলোর মত শ্রেণীশত্রু, খতম, শোধনবাদ, নয়া-শোধনবাদ...এবং এইরকম আরও।'[১১]

আর তখন লেনিনকে নিয়ে জন-জাগরণের স্বপ্ন দেখছেন মার্কসপন্থী সমস্ত কবি। কবি তরুণ সান্যালের সঙ্গে 'লেনিনের যুগ' কাব্য-সংকলন (১৯৬৯) সম্পাদনা করছিলেন গণেশ বসু। কবি বিষ্ণু দে লিখছিলেন এমন সব উজ্জীবিত পংক্তি - ১) 'পরদেশি পরবাসী কত ছিল লেনিন তোমার দেশে?'' ২) 'লেনিনের মনীষার হস্তাক্ষর বিশ্বব্যাপ্ত আজ ইতিহাসে', ৩) 'শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে শতায়ু লেনিন!'[১১] তখন মার্কসবাদী যে-কোনো কবির পক্ষেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল লেনিনকে নিয়ে কবিতা রচনা। গণেশ বসুও লেনিনকে নিয়ে লিখে ফেললেন একটি দীর্ঘ কবিতা—'লেনিন:অধিকার রক্তের কবিতা'।

কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি মণীন্দ্র রায় লেখেন-'গণেশ বসু যা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন তা তরুণ কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। বর্তমান

কালের এবং অনতিদূর অতীতে বাংলা দেশের সমাজ জীবনে যা ঘটেছে সেই বহুতল বিশিষ্ট বিচিত্র জটিল বাস্তবকে একটি দীর্ঘ কবিতার অবয়বে সমগ্রতা দেওয়া এবং তাতে মানুষের ইতিহাসে নবযুগের স্রষ্টা মহামতি লেনিনের ভাবসমর্থন একীভূত করা সৎ এবং পরিশ্রমী কবিত্ব শক্তিরই মুখাপেক্ষী। গণেশ এ কাজে আশাতীতভাবে সফল হয়েছেন।'[১২]

১৯৭১-এর জুন-এ গণেশ বসুর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' প্রকাশিত হয়। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন দীপেন রায়। পরিবেশনায় সারস্বত লাইব্রেরী। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রী অনিল দে, শ্রী অশোক সেন, শ্রী বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়কে। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১।

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' হল গণেশ বসুর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রয়োগে কাব্যের নামকরণ এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার স্বাদ যে কোনো দেশের পক্ষেই অমৃত আস্বাদের সঙ্গে সমতুল্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা লাভের পথটি বহু মানুষের আত্মত্যাগে ও রক্তক্ষরণে পিচ্ছিল। যা মৃত্যুর মতোই শোকাবহ। অর্থাৎ অমৃত আস্বাদের জন্য বা স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মানুষের লড়াই করার কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে এই নামকরণে। ১৯৭১-এ এপার ও ওপার উভয় বাংলায় উত্তাল। এপার বাংলায় অতি-বামপন্থী কয়েকজন তরুণ নতুনভাবে দেশ গড়ার স্বপ্নে মশগুল। তারা তখন বামপন্থীর ছদ্মবেশধারী কংগ্রেসের গুপ্তচর খুনের তান্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে। আর এর পাল্টা হিসেবে শাসক তাদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। অন্যদিকে ওপার বাংলা তখন তাদের ভাষাগত Identity-কে সম্বল করে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে মুক্তিলাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইরকম টালমাটাল সময়েই গণেশ বসু 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ'-এর কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন।

'অমৃত'-এ একদা কাজ করার সুবাদে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ভি.ডি.জে.-র আমন্ত্রণে জার্মানিতে যান কবি। বেইরুট সহ হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, তাশখন্দে ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন। বার্লিনের ভি.ডি.জে. পুরস্কার(১৯৭৩) প্রদান করা হয় তাঁকে। এইসময় ইরিনা নামে এক জার্মান তরুণীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁর। যদিও সে প্রেম প্রত্যাশিত পরিণতি পায়নি। জার্মানি থেকে ফিরে এসে আবার অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। 'অমৃত'-এ সাংবাদিকতা করার সময় তিনি অমৃতবাজার-যুগান্তর-অমৃত এমপ্লয়িজদের ইউনিয়ন গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, প্রতিষ্ঠাতা সহঃসম্পাদকও হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি পশ্চিববঙ্গ কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WBCUTA)-র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই সমিতির নানা সমস্যার সমাধানে ছুটে বেড়িয়েছেন ১৯৯৯ থেকে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য হয়ে গঠনমূলক কাজ করেছেন। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবেও বঙ্গবাসী (মর্নিং, ডে, ইভনিং), নিউ আলিপুর কলেজ প্রভৃতির মতো বহু কলেজে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পঠন- পাঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন।

১৯৮২-র মার্চে গণেশ বসুর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবার নিচে' প্রকাশিত হয়। মডেল পাবলিশিং হাউস থেকে জয়দেব ঘোষ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। প্রচ্ছদ নিতাই ঘোষের আঁকা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে।

'বাঘের থাবার নিচে'-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৮২-র ফেব্রুয়ারি। কবির পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' প্রকাশের প্রায় দশ বছর পর এই কাব্য প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চালচিত্রে অনেক বদল ঘটেছে। বদল এসেছে কবির ব্যক্তিগত জীবনেও। তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পার হয়েছে। বিদেশ ঘুরে এসেছেন তিনি। দশ বছরের বেশি সময় ধরে অধ্যাপনা করছেন। ফলে চিন্তা ভাবনাতেও এসেছে এক পরিণতির ছাপ। যার প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যের কবিতাগুলিতে।

এই কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপটটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন মৃদুল দত্ত রায়— 'ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়ে এসে বাঙালি কবিদের জীবন নাগরিক ও ব্যক্তিগত জটিল আবর্তে প্রবেশ করেছিল। গণসংগ্রাম, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ মানুষের জন্য নতুন সূর্য ওঠেনি। বরং এক অনিবার্য ক্ষয় জীবনকে গানহীন করতে ভারী থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। গণজীবন ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছিল। এরকম সংকটের দিনে গণেশ বসুর মতো দরদি শিল্পীরা একবারের জন্যও জনগণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। ষাটের দশকের আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। আর আশির দশকের আন্দোলন হয়ে উঠল একক মানুষের সার্বিক বেঁচে থাকার লড়াই। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে অতিক্রম করেও যে কেবলমাত্র জীবনের প্রতিনিধি হয়ে বহুর জীবনের সংকটকে স্পর্শ করা সম্ভব, তা এ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে'।[১৩]

গণেশ বসুর 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৯-এর জানুয়ারিতে। শঙ্খ পুস্তক প্রকাশনের পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন শঙ্খনীল দাস। ছাপেন দি শিবদূর্গা প্রিন্টার্সের নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। উৎসর্গ -

শ্রীচরণেষু মা-কে। কবিতাগুলির রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯।

'নীরব সন্ত্রাস' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন -'১৯৯০-এর একেবারে গোড়ায় এটি আচমকাই আমি ব্যবহার করি শ্বেত সন্ত্রাস, লাল সন্ত্রাস, গৈরিক সন্ত্রাস ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে। এই শব্দটি বেরিয়ে আসে আমি যে কলেজে পড়াতাম সেখানকার অধ্যক্ষ ও তাঁর একান্ত অনুগত মুষ্টিমেয় অধ্যাপকদের দুঃসহ আচরণে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে।'[১৪] কবি বাল্মীকি ক্রোঞ্চের শোকে শোকাভিভূত হয়ে যেভাবে শ্লোকের জন্ম দিয়েছিলেন, গণেশ বসুও তেমনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারিত হয়ে 'নীরব সন্ত্রাস' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরেই জীবন-অভিজ্ঞ কবি দেখলেন আজ গোটা দেশ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত। এ সন্ত্রাস শিরায় শিরায়, পরতে পরতে ঘুন ধরানো এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সঞ্চারিত। হারিয়ে গেছে মানবিকতা, মানুষের মন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। প্রাণের সজীবতা, সরসতা কোথাও নেই, যেন— 'গোটা দেশ ডুবে যায় মর্গের ভিতরে।'[১৫] জীবনের এই বিশুষ্ক ছবি ধরা পড়েছে সুদীর্ঘ 'খরা' কবিতায়।

কবি পার্থ রাহা 'গণশক্তি'-তে (১৯৯৯) লেখেন— 'এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'খরা' একটি উনিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতা। খরা প্রকৃতিতে, খরা মানুষের মনে, চারপাশের জীবনে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির খরা আফ্রিকা থেকে ওড়িশায়। প্রকৃতির খরা থেকে আমাদের চারপাশের বন্ধ্যাত্ব খরা। কিন্তু এই কবিতার ঐশ্বর্য হল এক নিবিড় প্রত্যয়।'১৬

'নীরব সন্ত্রাস' কাব্য রচনার আগে গণেশ বসু দুটি ভাষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন পবিত্র সরকারের সঙ্গে। ১৯৮৯-এর মার্চে প্রকাশিত হয় 'ভাষা-জিজ্ঞাসা' আর ১৯৯১-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত হয় 'ভাষা-সরিৎসাগর'। দুটি গ্রন্থই 'বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির' থেকে প্রকাশিত। পরে অবশ্য প্রকাশন সংস্থান বদল ঘটে। "ভাষা-জিজ্ঞাসা' হয়ে যায় 'মাধ্যমিক ভাষা সন্ধান'।

২০০১-এর ৩০ নভেম্বর কবি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। ২০০২-এ তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ ('বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', 'নিজের মুখোমুখি', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'লেনিন-অধিকার রক্তের কবিতা', 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ', 'বাঘের থাবার নিচে', 'নীরব সন্ত্রাস') নিয়ে 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১' প্রকাশিত হয়। ২০০৩-এ ভাষা-সংক্রান্ত আরো দুটি বই আরেকটি বই 'ভাষাসঙ্গী' প্রকাশিত হয়।

গণেশ বসুর অষ্টম কাব্যগ্রন্থ 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০০৫-এ। বসুধারা প্রকাশনার পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন কৌস্তুভ বসু। গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় এই 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'-ই হল কবির জীবন ও কাব্যের বীজমন্ত্র। শৈশবে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে অর্ধাহারে, অনাহারে কাটানোর সময় কবি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন অন্নের মহিমা। ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেই ছাত্রাবস্থায় খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে মার্কসীয় আদর্শে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কবিতার মধ্যেও আমরা তার ছাপ দেখতে পাই। অপরদিকে অশ্রু হল ছিন্নমূল মানুষের, ক্ষুধার্ত মানুষের, সর্বহারা, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষের কান্নার প্রতীক। আর কবিতা হল কবির ভায়োলিন। তাতে অসহায় মানুষের বেদনার সুর যেমন বাজে, তেমনি বিদ্রোহের ঝঙ্কারও শোনা যায়।

২০০৬-এ সাহিত্য কৃতির জন্য গণেশ বসু মঙ্গলাচরণ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসান দরিয়া' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮, বসুধারা প্রকাশনী থেকে) ও 'ভাঙা বইঠার গান' (প্রথম প্রকাশ ২০১১, জানুয়ারি, মনন প্রকাশনী থেকে) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মৃদুল দত্ত রায় বলেন— 'গণেশ বসুর রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, দলীয় রাজনীতির অপরিসর, সংকীর্ণ, বাদুরে গন্ধে দমবন্ধ করা আদর্শে তিনি নিজের কবিতাকে বেঁধে ফেলেননি। তিনি দলকে পেরিয়ে দেখেছেন মানুষকে। সেই মানুষের যন্ত্রণা বারবার তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাই একসময় মানুষকে সংগ্রামী বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি, তার বর্তমান স্বৈরাচার গণেশ বসুকে নীরব করতে পারেনি।... গণেশ বসুর 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসান দরিয়া' এবং 'ভাঙা বইঠার গান' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার এক বিরাট ক্যানভাস হয়ে উঠেছে'।[১৭]

কবির প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'নরকরোটিতে প্রজাপতি' প্রকাশিত হয় ২০১১-র মার্চে। মনন প্রকাশনী থেকে। গ্রন্থটি আসলে কবির দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যরচনার ফসল। এজন্য অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়ও সাহিত্য। অবশ্য তাতে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। গোপা দত্ত ভৌমিক গণেশ বসুর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— 'লক্ষ্যণীয় তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি, গভীরতা, চিন্তার মৌলিকতাকে প্রকাশ করার ধরনটি। পান্ডিত্যের গদাঘাত করা তাঁর স্বভাবে নেই, আবার জনপ্রিয় হবার তারল্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। এমন ভারসাম্যময় প্রবন্ধ খুব বেশি দেখা যায় না।...

গণেশ বসুকে কবি হিসেবেই লোকে প্রধানত চেনে, কিন্তু কবিখ্যাতির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়। পদ্যরীতির মতোই গদ্যরীতিতে রয়েছে তাঁর জোরালো অধিকার।'[১৮] দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ হলো সাংবাদিকতায় কার্ল মার্কস।

গণেশ বসুর পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বর্ণময় পৃথিবী', প্রকাশ জুন ২০১৩, মনন প্রকাশনী থেকে এবং 'বল্‌গা হরিণের শিং', প্রকাশিত হয় মার্চ ২০১৫, কবিতা সীমান্ত থেকে। কবির সবচেয়ে বড় কাব্যগ্রন্থ 'বল্‌গা হরিণের শিং', ১৯৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে এখানে। কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। 'শাসক উন্মাদ হলে', 'শয়নকক্ষেও কর চাপালেন তারা'-র মতো প্রতিবাদী কবিতা যেমন রয়েছে সেখানে, তেমনি 'বন্ধুতার মর্ম বুঝি বিদায় বেলায়', 'বাবাকেই দেখি'-র মতো একান্ত ব্যক্তিগত কথাকেও কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। জীবনের প্রান্ত বেলায় দাঁড়িয়ে যুবা বয়সের প্রেমের কথা, কবি-প্রেমিকা ইরিনার সঙ্গে বৃষ্টিমুখর বার্লিনের রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

'বল্‌গা হরিণের শিং' হল কবির এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। অবশ্য কবির লেখনী এরপরও থেমে থাকেনি। আশি বছরে পা দিয়ে এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে এখনও তিনি সমানে লিখে চলেছেন। ২০১৯-এর শারদীয় সংখ্যায়, 'নতুন পথ, এই সময়', 'কবিতা কলকাতা', 'শারদীয় কালান্তর', 'শারদ নন্দন' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'ক্ষমতাই শেষ কথা নয়', 'মানবতা অদ্ভুত নীরব' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় তাঁর লেখনীর অভিমুখেরও বদল হয়নি। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মানুষের প্রতি অন্যায়, অবমাননা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরতে পিছুপা হননি। জাতীয়তাবাদের আড়ালে মানবতার অপমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে কবি লেখেন—

'মানবতা অদ্ভুত নীরব,
রক্তে ভাসে শিশুদের শব,
এর নাম রাষ্ট্রধর্ম বুঝি?
মর্টারে অভিযানে জাতীয়তা স্মরণীয় পুঁজি।...
মানুষ নিখোঁজ হয়, ছররা চলে মাত্রাহীনতায়
রাত্রি জুড়ে শুধু আর্তস্বর
আপেলের বনে বনে মৃত্যুর খবর।'[১৯]

তথ্যসূত্র

১) 'আমার বন্ধু কবি গণেশ বসু', 'অহর্নিশ' (পত্রিকা), বর্ষ-১৯, সংকলন-২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, পৃষ্ঠা-৫৯

২) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭৪
৩) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৪
৪) 'অহর্নিশ' (পত্রিকা) বর্ষ আট, একাদশ সংকলন, শীত ১৪১১, পৃষ্ঠা-৩
৫) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭৫
৬) 'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৯১
৭) 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৯৫
৮) 'সিংহ', 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৭৪
৯) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭৫
১০) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭৫-২৭৬
১১) 'গণেশ বসুর কবিতা', 'এবং মুশায়েরা' (পত্রিকা), শারদীয়া ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা -৩০৯
১২) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭৬
১৩) 'গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার', 'অহর্নিশি'(পত্রিকা), বর্ষ- ১৯, সংকলন-২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, পৃষ্ঠা-৭৫
১৪) 'কবি গণেশ বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'সময় তোমাকে' (পত্রিকা), উৎসব সংখ্যা- ২০১০, পৃষ্ঠা-৯৭
১৫) 'খরা', 'নীরব সন্ত্রাস', 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭০
১৬) গ্রন্থ-পরিচয়, 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১', প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২৭৯
১৭) 'গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার', 'অহর্নিশি' (পত্রিকা), বর্ষ-১৯, সংকলন-২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, পৃষ্ঠা-৭৬
১৮) 'মনন ও আবেগের সমন্বয়', 'অহর্নিশি' (পত্রিকা), বর্ষ-১৯, সংকলন-২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, পৃষ্ঠা-৬৫
১৯) 'নবপর্যায়' (পত্রিকা), শারদীয় ২০১৯

মুখোমুখি : কবি গণেশ বসু

নিখিল কুমার মাহাতো

প্রশ্ন:- আপনার জন্ম তো বরিশালে, এক জমিদার পরিবারে। দেশভাগের কারণে এপার বাংলায় আসার পর আপনার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি কীভাবে কেটেছিল?

কবি:- আমরা কলকাতায় আসি ১৯৪৮-এর আগস্ট মাসে। শিয়ালদহ থেকে আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় এক পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পে, আশ্রয় শিবিরে। তিনদিন বাদে ৩ বি. কুন্ডু লেন, ভবানীপুরে আসি। এই বাড়িতে থাকতেন আমার ছোটো পিসিমা। আমার বাবার সব থেকে ছোটো বোন। তাঁরাই এইসময় আমাদের আশ্রয় দেন। পিসেমশায় ছিলেন পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফের একজন অফিসার। এখানে আসার কিছুদিন পরে ১৯৪৯-এ নাসিরুদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। পিসিমার বাসায় বেশ কিছুদিন থাকার পরে ১৯৫০-এর শেষার্ধে নানাবিধ সমস্যার জন্য আমাদের টালিগঞ্জের একটি বস্তি এলাকায় চলে আসতে হয়। প্রায় এক মাস পর সেখান থেকে আসি - ২ বি. চন্দ্রমন্ডল লেনে আমার ছোটো মামার একটি দোকানঘরে। ছোটোমামা ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন একটি ছোটখাটো আইসক্রিমের কারখানা তৈরির জন্য। এখানে আসার পর আমার বাবা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন, গ্যাস্ট্রিক আলসারে। সেই সময় থেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য আমি খবরের কাগজের ঠোঙা বানানো শুরু করি, আমার দিদিও তা-ই করেন। আমার দাদা দোকানে দোকানে চানাচুর সাপ্লাই দেওয়ার কাজ নেয়। আমার মা প্রথমদিকে বিভিন্ন বাড়িতে কাঁথা সেলাই ও রাঁধুনির কাজ করতেন, পরে এক প্লাস্টিক কারখানায় দৈনিক মজুরিতে চাকরি করেন। ১৯৫১-এর শেষদিকে আমাদের চলে আসতে হয় সাহা-নগরে আমার ন'মামার বাসায়। ন'মামা ছিলেন বিপ্লবী, অনুশীলন সমিতির সদস্য, পুলিনবিহারী দাসের ঘনিষ্ঠ সহচর। জেলও খেটেছিলেন তিনি। ন'মামার নাম সুরেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর বাসায় আমরা দিন কয়েক মাত্র ছিলাম। সেখানে আমার কোলে মাথা রেখে আমার ছোটো বোন মারা যায়। সেই ছোটো বোনকে আমি তখন মুড়ি খাওয়াচ্ছিলাম, মুড়ি খেতে খেতেই ঢলে পড়ে সে। তারপর ন'মামার বাসায়

আমরা আর থাকলাম না। ৩৭ নং গোবিন্দ ব্যানার্জি লেনে চলে এলাম। সেখানে আমার মেজো পিসিমা থাকতেন। আমরা অবশ্য তাঁকে বড়ো পিসিমা বলেই ডাকতাম, কারণ বড়ো পিসিমাকে আমরা কখনো চোখে দেখিনি। পিসেমশায় সুবোধচন্দ্র গুহমুস্তাফি ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি যে বাড়িটিতে থাকতেন সেটি আসলে তাঁর নিজের নয়, সেটি ছিল ভাড়া বাড়ি। পিসেমশায় মারা যাওয়ার পর নিচের তলায় অন্য দু'জন ভাড়া দুই ভাড়াটে পরিবার থাকতেন। আর আমরা বারান্দাতে রাত কাটাতাম। সেখানে থাকার সময় আমি ভর্তি হলাম দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে। এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন শিশিরকুমার দাশ। আমরা সারা বছর বিনে পয়সায় পড়তাম। রিফিউজি স্টাইপেন্ড যখন চলে আসত, তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ সমস্ত বকেয়া টাকা কেটে নিত। এছাড়া সরকার থেকে ৪০ টাকা পেতাম বই কেনার জন্য। ১৯৫৭-এ আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিই। তারপর আমরা চলে আসি বাঁশদ্রোণীতে। একখানা ঘর। জমিটা সরকার থেকে পাওয়া। সরকার আসলে জমিটা দিয়েছিল আমার ন'মামাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে। ন'মামা সেটা আমার বাবার নামে করে দেন। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, টালিগঞ্জে আমি ড্রাফটসম্যানশিপ সিভিলে চান্স পাই। সেখানেও সরকার থেকে চল্লিশ টাকা করে স্টাইপেন্ড পেতাম।

প্রশ্ন:- শিল্প-সাহিত্যের জগতে এলেন কখন এবং কীভাবে?

কবি:- কবিতা রচনা, নাটকে অভিনয়, ম্যাজিক শো এসব শুরু করি এক বন্ধুর উৎসাহে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় পরবর্তীকালের নাট্য পরিচালক, দূরদর্শনের অভিনেতা, যাঁর পরিচালনায় স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও অভিনয় করেছিলেন-সেই অনিল দে-র সঙ্গে। আমরা গোবিন্দ ব্যানার্জি লেন থেকে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে হেঁটে যেতাম। কোনোদিন খেয়ে যেতে পারতাম না। অনিল আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাঝে মধ্যে খাওয়াত। অনিলের বাড়ি থেকেও আমি আদর যত্ন পেয়েছি। অনিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ওর সঙ্গে আমি ম্যাজিক করি। পি.সি. সরকারের ইন্দ্রজাল সম্পর্কিত বই কিনে আমরা ম্যাজিক প্র্যাকটিস করতাম। সেই ম্যাজিক নিয়ে পরবর্তীকালে সাহানগর স্কুল, চেতলা বয়েজ প্রভৃতি জায়গায় আমরা ম্যাজিক শো করি। পাশাপাশি আমি অনিলের সঙ্গে নাটকে অভিনয় করতেও শুরু করি। আমি বিধায়ক ভট্টাচার্যের ''জাগো রে ধীরে'' নাটক, শিবরাম চক্রবর্তীর পন্ডিত বিদায়' নাটক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৈকুন্টের খাতা' নাটকে ঈশানের ভূমিকায়

পাঁচবার অভিনয় করেছি। 'তাসের দেশ' 'মুক্তধারা' 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপে অভিনয় করেছি। 'শিবাজী' যাত্রাপালায় আমি ছোটো শিবাজীর বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময়েই আমি প্রথম গদ্য লিখেছিলাম মহাত্মা গান্ধির উপর। এটাই আমার প্রথম লেখা। এর পর কবিতা লিখতে শুরু করি। ১৯৫৪ অথবা ১৯৫৫-তে "পথের বাণী" নামে একটি দেওয়াল পত্রিকায় প্রথম কবিতা লিখি। কবিতাটির নাম ছিল 'মৃত্যু'। কবিতার শুরুটা ছিল এরকম - 'ক তুমি? কে তুমি আসিছ ছুটি স্নিগ্ধ চপল চরণে / বর্ণহীন আভাহীন নিশিথে অদৃশ্য মুখোশে / ঢাকিয়া সর্বাঙ্গ তব নিশীথের বনানীর মতো।' ড্রাফটসম্যানশিপ পড়ার সময়েও আমি কবিতা লিখি। তখন 'যুগ ও জীবন' নামে একটি পত্রিকা চলত। সেই পত্রিকার সম্পাদক মৃণাল দাশগুপ্ত আমার কবিতা বার বার ছেপেছেন।

প্রশ্ন:- আপনি তো একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। আপনার কবিতাতেও মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার ছাপ স্পষ্ট। একদিকে জীবিকা নির্বাহের ভাবনা, অন্যদিকে কবিতা রচনা, এর মধ্যে রাজনীতিতেও কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন?

কবি:- আমার মেজোমামার একজন বন্ধু ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন। আমার ন'মামা ছিলেন বিপ্লবী। এঁদের সংস্রবে আসার ফলেই আমার মধ্যে কমিউনিস্ট মানসিকতার ভিত তৈরি হয়েছিল বলে মনে করি। ১৯৫২-এ সাধারণ নির্বাচন হয়, তখন আমরা থাকতাম চন্দ্রমন্ডল লেনে। অম্বিকা চক্রবর্তী দাঁড়িয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে, বিধানসভার জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির স্কোয়াডে ১০-১২জন ক'রে ছাত্র মিলে আমরা চোঙা ফুঁকতাম। শ্লোগান দিতাম - 'ভোট দেবেন কিসে / কাস্তে ধানের শিষে'। তখন কংগ্রেসের চিহ্ন ছিল জোড়া বলদ। আমরা বলতাম - 'হারে গা জি হারে গা / জোড়া বলদ হারে গা'। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় গোয়ামুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। সেই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র অরুণোদয় গুহ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাঁর নির্দেশে আমি গোয়ামুক্তি আন্দোলনের জনসভায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হই। ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, কৌতূহলবশত তাতেও যোগ দিই। এক স্টপ থেকে ট্রামে উঠতাম, কয়েক স্টপ বাদে নেমে যেতাম, কোনো ভাড়া দিতাম না। শিক্ষক আন্দোলন যখন হল তখনো আমি সেই শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল গিয়েছি। ১৯৫৭-এর নির্বাচনে সোমনাথ লাহিড়ি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে আলিপুর কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সমর্থনেও আমি মিছিলে গেছি ১৯৬১-তে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য

পদ লাভ করি।১৯৬২-র নির্বাচনে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের এবং ১৯৬৭-তে সোমনাথ লাহিড়ির সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিই। হ্যাঁ এই ১৯৬৭-তে সোমনাথ লাহিড়ির বিধানসভা কেন্দ্র বদল হয়ে ঢাকুরিয়া হয়। তখন রাত দেড়টা, দু'টো, আড়াইটে পর্যন্ত আমরা সোমনাথ লাহিড়ীর জন্য পোস্টার লিখতাম, পোস্টার সাঁটতাম। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সংঘর্ষ নিয়ে যখন তুলকালাম অবস্থা তখন আমি কিছুটা বিপদগ্রস্ত হয়েছিলাম "পিকিং রিভিউ" নামক কাগজ রাখার জন্য। এটি তখন ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

প্রশ্ন:- খাদ্য আন্দোলনেও তো আপনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

কবি:- ১৯৫৯-এর আগস্টের শেষ দিনে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যে আন্দোলনকে চুরমার করতে পুলিশ বর্বরভাবে প্রায় ৮০ জন খেতমজুর, কৃষককে লাঠিপেটা করে হত্যা করেছিল ময়দানে। পরদিন ছাত্র আন্দোলন হয়। কেন্দ্রীয় সমাবেশ ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে। সেখান থেকে মিছিল করে আমরা যখন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে আসি তখন হিন্দ সিনেমার সামনে তিনদিক থেকে ঘেরাও করে আমাদের উপর কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ চলে। আমার বাঁ পায়ের থাই ও পশ্চাদদেশে পুলিশের পরপর লাঠির বাড়ি পড়ে। যার ফলে এখনো অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে বেদনা হয়, ঠিকমতো হাঁটতে কষ্ট হয়। এখনো আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় সেই ১৯৫৯-এর ১লা সেপ্টেম্বরের ছাত্র আন্দোলনের কথা। এই ঘটনার পর তিন-চারদিন টালিগঞ্জ থানার এলাকাতে নিস্প্রদীপ হয়েছিল। আর এই আন্দোলনের উপরেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাবা ও ছেলেকে নিয়ে সেই বিখ্যাত কবিতা— 'বাবা ফিরল, ছেলে কেন এলো না।' এই আন্দোলনের সময়ে পুলিশমন্ত্রী ছিলেন কালীপদ মুখোপাধ্যায়। শারদীয়া বিংশ শতাব্দী-তে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল-কালীপদ মুখোপাধ্যায় দুই হাত দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন, আর সেই রাজভোগ হল মানুষের খুলি।

প্রশ্ন:- আপনার কলেজ জীবনের স্মরণীয় ঘটনার কথা এবং অধ্যাপক হওয়ার আগে পর্যন্ত বিচিত্র কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

কবি:- আমি প্রথমে ভর্তি হয়েছিলাম বঙ্গবাসী কলেজে, ইভনিং-এ, সায়েন্স নিয়ে। কয়েকদিন বাদে আমার বন্ধুর সঙ্গে একসাথে পড়াশোনা করার জন্য আমি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চারুচন্দ্র কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হলাম। দিন দশেক বাদে ট্রান্সফার নিয়ে ডে-তে চলে আসি। এই চারুচন্দ্র কলেজেই আমার জীবনের অনেকটা বাঁক এনে দিল। এখানে ভর্তি হওয়ার পর আমার মনে হল যে এখানে

ছাত্র ফেডারেশনের কোনো ইউনিট নেই। চারুচন্দ্র কলেজের ইউনিয়ন দখল করে কখনো কখনো পি.এস.ইউ। এর নেতা ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। পি.এস.ইউ. হল আর.এস.পি-র ছাত্র সংগঠন। আবার কখনো ইউনিয়ন দখল করে 'ডায়ানা'। আসলে এরা কোনো দলের নয়, যদিও কংগ্রেসি মনোভাবাপন্ন। ১৯৫৯-এ আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম যে আমরা নির্বাচনে দাঁড়াব। আমিই দাঁড়াই। সেই বছর চারুচন্দ্র কলেজে সমস্ত ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভদের মধ্যে আমি হায়েস্ট ভোটে জিতেছিলাম। কবি হিসেবে অল্পসল্প পরিচিতি হবার ফলে সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে পরস্পর বিরোধী দুটো গোষ্ঠীই আমাকে সমর্থন করে। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি চারুচন্দ্র কলেজের ইউনিয়নের সাহিত্য সম্পাদক হই। ১৯৬১-এ ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দেব। কিন্তু আমার এক বছরের বেতন বাকি। এই টাকা জোগাড় করা তখন আমার পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর, নীতিগতভাবে আমি ইউনিয়ন থেকেও কোনো টাকা নেব না, যেহেতু আমি সাহিত্য সম্পাদক। তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি পাঠাই। ১৯৬১-র ৬ জানুয়ারি সেই চিঠি ছাপা হয়। সেই ঠিক পড়ে দমদম নাগের বাজারের এক পান বিক্রেতা যুবক প্রথম পাঁচটাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন কলেজে এসে। ধানবাদ-ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিকেরা মানি অর্ডার করে কিছু টাকা পাঠান। আর এক মহিলার কথা আমি ভুলতে পারি না। তিনি হলেন ডা: মাধবচন্দ্র লাহিড়ির পত্নী। থাকতেন বেলেঘাটা জোড়ামন্দিরের কাছে। আমি তাঁকে মা বলে ডাকতাম। তিনি আমার দ্বিতীয় মা। তিনি শুধু একটা কথা বলেছিলেন-'তুমি যতদূর পড়বে তোমার পরীক্ষার ফীজ আমি দেব'। প্রত্যেক বছর অষ্টমীতে তাঁর বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন থাকত। এমনকি বিশেষ বিশেষ নেমন্তন্ন বাড়িতে তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়েও যেতেন। এইসময় মাঝে মাঝে আমি দুপুরে কলেজ কেটে একটি বাড়িতে টিউশন করতাম, মাইনে ছিল ১৪ টাকা। প্রাইভেট টিউশনি এবং ঠোঙা বানানো ছিল যেন আমার কবচকুণ্ডল। আই. এ. পরীক্ষা দিয়েই আমি একটি মোটরগাড়ি কারখানায় কাজে ঢুকে পড়লাম, কোম্পানির নাম ছিল ক্যালকাটা অটোমোবাইলস। রেজাল্ট বের হওয়ার পর বি.এ. তে ভর্তি হই। পরীক্ষা দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই একটি চাকরি পেলাম। শালিমার প্রোডাক্টসের ওয়ার্ক সরকার হিসেবে আমাকে চলে যেতে হয় রাঁচিতে। রাঁচি মেন রোডের উপরে রায় হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কুলি-কামিনদের সঙ্গে গালাগাল দিয়ে কথা বলতে হত বলে সেই কাজ আমার পোষায়নি। তাই, মাস দেড়েক বাদে সেই কাজ ছেড়ে আমি চলে আসি। এরপর সাউথ সাবার্বান মেন স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ পাই। মূলত আমি সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিতাম। বেশ কয়েক মাস শিক্ষকতার পর 'অমৃত' সাপ্তাহিকের সম্পাদক কবি

মণীন্দ্র রায়ের আহ্বানে 'অমৃতে' সাব এডিটর হিসাবে যোগ দিই। বললেন - 'তুমি এম.এ. পড়বে'। 'অমৃত'-এ আমি ১-টার সময় যেতাম, ৭-টার সময় 'অমৃত' বন্ধ হত। বুধবার 'অমৃত' বন্ধ থাকত। এই বুধবার ক'রে আমি ইউনিভার্সিটিতে যেতাম। যাই হোক মণীন্দ্র রায়ের সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে আমি এম. এ. পাস করি ১৯৬৫-তে ১৯৬৬-তে ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজে, ইভনিং-এ আমি পার্ট টাইম পড়ানোর সুযোগ পেলাম। সেখানে আমি রাতে পড়াতাম, দিনের বেলায় যেতাম 'অমৃত'-এ, সুযোগমতো টিউশনও করতাম। ১৯৬৯-এ আমি অস্থায়ীভাবে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পাই। পাকাপাকিভাবে অধ্যাপনার সুযোগ আসে ১৯৭০ থেকে।

প্রশ্ন:- আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাই।

কবি:- যখন আমি বি.এ. পড়ি সেই সময় এক বাড়িতে দুই বোনকে পড়াতাম। একজনের নাম ছিল বনানী। পড়াতে পণাতে তার প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মায়, তা আমি কবিতা লিখি। কিন্তু 'অমৃত' পত্রিকায় বনানীকে নিয়ে লেখা কবিতাটি বেরুনোর পর আমার টিউশনটা যায়। এই বনানীকে নিয়েই ১৯৬৪-তে আমার প্রথম কবিতার বই 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' বের হয়। বনানীকে নিয়ে কফি হাউসে বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হত। বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, কল্যাণ সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ প্রমুখ। বনানীকে নিয়ে দিলীপ মিত্র একটি গল্প লিখেছিলেন, যা বেরিয়েছিল 'বসুমতী'-তে।

প্রশ্ন:- ১৯৬৪-তে যখন কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয় তখন কি আপনি সি.পি.আই-তে ছিলেন, নাকি সি.পি.আই.এম-এ চলে গেলেন?

কবি:- আমি আগেই বলেছি ১৯৬১-তে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হই। পার্টি ভাগ হওয়ার পর আমি সি.পি.আই-তেই থাকি। আসলে আমি যে ব্রাঞ্চে ছিলাম, সেই ব্রাঞ্চের মানিক সেনের নেতৃত্বে সি.পি.আই-তে থেকে গিয়েছিল। তবে, কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ায় আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। ভেঙেও পড়েছিলাম। রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারতাম না। নিজেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। সেই সময় যেসব কমরেড আমার পাশে এসে দাঁড়ায় তাঁরা ছিলেন চীনা লাইনের বিরোধী, সোভিয়েত লাইনের পক্ষে। আমিও অভ্যাসবশত থেকে যাই সি.পি.আই-তে। কিন্তু আমি এখনো কমিউনিস্টদের মিলন আকাঙ্ক্ষা করি। সেখানে সি.পি.আই, সি.পি.আই.এম, সি.পি.আই.এম.এল, লিবারেশন গ্রুপ সকলকে নিয়ে আবার যদি সাচ্চা কমিউনিস্টরা একত্র হতে পারে তাহলে আমি সত্যিকারের শান্তি পাবো।

প্রশ্ন:- এখনো কি আপনি পার্টির সদস্য আছেন? যদি না হয় তাহলে কতদিন পর্যন্ত আপনি পার্টির সদস্য ছিলেন? আপনি কেন পার্টির সদস্যপদ নবীকরণ করালেন না?

কবি:- জার্মানি থেকে ফিরে আসার পরে, অর্থাৎ ১৯৭২-এর পর আমি সি.পি.আই-এর মেম্বারশিপ রিনিউ করিনি। পার্টির বিভাজন আমাকে রক্তাক্ত করে, এটা আগেই বলেছি। এছাড়া ১৯৭২-এর নির্বাচনে সি.পি.আই-এর ভূমিকা আমাকে ব্যথিত করে। মেনে নিতে পারিনি পার্টির কার্যকলাপ। কারণ এই প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে নেমেছিল সি.পি.আই। বরানগরে জ্যোতিবাবুর হেরে যাওয়া মেনে নিতে পারিনি। তার আগে অবশ্য প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনেক কাজ আমার ভালো লাগতো না। পার্টির মধ্যেও অকমিউনিস্ট-সুলভ মনোভাব লক্ষ্য করি। অন্যদিকে নকশাল আন্দোলন আমাকে নাড়া দিয়েছিল। যদিও তাদের কৃষকহত্যা, ব্যক্তিগত খুন এসব আমি পছন্দ করতাম না। তবু নকশালদের মধ্যে আমি কমিউনিস্ট-সুলভ অনেক আচরণ দেখতে পাই। কিন্তু নকশালপন্থী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কবিতার মাধ্যমে তাদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি। 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' কাব্যে তা দেখতে পাবে। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়ে বামফ্রন্ট। সি.পি.আই.এম-এর ভূমিকা সেই সময় তুলনামূলক ভাবে আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু, বছর দশেকের মধ্যেই সেই মুগ্ধতা ফিকে হতে শুরু হয়। দেখলাম স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, টাকার খেলা, পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন আঁতাত, শিক্ষার জগতে দলবাজি মাতব্বরি, সাহিত্য-সংস্কৃতির বাজারিকরণ। মনে প্রশ্ন জাগে, সরকারের নেতৃত্বে কি কমিউনিস্টরা আছে? তবে, আমি এখনো স্বপ্ন দেখি খাঁটি বামপন্থীরা একদিন ঐক্যবদ্ধ হবেন। গড়ে তুলবেন আধুনিক তাৎপর্যে সমাজ। যেখানে একদিন হয়তো মুছে যাবে শ্রেণি। ভরসা বামপন্থীদেরই উপর।

প্রশ্ন:- আপনি তো অমৃতবাজার-যুগান্তর-অমৃত পত্রিকার এমপ্লইজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। এই ইউনিয়ন কবে গঠিত হয়? কতদিন আপনি এই কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

কবি:- রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশে এই ইউনিয়ন গঠিত হয়। তখন 'অমৃত' পত্রিকার কর্মচারী খুব কম ছিল। তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই ঘোষিত বামপন্থী অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলাম। কবি মণীন্দ্র রায়ও ছিলেন বটে, কিন্তু চাকরির জন্যই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক তিনি সরাসরি আমাদের ইউনিয়নে আসেননি। ইউনিয়নের জন্য প্রথম যখন

রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তখন 'অমৃত' পত্রিকার কর্মী হিসেবে একমাত্র আমিই নাম দিয়েছিলাম। 'অমৃত বাজার', 'যুগান্তর', 'অমৃত'-র এমপ্লইজদের নিয়ে যখন তৈরি হল ইউনিয়ন তখন আমি প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক হই। সম্পাদক হয়েছিলেন একজন সত্যিকারের শ্রমিক। তিনি প্রেসের মধ্যে কাজ করতেন। আর 'যুগান্তর'-এর সাংবাদিক সুবোধ বসু, তিনিও সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইউনিয়নে আমার মোহভঙ্গ হয়। আমি স্পষ্ট বক্তা ছিলাম। একসময় বুঝতে পারলাম মালিক পক্ষ আমাকে কৌশলে ইউনিয়ন থেকে সরিয়ে দিতে চায় বা আমাকে কিনে নিতে চায়। এর জন্য তারা আমাকে দিল্লির অফিসে প্রমোশন দিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। আমি রাজি হই নি। প্রশ্ন জাগে আমি বিক্রি হয়ে যাব ভালো পোস্টের জন্য? বা একটু স্বচ্ছলতার জন্য? এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। তাই তখন থেকে আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করলাম 'অমৃত' পত্রিকা ছেড়ে দিতে। ১৯৭০-এ আমি 'অমৃত' ছেড়ে দিলাম এবং ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলাম।

প্রশ্ন:- আপনার বার্লিন যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

কবি:- একদিন মণীন্দ্র রায় আমাকে জিজ্ঞেস করেন - যদি জার্মানি যাওয়ার সুযোগ পাও, যাবে কি? আমি সম্মতি জানাই। তার পর একদিন কলকাতার ভাইস কনসাল (মি.ৎসিমার) আমাকে ডেকে পাঠিয়ে নানান কথা জিজ্ঞেস করেন। তখনও আমি সি.পি.আই-এর মেম্বার। আমি সব বললাম। এমনকি সি.পি.আই.এম-এর প্রতি আমার কী মনোভাব তাও পরিষ্কারই করলাম। বললাম আমি পার্টির বিভাগ মানি না। এর কিছুদিন পর উনি আমাকে চিঠি পাঠিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করতে বললেন। আমি পাসপোর্ট করলাম। ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে ভিসাও চলে এল। G.D.R.-এর জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, তাঁরা আমাকে চিঠি দিল আমার যাতায়াত থাকা, খাওয়া, হাতখরচ সবই তাঁরা দেবে। ওখানেই আমাকে থাকতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে। আমি চলে গেলাম। ডিপ্লোমা কোর্স করতে। বার্লিনে পৌঁছে আমি সুনীল দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি জার্মান নিবাসী দরদি কমরেড ছিলেন। ওখানে ট্রেনিং নিয়েছি। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা আমার কবিতাতেও এসেছে। আলফ্রেড ইয়াংকে ছিলেন বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিজম-এর একজন সহধর্মী শিক্ষক। তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন। আর, ইরিনা আউস্ত ছিলেন এক জার্মান তরুণী। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। আমাদের প্রায়ই দেখাশোনা হতো, গল্প করতাম। এঁদের কথা আমার কবিতাতে এসেছে।

প্রশ্ন:- বাংলা কবিতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসীরা প্রেমের কাব্য নয়, বরং সমকালীন এবং শ্লোগানধর্মী কবিতা রচনার পক্ষপাতী। অথচ আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল আদ্যন্ত প্রেমের কাব্য। এই ব্যতিক্রমী মনোভাবের কারণ কী?

কবি:- আমি সেই মুহূর্তে ব্যক্তিগতভাবে খানিকটা রক্তাক্ত ছিলাম। আগেই বলেছি আমি যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে ছিল আমার ছাত্রী। তাকে নিয়ে লেখা কবিতা 'অমৃত'-এ প্রকাশিত হলে আমাকে টিউশন থেকে ছাড়িয়ে দেয়। সুতরাং একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকেই আমি এই প্রথম কাব্যের কবিতাগুলি লিখেছিলাম। তরুণ সান্যাল খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যাও করেছিলেন, বলেছিলেন যে - অন্য কবিরা যখন প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয় তখন তাঁরা আর্তনাদ করেন, কিন্তু, গণেশের প্রেমের কবিতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে স্বদেশ, দেশপ্রেম। এজন্য নিছক প্রেমের কবিতা বোধহয় এটাকে বলা যায় না।

প্রশ্ন:- আপনার দ্বিতীয় কাব্যেও প্রেম আছে, তবে তা গৌণ। এই কাব্য থেকে সমকালীনতা প্রাধান্য পাচ্ছে। সমকালকে ফুটিয়ে তোলা, মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে তুলে ধরার এই দায়বদ্ধতা কি একজন ছিন্নমূল (এবং নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি) কবি হিসেবে নাকি একজন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে?

কবি:- কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং ছিন্নমূল কবি এই দুটো কিন্তু এক হয়ে যায়। কারণ, দেখবে, ওপার বাংলা থেকে যাঁরা এসেছিল তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কমিউনিস্টরাই। তাছাড়া কমিউনিস্টরাই তো ছিন্নমূল, নিম্নবিত্ত, সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। সুতরাং সমকালকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা কবিতায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ছিন্নমূল মানুষ এই দুটো সত্তাই কাজ করেছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন:- আপনার কবিতায় লক্ষ্য করা যায় আপনি ক্ষমতাসীন বামপন্থীদেরকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। এটা কি স্ববিরোধিতা নয়?

কবি:- না, স্ববিরোধিতা নয়। আমি আগেই বলেছি কমিউনিস্টদের বিভাজন মানতে পারিনি। এই বিভাজনের পেছনে যত না তত্ত্বের ব্যাপার ছিল তার থেকেও অনেক বেশি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ কাজ করেছে। বলে আমার মনে হয়েছিল ক্ষমতা দখলের ব্যাপারও ছিল হয়তো। আমার চোখ যদি খোলা না থাকত, আমার বিবেক যদি জাগ্রত না থাকত, তাহলে কমিউনিস্টদের যেকোনো একটি গ্রুপের সঙ্গে আমি থেকে যেতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। আমি সকলের

সমালোচনা করেছি। তবে সেই সমালোচনা নঞর্থক দিক থেকে নয়। আমি আসলে চেয়েছি আবার কমিউনিস্টরা এক হোক। বেনোজল সরিয়ে দিক। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে থেকেও যারা কমিউনিস্ট-বিরোধী কাজ করছে তাদের সরিয়ে দিক। আমি আসলে আদর্শ কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছি বলেই তথাকথিত বামপন্থীদেরও কটাক্ষ করতে ছাড়িনি। আমি নগণ্য একজন ব্যক্তি হয়েও যদি তাদের ভুলগুলোর সমালোচনা না করতাম তাহলে আমার দৃষ্টি একপেশে হতো। আমার এই নিরপেক্ষ দৃষ্টির কারণেই কোনো পার্টিই আমাকে নিজস্ব লোক বলে স্বীকৃতি দেয়নি। সি.পি.আই পরিচালিত পত্রিকাও আমার কবিতা ছাপা হয় না। তবে কমিউনিস্ট-বিরোধী কোনো পত্রিকাও যদি আমার কাছে লেখা চায় আমি কিন্তু লেখা দিই এবং দেব। তাই বলে আমার চেতনা বিকিয়ে নয়, কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে নয়। আমি প্লাটফর্মটিকে ব্যবহার করব নিজের আদর্শ অনুযায়ী। বিরোধীদের খুশি করার জন্য তাদের মন যুগিয়ে কথা বলব না। নিজের আদর্শে স্থির রাখতে আমাকে বামপন্থীদেরও সমালোচনা করতে হয়েছে। অকপট এবং তা ভালোবেসে । এছাড়া কমিউনিস্টরা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তা পূরণ করা তো দূরের কথা, অনেক বিষয়ে ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারেনি। এটাও ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টদের প্রতি কটাক্ষের অন্যতম কারণ হয়তো। আমি এক জায়গায় বলেছি - 'সে সময় অমৃতবাজার, যুগান্তর বা অমৃত পত্রিকায় যাঁরা সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কেউই বামপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ আমাদের সংগঠনের সদস্য হননি, মালিকদের রোষানলে পড়বার ভয়ে। পরে অবশ্য অনুকূল পরিবেশ পেয়ে, ফ্রন্ট সরকার এলে বামপন্থী বনে যান, তাঁরা নানাভাবে পুরস্কৃতও হন'। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অ্যান্টি-বাম যাঁরা তাঁরাই বেশি পুরস্কৃত হয়েছেন। এমনকি এর পেছনে টাকাপয়সার খেলা ছিল কি না জানিনা অথবা বাজারি পত্রিকা ও দু-একটি প্রকাশনা সংস্থার লবি ছিল কি না তাও বলতে পারবো না। এগুলো একেবারেই বুর্জোয়াসুলভ আচরণ, কমিউনিস্টসুলভ নয়। তাই সমালোচনা করেছি, কটাক্ষ করেছি।

প্রশ্ন:- আপনার 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭১। পরবর্তী দু'টি কাব্যগ্রন্থ 'বাঘের থাবার নিচে' ও 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৯৯। এই কাব্যগ্রন্থ দু'টি খুব বড়োও নয়। তাহলে এতটা ব্যবধানের কারণ কী?

কবি:- ১৯৭২-এর নির্বাচনের পর বামপন্থীদের প্রতি আমার বিশ্বাস খানিকটা টলে গিয়েছিল। বরানগরের ঘটনা আমাকে মর্মাহত করে। বামপন্থীদের আচরণও তখন আমার কাছে ভালো ঠেকছিল না। ফলে লেখার রসদ পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া

এই সময়টায় আমার খুব টাকাপয়সার অভাব হচ্ছিল। আমরা ঠিকমতো বেতন পাচ্ছিলাম না। ১৯৭৪-এ আমি বিয়ে করি। ১৯৭৫-এ আমার মেয়ে হয়। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অন্য ধরনের কাজও করতে হয়েছে। তখন আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার স্ক্রুটিনিয়ারের কাজ করতাম। পরে প্রধান পরীক্ষকও হই। শেষের দিকে আমার বন্ধু গল্পলেখক প্রলয় সেন টাকার বিনিময়ে একটি বই অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তখন আমি বলেছিলাম যে আমাকে টাকা দিতে হবে না, তার বদলে আমার একটা বই বের করে দিন। মডেল পাবলিশিং হাউসের সেই কাজটা আমি করেছিলাম, গোতিয়ের 'মাদমোয়াজেল দ্য মঁপা অনুবাদ করি, আর তার বিনিময়ে তাঁরা আমার 'বাঘের থাবার নিচে' প্রকাশ করে। 'নীরব সন্ত্রাস' বেরোনোর আগে আমি কলেজে খুব লাঞ্ছিত হতে থাকি। আমার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন সি.পি.আই.এম-এর সমর্থক। কিন্তু, আমার সঙ্গে সি.পি.আই-এর বন্ধুদের বেশি যোগাযোগ, তাই তিনি আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার শুরু করেন। এমনকি আমাকে শোকজ-ও করা হয়েছিল। তখন আমার অস্তিত্ব রক্ষাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ব্যক্তিগত ঝামেলায় জড়িয়ে আমি তখন লিখতে বিশেষ পারিনি। এই ঝামেলায় জড়িয়েই শ্বেত সন্ত্রাস, গৈরিক সন্ত্রাস, লাল সন্ত্রাসের অনুসরণে আমি নীরব সন্ত্রাস শব্দবন্ধটি ব্যবহার করি, সম্ভবত ১৯৯১-এ। এর আগে নীরব সন্ত্রাস শব্দটি কেউ ব্যবহার করেছিলেন কিনা জানি না।

প্রশ্ন:- আপনি বলেছেন আপনার কবিতায় হাংরি আন্দোলনের প্রভাব নেই। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? কেন এই আন্দোলন আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি?

কবি:- আমার মনে হয়েছিল এরা হাংরি আন্দোলনের নামে যে ক্ষুৎকাতরতা চালাচ্ছে সেটা প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়ে। সেই জন্য ওদের আমি এড়িয়েই যেতাম।

প্রশ্ন:- কবিতায় আপনি বার বার মিথ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। এটা কী কোনোভাবে অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে?

কবি:- কার্ল মার্কস তাঁর লেখাতে প্রচুর পরিমাণে মিথ ব্যবহার করতেন। তাঁর সমকালীন কবিদের কবিতার লাইনও ব্যবহার করতেন। শুধু সমকালীন নয়, নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে গ্যেটে, শেক্সপিয়ার, হাইনে সহ একাধিক কবি-সাহিত্যিকের লাইন ব্যবহার করেছেন। হয়তো সেই মার্কসের প্রভাব আমার মধ্যে পড়েছে। বিষ্ণু দে'র এই প্রবণতা ছিল। জীবনানন্দ দাশের শেষের দিকের অনেক

কবিতায় মিথ পাবে। পরবর্তীকালের কবি তরুণ সান্যালের অলোকরঞ্জনের কবিতাতেও মিথ এসেছে। তবে আমি মার্কসের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছি বলে মনে করি। আর রবীন্দ্রনাথ এখনো আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যের চন্দরা, রঘুপতি, মেহের আলি প্রভৃতি নামগুলি প্রসঙ্গক্রমে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে আমার কবিতায়।

এঙ্গেলস মিথ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন জার্মান দেশের উত্তরাংশের চুনখাঁড়ির পাথুরে গুহাপুঞ্জ নিয়ে। গ্রিকদেশের রৌদ্রঝলকিত তৃণভূমি বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেছিলেন। এঙ্গেলস লিখেছেন, এই প্রস্তর-কঠিন অন্ধকার গুহাগুলি স্বাভাবতই যেন মনে হবে দৈত্য-দানোর বাসস্থান। এ অঞ্চলের নানা লোকশ্রুতিই শুধু নয়, প্রেত ও অনৈসর্গিক আত্মা নিয়ে লোকমুখে সৃষ্ট রচনাসমূহ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ওই অঞ্চলটি জার্মান কুসংস্কারের অন্ধ ভিত্তিভূমি। ভালক্রাইদের বসবাস সেখানে। আবার, গ্রিসদেশের রৌদ্রোজ্জ্বল তৃণভূমি দেখে মনে হয় সেখানকার কুঞ্জবলে দেবদেবীরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। পরিবেশই দানব ও দেব চরিত্রের সৃজন ঘটায়। মার্কস ও এঙ্গেলস বহু বহুবার কল্পিত মানুষসৃষ্ট Demiurge নিয়ে কথা বলেছেন। এমনকি মার্কস তাঁর 'দাস কাপিতেল'-এ যে, ফেটিশ শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন সেটি তো লোকপুরাণ থেকেই নেওয়া। জার্মান মহাকাব্য ফাউস্ত যে লোকশ্রুত কল্পকাহিনির ওপর ভিত্তি করে রচিত সে তথ্য আমরা বলতে পারি, মার্কস-এর বহু চিন্তায় মিথ সৃজনশীল ভূমিকাই নিয়েছে।

প্রশ্ন:- অপাতত আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'বলগা হরিণের শিং'-এর শেষের দিকের পাঁচটি রচনার উপস্থাপনে চিহ্নের প্রবল প্রভুত্ব দেখিয়েছেন। এরকম নিদর্শন বাংলা কবিতায় দেখা যায়নি। এ কি নিছক চমক?

কবি:- না। চমক নয়, সচেতন প্রায়স। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হ'লে তার দায় পুরোপুরি আমার, অক্ষমতার। তবে, ঋদ্ধ পাঠকের সংবেদনে ভরসা রেখেই, শিরোনাম ও উপসংহারের মধ্যে সাঁকো গড়ার অপ্রথানুগ অভিপ্রায়ে যতিচিহ্ন সহ তিরমুখ, অন্ধকারের তীক্ষ্ণতা, বিশ্ববলয়বিকৃতি প্রতীকায়িত।

প্রশ্ন:- কখনো উপন্যাস বা ছোটোগল্প রচনার আগ্রহ জন্মায়নি?

কবি:- উপন্যাস লিখবার ক্ষমতা আমার আছে বলে মনে করি না। তবে দুটো ছোটোগল্প লিখেছিলাম। দুটো গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল - একটি 'অমৃত' পত্রিকায়, আর একটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ধ্বনি' পত্রিকায়। তবে গল্প দু'টো উতরেছে বলে আমি মনে করিনি। তাই, আর গল্প লিখিনি। আমি বরাবর কবিতা

লিখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি তবে, আশিটা বছর পেরিয়ে যাবার মুখেও নিজেকে এখনো মার্কসিস্ট ভাবতে ভালো লাগে। যদিও এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি এক স্বপ্নভঙ্গ স্বর। স্মৃতি-মেদুরতা আমারই পরম বৈরী।
কবি গণেশ বসুর জীবন ও জীবিকার কথা আমি' জীবনের আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে কবি গণেশ বসু' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত ধরার চেষ্টা করেছি। আর এই মুখোমুখি কথাবার্তায় জানতে ও বুঝতে চেয়েছি তাঁর জীবন-দর্শন গড়ে ওঠার রহস্যময় ইতিহাস। আশা করছি, কবিতা পাঠকের কাছে কবি গণেশ বসুর অনেক অজানা কথা এই ছোট্ট কথালাপে সুস্পষ্ট ও নিবিড় উষ্ণতায় পল্লবিত হয়েছে।

নিখিল চন্দ্র মাহাতো
গবেষক, বিনোদ বিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ।

কবি গণেশ বসুর জীবনপঞ্জি

১৯৪০: ডিসেম্বর ১, রবিবার, বিকেল চারটেয় (১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭) গণেশ বসুর জন্ম বরিশালের দেহেরগতি গ্রামে, মাতুলালয়ে। পিতা সুমন্তনাথ বসু মজুমদার, মাতা পারুলবালা। পিতামহ অন্নদাচরণ বসু মজুমদার, মাতামহ বিলাসচন্দ্র দত্ত। দোল পূর্ণিমার আগের দিন, পৈতৃক নিবাস চাঁদশির (গৌরনদী থানার অন্তর্গত) দারোগাবাড়িতে নবজাতকের প্রথম আগমন।

১৯৪৩: দেহেরগতির চন্ডীমন্ডপের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু। সরস্বতী পুজোর দিনে আচমকাই মেজোমামি হাতে খড়ি দিয়ে দেন।

১৯৪৬ : বরিশাল সদরে আসেন মাসতুতো দিদির বিয়ে উপলক্ষে সপরিবার। কয়েক মাস পরে সদর রোডের ওপর একটি ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন। সেখানেই থেকে যান।

১৯৪৮: আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে দাদা-দিদি ছোটো বোনের সঙ্গে থাকতেন। বাবা মাঝে মাঝেই জমিদারি দেখাশোনা করতে যেতেন চাঁদশিতে ও অধীনস্থ মহল্লায়। দেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকায় সপরিবার কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। জন্মভূমি থেকে এলেন নিরাপদ স্বদেশে। পদ্মপুকুরের কাছে পরিত্যক্ত মিলিটারি ক্যাম্পে জায়গা দিলেন শরণার্থী-সহায়ক স্বেচ্ছাসেবকেরা। 'দু' দিন পরেই ভবানীপুরের ৩বি কুণ্ডু লেনে ছোটো পিসির বাড়িতে উঠে আসেন। ৩১ আগস্ট শরণার্থী হিসাবে তাঁরা সরকারের কাছে থেকে রেজিস্ট্রেশনের শংসাপত্র লাভ করেন অর্থাৎ আইনানুগ উদবাস্তু। ১৯৪৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭মার্চ C.P.I.-র দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত। ব্যাপক ধরপাকড়। অগণন নেতা, কর্মী ভূতলবাসে চলে যান পরিচয় গোপন করে। ছাত্র ধর্মঘট, ট্রাম এবং বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট, অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারীদের ধর্মঘট।

১৯৪৯ : ভবানীপুরের শাঁখারিপাড়া ও কাঁসারিপাড়ার প্রায়-সংযোগস্থলে নাসিরুদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি ও প্রথাগত লেখাপড়া। ছাদে খেলতে গিয়ে ডান হাত ভাঙে। প্রথমে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে, পরে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা। সেই প্রথম ট্রামে চড়াও। ২৭ এপ্রিল বন্দিমুক্তির দাবিতে কলকাতার রাজপথে পুলিশের গুলিতে লতিকা সেন, অমিয়া দত্ত, প্রতিভা গাঙ্গুলি, গীতা সরকার করেন শহিদের মৃত্যুবরণ। নভেম্বরে মাও জে-দং-এর তারবার্তা: 'ভারত ও চিন একই মুক্তিপথের যাত্রী'।

১৯৫০ : আসামে বিধ্বংসী ভূমিকম্প। নভেম্বর মাসে কুণ্ডু লেনের আশ্রয় ত্যাগ এবং ৯৬ টালিগঞ্জ রোডের অস্বাস্থ্যকর বাড়িতে অনেক ভাড়াটের সঙ্গে ছোট্ট খুপরিতে বসবাস।

১৯৫১ : ফেব্রুয়ারিতে আবার আশ্রয় বদল। ২বি চন্দ্রমণ্ডল লেনের একটি দোকানঘর হয়ে ওঠে বাসস্থান। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি। সরকার প্রদত্ত রিফিউজি স্টাইপেন্ডে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৭) পর্যন্ত লেখাপড়া। এই সময়েই চরম দারিদ্রের শিকার। পিতা শয্যাশায়ী। গণেশ বসুর মা একটি প্লাসটিক কারখানায় দৈনিক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন। কখনো কখনো অন্যের বাড়িতে রাঁধুনিরও কাজ করেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে গণেশ খবরের কাগজ কিনে ঠোঙা বানিয়ে দোকানে দোকানে সরবরাহ করতেন। ওঁর দাদাও চানাচুর সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন পড়াশোনা চালিয়েই। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থী অম্বিকা চক্রবর্তী ও সাধন গুপ্তের সমর্থনে বালকবাহিনীর প্রচার মিছিলে প্রথম অংশগ্রহণ করেন গণেশ বসু। দেশপ্রিয় পার্কে অরুণা আসফ আলির ভাষণ শুনে হন উদ্দীপিত। সময় সুযোগ হলে আদি গঙ্গায় নিয়মিত সাঁতার কাটা চলতো। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে ছোটো শিশু-বোন মুড়ি চিবোতে চিবোতে কবির কোলেই মৃত্যুতে ঢলে পড়ে।

১৯৫২ : জানুয়ারিতে আবার বাসা বদল। ৩৭ গোবিন্দ ব্যানার্জি লেনে, মেজো পিসির ভাড়া বাড়ির বারান্দাই হয়ে ওঠে সেই বাসা। হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাতায়াত। সন্ধেয় নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ। নাট্যকার অনিল দে-র সঙ্গে বন্ধুতা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীদের টিউশনি করা। বিধানসভার নির্বাচনে অম্বিকা চক্রবর্তীর জয়ে উল্লাস।

১৯৫৩ : স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম নিবন্ধ প্রকাশ। টালিগঞ্জের কে.পি.রায় লেন ও গোবিন্দ ব্যানার্জি লেনের মিলন-মোড়ে 'পথের বাণী' নামে বহুবর্ণময় চিত্রশোভিত দেয়াল পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'মৃত্যু' প্রকাশিত। প্রতিদিন বিকেলে হা-ডু-ডু খেলা। সন্ধেয় টিউশনি করা। গোয়া মুক্তি আন্দোলনের মিছিলে, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনে, জুলাই-র সাধারণ ধর্মঘটে বালক-কবির অংশগ্রহণ। ৯ মার্চ স্তালিনের জীবনাবসানের সংবাদে শোকে মুহ্যমান। আবার, শ্যামাপ্রসাদের শোকমিছিলেও খানিকটা পথ হাঁটা। পাশাপাশি ময়দানে দেয়া ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হ্যারি পলিটের ভাষণ নিয়ে বড়োদের আলোচনা শোনা।

১৯৫৪ : স্কুলের ইন্টার ক্লাস ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ। নাট্যাভিনয়েও অংশ নেওয়া শুরু। অনিল দে-র উৎসাহে প্রথম অভিনয়—শিবরাম চক্রবর্তীর 'পণ্ডিত বিদায়' নাটকে জংলি চরিত্রে।

এর পর নানা সময়ে পাড়ায় পাড়ায় অভিনয়— সুইস পার্কে, রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে, চারুচন্দ্র কলেজে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে, মুক্তাঙ্গন মঞ্চে কম করেও তিরিশ-চল্লিশবার অভিনয় করেন। জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' থেকে বিধায়ক ভট্টাচার্যের জাগোরে ধীরে,'তাসের দেশ', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'শাস্তি' (নাট্যরূপ), 'তোতাকাহিনী' (নাট্যরূপ) সহ 'ছত্রপতি শিবাজী' যাত্রা পালার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৫৫ : বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের ভারত সফর। ব্রিগ্রেড ময়দানে ঐতিহাসিক সভা। সমাবেশে যোগদান।

১৯৫৭ : এপ্রিলে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ও উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে সক্রিয়

থেকে অংশগ্রহণ। টালিগঞ্জের চারুমার্কেটের পাশে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে

১৯৬০ যাতায়াত শুরু। মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'যুগ ও জীবন' পত্রিকায় কবিতা ছাপা।

মাসে মাসে ৪০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবে বলে কলেজে ভর্তি না হয়ে ভারত সরকারের লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট দপ্তরের অধীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টালিগঞ্জ)-এ সিভিল

ড্রাফটসম্যানশিপে ট্রেনিং নেয়া শুরু। ট্রেনিং পিরিয়ড ছিলো ১৯৫৭-র অক্টোবর থেকে ১৯৫৯-এর জানুয়ারি। এই সময়েও গৃহশিক্ষকতা তিনি বন্ধ করেননি।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পরেই বাঁশদ্রোণীতে আসেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত প্লটে, নির্মিত টিনের চালায় ক্যাচার ঘরে মা-বাবা-ভাইবোনের সঙ্গে। প্রথমে ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজের নৈশ বিভাগে, বিজ্ঞান নিয়ে। পরে বদল করেন কলেজ। ভর্তি হন চারুচন্দ্র কলেজে, স্পেশাল বাংলা নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট আর্টসে। এই কলেজে সেই সময়ে বি.পি. এস.এফের কোনো ইউনিট ছিলো না। পি. এস. ইউ (আর.এস.পি-র ছাত্র শাখা) এবং ডায়ানা (বাম বিরোধী পাঁচ মিশেলি ছাত্র সংগঠন, যেটি অধ্যক্ষের স্নেহধন্য, কংগ্রেস ও পি. এস. পি প্রভাবিত) ছিলো। আশুতোষ কলেজে তখন টক্কর দিতো ড়ি.এস. ও (এস.ইউ.সি-র ছাত্র শাখা) এবং ছাত্র ফেডারেশন (সি.পি.আই-র ছাত্রশাখা)। চারুচন্দ্রের ব্যাপারটা ছিলো বি.পি. এস.এফের কাছে উপেক্ষিত। এটা ভালো না লাগায় পারিবারিক সূত্রে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন সহপাঠী, বাঁশদ্রোণীর তরুণ গুহঠাকুরতার সঙ্গে অনেক শলাপরামর্শ করে নৈশ বিভাগের তুলনামূলকভাবে বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গোপনে খোঁজ চালান কমিউনিস্ট মানসিকতার কেউ কেউ আছেন কি না। মিললো তাঁদের ভিতর কয়েক জনকে। একজন ছিলেন চিনের স্যানাটোরিয়ামে কয়েক বছর কাটানো নূপুর সেন। গোপনে মিলিত হয়ে তাঁরা ঠিক করেন কলেজের ইউনিয়ন দখলে আসন্ন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি নির্বাচনে লড়বেন। নৈশ বিভাগ থেকে দুজন, আর দিবা বিভাগ থেকে গণেশ বসু। এরই মধ্যে ঘটানো হয় কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের পতন। আরেক মর্মান্তিক ঘটনা হলো ১৯৫৯-এর ৩১ আগস্ট। খাদ্যের দাবিতে গ্রাম থেকে আসা নিরন্ন কৃষক ও খেতমজুরদের যে বিশাল সমাবেশ ঘটে ময়দানে তার ওপর বিনা হুঁশিয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী ঘোড়সওয়ার পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে তাণ্ডব শুরু করে। ফাটাতে থাকে কাঁদানে গ্যাসের সেল, চলতে থাকে বেধড়ক লাঠিচার্জ, ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বেপরোয়া আচরণ, বর্বরতার সে এক ঘৃণ্যতম উদাহরণ। শহিদ হন কম করেও আশি জন। এই নৃশংসতার প্রতিবাদে গর্জে উঠলো বাংলার ছাত্রসমাজ। পরের দিনই, ১ সেপ্টেম্বর আহূত হয় সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট। কেন্দ্রীয় সমাবেশও ঘটে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে। সমাবেশ থেকে বেরোয় ঐতিহাসিক মিছিল। সেই মিছিলে নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, গুরুদাস দাশগুপ্ত, পল্টু দাশগুপ্ত, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না চক্রবর্তী, বিমান বসু, শঙ্কর গুপ্ত, প্রণব মুখোপাধ্যায়, পার্থ সেনগুপ্ত, বনদেব মুখোপাধ্যায়, কমলেন্দু গাঙ্গুলি, ভবেশ গাঙ্গুলি সহ প্রায় সমস্ত বাম ছাত্র নেতা নেত্রীই ছিলেন। সেই মিছিল বৌবাজার ক্রশিং পেরোতে- না-পেরোতেই হিংস্র নেকড়ের মতো পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হলো কাঁদানে গ্যাস, চললো বেপরোয়া লাঠিচার্জ। সেই মিছিলে চারুচন্দ্র কলেজের ছাত্র, উনিশ বছর বয়সী গণেশ বসুও ছিলেন কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর মতো। হিন্দ সিনেমার সামনে তিনিও পড়লেন লাঠিচার্জের কবলে। তাঁর বাঁদিকের উরু ও নিতম্বে পড়লো পর পর সজোরে লাঠি। লুটিয়ে পড়লেন রাজপথে। জ্ঞান হারান। সঙ্গে সঙ্গে ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিকেল কলেজে আরো অনেক আহত, রক্তাক্ত অংশগ্রহণকারীদের মতো। প্রাথমিক চিকিৎসা চলে। জ্ঞান ফেরে। একটু সুস্থ হতে তাঁকে বাঁশদ্রোণীর বাড়ি পৌঁছে দেন তাঁরই সহপাঠী তরুণ গুহঠাকুরতা।

কলেজের ছাত্রসংসদের শ্রেণি-প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনি ও তাঁর সহপাঠিনী কৃষ্ণা চন্দ্র দাঁড়ালেন। বিপুল ভোটে পি.এস.ইউ এবং ডায়ানার প্রার্থীদের হারিয়ে দেন। পরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণেশ বসু ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক হন।

১৯৬১ : আই.এ. ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আবার বিপদে পড়লেন। কলেজের ফি বকেয়া। তা মেটাতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। অধ্যক্ষের কাছে বেতন মকুবের আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলেন। ছাত্র সংসদের সাহায্য চাইলেন না নীতিগত কারণে। তা হলে টাকা আসবে কোত্থেকে? নিরুপায় হয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি পাঠালেন—সাহায্যের আবেদন, অর্থ না জুটলে পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ। চিঠিটি বেরোয় ৬ জানুয়ারি। প্রযত্নে উপাধ্যক্ষের কথা ছাপা হয়। চিঠিটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বেলা দশটা নাগাদ দমদম নাগেরবাজারের একজন পান-বিক্রেতা যুবক কলেজে এসে হাজির হন এবং পাঁচ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। দুপুর নাগাদ ব্যক্তিগত গাড়িতে চেপে কলেজে এলেন এক তন্বী সহ বর্ষীয়সী মহিলা—বেলেঘাটার ডাক্তার এম.সি.লাহিড়ির পত্নী ও কন্যা। উপাধ্যক্ষ ড. ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরির

সঙ্গে কথা বলে গণেশ বসুর খোঁজ করলেন। তিনি যাবতীয় ফি দিয়ে সাহায্য করলেন, উপরন্তু দুধ খাবার জন্য দেন চল্লিশ টাকা। সাহায্য করলেন পার্ক সার্কাস এলাকার কয়েকজন অল্প বয়সী ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের হাতখরচের টাকা দিয়ে। মানিঅর্ডার করে উপাধ্যক্ষের প্রযত্নে শ-খানেক টাকা পাঠালেন ধানবাদের কয়লাখনির কয়েকজন শ্রমিক চাঁদা তুলে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মকুব করেন তাঁদের প্রাপ্য ফি-র অর্ধেক। অনেক বাড়তি অর্থ চলে আসায় সেই টাকা গণেশের অনুরোধে উপাধ্যক্ষই বিতরণ করে দিলেন কলেজের গরিব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে।

এ বছরেই বাড়িতে গিয়ে পড়ানো শুরু করেন বনানী ও তার বোনকে। এ বছরেই লাভ করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ। ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে গিয়ে কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে পরিচয়, প্রণাম ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এ বছরেই আই.এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই ক্যালকাটা অটোমোবাইলস নামে এক মোটরগাড়ি সারাইয়ের কারখানায় শ্রমিক হিসাবে সাময়িকভাবে কাজ শুরু করেন। বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ.পড়া শুরু।

১৯৬২ : তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট সহ বামেদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। আবার, ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে বিপুল বিতর্ক। অবিশ্বাসের বাতাবরণ। কমরেডে কমরেডে সন্দেহ। খাড়াখাড়ি দুটো শিবির। মধ্যিখানে কয়েকজনের দোদুল্যমানতা। দ্বন্দ্বে দীর্ণ সি.পি.আই-র সত্তা। বেছে বেছে নেতা কর্মী গ্রেপ্তার চিনাপ্রেমিক সন্দেহে। পুলিশের দাপট মাত্রা ছাড়া। সন্দেহের শিকার হলেন স্নাতক শ্রেণির ছাত্র গণেশ বসুর মতো একজন গৃহশিক্ষকও। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ 'পিকিং রিভিউ'র একটি নিষিদ্ধ সংখ্যা রাখা। যাদবপুর থানায় যেতে বাধ্য করা হলো তাঁকে তিনি গেলেন। কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এমন সময়ে ঐ থানারই সেকেণ্ড অফিসার অদ্বৈতগোপাল বসু সেখানে প্রবেশ করতেই জল আর গড়ালো না। লেখালিখি সইসাবুদ কিছু হল না। বরং চা জুটলো ভাঁড়ে। আসলে, সেকেন্ড অফিসারের ছেলে আশিসকে এক সময়ে থানার কোয়ার্টারে গিয়েই পড়াতেন গণেশ।

১৯৬৩ : 'অমৃত' পত্রিকায় বনানীকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা বেরোনোর কিছুদিন পরেই টিউশনিটি খতম হয়। ধীরে ধীরে বনানীও স্মৃতি হয়ে

যায়। খরায় পুড়তে থাকে 'আকুল আর্তি'— 'আমরণ যে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'। বি.এ. পরীক্ষা শেষ হতেই গণেশ বসু চলে যান রাঁচিতে। শালিমার টার প্রোডাক্ট্সের কর্মী হিসাবে। সেখানে গণেশ বসুর কাজটা ছিলো ওয়ার্ক সরকারেব। থাকতেন রাঁচি মেন রোডের ওপর রায় হোটেলে। কিন্তু মাসদেড়েক বাদেই সেই চাকিরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই একটা নতুন সুযোগ এলো। সাউথ সাবার্বান (মেন) স্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন।

কয়েক মাস যেতে না যেতেই কবি মণীন্দ্র রায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সাব-এডিটর হিসাবে যোগ দেন সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বর। পাশাপাশি ভর্তি হয়ে যান বাংলা নিয়ে এম.এ. পড়তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাস করতেন প্রতি বুধবারে।

১৯৬৪ : কলকাতার বাইরে অমন্ত্রিত হয়ে প্রথম কবি সম্মেলন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। সেই কবিসম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করেন দেবব্রত বিশ্বাস। দ্বিতীয় কবিসম্মেলনে যোগ দেন জিয়াগঞ্জের শ্রীপৎ সিং কলেজে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তবে এ বছরের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তা শুরু হতেই মহম্মদ আতর আলি দপ্তরি নামে এর কিশোরকে গণেশ বসু বাঁচান নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। মুসলমান কিশোরটি ছিলেন তাঁর ছাত্র। নিকট পড়শি। কয়েক পুরুষ ধরেই তাঁরা বাঁশদ্রোণীর বাসিন্দা। বাবা মারা যান, ছোটো ভাই গোলাপেরও ইন্তেকাল হয়। দিদি মর্জিনার বিয়ে হলে বিধবা মা চলে যান মেয়ে জামাইয়ের কাছে টালিগঞ্জে। আতর একা থাকতেন বাঁশদ্রোণীতেই নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে। দাঙ্গা শুরু হতেই বাঁশদ্রোণীর কয়েকজন যুবক ফন্দি আঁটেন আতরকে জ্যান্ত পোড়াবেন রাতে। সেই পরিকল্পনার ছক গণেশের কানে পৌঁছোয়। তিনি কালবিলম্ব না করে সন্ধে হতেই আতরকে গোপনে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। নিজের সঙ্গেই তাঁকে নিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করেন। অবশেষে মাঝ রাতে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে কিশোরটিকে নিয়ে পালিয়ে যান দাঙ্গাবাজদের নজর এড়িয়ে। হাঁটতে হাঁটতে তাঁকে পৌঁছে দেন আনোয়ার শা রোডের মসজিদ লাগোয়া মুসলিম পট্টিতে, তাঁর মা-দিদি-জামাইবাবুর কাছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ভোর হতে না হতেই। গণেশের কাছেও সে খবর পৌঁছে যায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন,

উত্তেজনার মধ্যে বাড়ি ফিরবেন না। বরং চলে যান বন্ধুর বাড়িতে। উত্তেজনা একটু থিতু হলে তিন দিন পরে বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে চলে আসেন। এ বছরের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা হলো সরকারি ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম। এ বছরেই প্রকাশিত হয় গণেশ বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'।

১৯৬৫ : পাক-ভারত যুদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে ভিয়েতনাম সংহতি দিবস পালন। কলকাতায় বাঙালি-পাঞ্জাবি সংঘর্ষ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেন এম.এম.পাশ।

১৯৬৬ : পশ্চিম বাংলায় খাদ্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। পুলিশি তাণ্ডব দিকে দিকে। এই প্রেক্ষাপটেই গণেশ বসু-র অবিস্মরণীয় কবিতা 'সমুদ্রমহিষ' রচনা।
'অমৃতে'র পাশাপাশি ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজ (নৈশ)-এ আংশিক সময়ের অধ্যাপনা শুরু।

১৯৬৭ : এ রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন। কিন্তু কয়েক মাসও সেই সরকারকে টিকতে দেওয়া হলো না। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে গণেশ বসু গ্রেপ্তার হলেন। কয়েক ঘন্টা পরেই অবশ্য মুক্তি।
নকশালবাড়ির তরাই অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা।
'নিজের মুখোমুখি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। অধ্যাপক সমিতির WBCUTA-র সদস্যপদ লাভ।

১৯৬৮ : সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে (১২-১৪ এপ্রিল) যোগদান। কলকাতার মেয়র দেন কবিদের নাগরিক সম্বর্ধনা। উর্দু কবি মখদুম মহিউদ্দিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

১৯৬৯ : পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত। গণেশ বসুর 'সমুদ্রমহিষ' কবিতা পুস্তক প্রকাশ, পাশাপাশি বেরোয় 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' কাব্যগ্রন্থ। ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজ ছেড়ে দিয়ে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে খণ্ডকালীন অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। কবি তরুণ সান্যালের সঙ্গে 'লেনিনের যুগ' কাব্যসংকলন সম্পাদনা। 'অমৃতবাজার যুগান্তর অমৃত এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং হন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। শ্রমিক নেতা কে.জি. বসু হন সেই ইউনিয়নের সভাপতি।

১৯৭০ : পশ্চিম বাংলায় আবার রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ। আবার আইন অমান্য আন্দোলন। আবার গণেশ বসু গ্রেফতার এবং কয়েক ঘন্টা পরেই মুক্তি। 'অমৃত' থেকে সরকারিভাবে অব্যাহতি এবং ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পাকাপাকি অধ্যাপনা। 'লেনিন : অধিকার, রক্তের কবিতার' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। তরুণ সান্যালের সঙ্গে 'সীমান্ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৭১ : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা। এমনকি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়ক সমিতির তরফে প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার হরিদাস মিত্রের সহযাত্রী হয়ে কাঁথিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভাষণ।

১৯৭২ : 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। কলেজ থেকে বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজমে সাংবাদিকতার ট্রেনিং নিতে জার্মানিতে (সে সময়ের জি ডি আর) যান আমন্ত্রিত হয়ে। একই কোর্সে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের তরুণ সাংবাদিক শেখর ভাটিয়া। দেশে ফিরে 'সমাজতান্ত্রিক জার্মানিতে' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে 'কালান্তর' সাপ্তাহিকে লেখেন সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা। সেই রচনায় একবার সাংসদ হীরেন মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ-ও ছিলো। তা পড়ে ১২ ডিসেম্বর দিল্লি থেকে চিঠি লিখে প্রখ্যাত বাগ্মী ও ঐতিহাসিক এই অধ্যাপক কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি গণেশ বসু-কে। ভ্রমণ করেন বেইরুট, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, তাশখন্দ সহ জিডি আরের নানা শহর-বন্দর-গ্রাম। এই সময়েই হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে কৃষিবিজ্ঞানে গবেষণারত জার্মান তরুণী ইরিনা অউস্তের সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে তা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

১৯৭৩ : আবার বার্লিনে যান IIJB-র আমন্ত্রণে পুরস্কার সহ আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে। থাকেন এক মাস।
পিতার অসুস্থতা। এস এস কে এমে চিকিৎসা চলে।

১৯৭৪ : পিতার আরোগ্য লাভ। এই বছরেই অধ্যাপকদের বিক্ষোভ সমাবেশে বসে লেখেন 'অধ্যাপক' কবিতা, যেটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৮ জানুয়ারি প্রয়াত রমেশচন্দ্র গুহ ও ইন্দুমতী গুহের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা তৃপ্তির সঙ্গে বিবাহ।

১৯৭৫ : প্রথম সন্তান কনীনিকার জন্ম ১৮ জানুয়ারি।

১৯৭৮ : শেষ সন্তান কৌস্তুভ জন্মগ্রহণ করেন ২৫ অক্টোবর।

১৯৮২ : 'বাঘের থাবার নিচে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। একই সময়ে মডেল পাবলিশিং হাউস থেকে বেরোয় তেওফিল গোতিয়ে-র 'মাদমোয়াজেল দ্য মপ্যাঁ' উপন্যাসের ভাষান্তর।

১৯৮৩ : গণতান্ত্রিক জার্মানিতে আবার আমন্ত্রিত হয়ে ফের যান এবং দেড় মাসের বেশি থাকেন।

২০০১ : বিভাগীয় প্রধান থাকাকালীন কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : বনানীকে কবিতা গুচ্ছ (১৯৬৪); নিজের মুখোমুখি (১৯৬৭); রক্তের ভিতরে রৌদ্র (১৯৬৯); সমুদ্রমহিষ (১৯৬৯); লেনিন: অধিকার, রক্তের কবিতার (১৯৭০); অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাঙলাদেশ (১৯৭১); বাঘের থাবার নিচে (১৯৮২); নীরব সন্ত্রাস (১৯৯৯); কবিতা সমগ্র (২০০২); অন্ন অশ্রু ভায়োলিন (২০০৫); ভাসানদরিয়া (২০০৮); ভাঙা বইঠার গান (২০১১); বর্ণময় পৃথিবী (২০১৩); বল্‌গা হরিণের শিং (২০১৫); গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ (২০২০; সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মণ্ডল)।

প্রবন্ধ গ্রন্থ : নরকরোটিতে প্রজাপতি (২০১১। এটি 'ইতিহাসচেতনা ও কালচেতনা', 'কবিতাও সময়ের অঙ্গার'; 'বীরাঙ্গনা ও মধুসূদন'; 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশু'; 'শিশু সাহিত্যে নজরুল'; 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'বিষ্ণু দে-র কবিতায় মিথ'; 'জল দাও আমার শিকড়ে'; 'চিত্ত ঘোষের কবিতা'; 'বল্‌গায় রাবণরৌদ্র'; 'মিথ ও বাংলা কবিতা'; 'কালশুদ্ধ বাংলা কবিতা'; 'উত্তর-উপনিবেশিকতার ষাট'; 'নরকরোটিতে প্রজাপতি'— ১৪টি প্রবন্ধের সংকলন)।

সাংবাদিকতায় কার্ল মার্কস (২০২০)।

ছদ্মনাম : বীথি বসু; সিদ্ধার্থ; বাসুগণেশন।

খণ্ড কালের শিক্ষকতা : ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজ (নৈশ) (১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯)।

কলকাতার 'পাঠভবন' (উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় ৩০ বছর)। কলকাতার 'নব-নালন্দা' (উচ্চ মাধ্যমিকে ১৬ বছর)।

কলেজ-পরিচালন সমিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারের প্রতিনিধি : চম্পাহাটি সুশীল কর কলেজে (৮ বছর); পাঠানখালি হাজি দেশারৎ কলেজে (৮ বছর); বঙ্গবাসী কলেজে (৮ বছর); নিউ আলিপুর কলেজে (৮ বছর)।

শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথে ৪ বছর।

পাঠক্রম রচনায়: ন্যাশনাল ওপেন স্কুল (দিল্লি); রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্‌স্নাতক পাঠপর্ষৎ।

পরীক্ষা সংক্রান্ত : পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ,

রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্টাডিমেটিরিয়াল তৈরি করে দেওয়া : ন্যাশনাল ওপেন স্কুল (দিল্লি) রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ); নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি, কলকাতা।

শিক্ষক-সংগঠনে : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য (১৯৬৭ থেকে ২০০২; তার পর আজীবন সদস্য)। কার্যকরী সমিতির সদস্য, পরে যুগ্ম সম্পাদক (১৯৯৮ থেকে ২০০২)। সমিতির নেতৃত্বে গঠিত সব ধরনের, মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট-অধিবেশন-অবস্থান বিক্ষোভে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। ওড়িশার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যেমন সমিতির সাহায্য নিয়ে গিয়েছেন, তেমনি মুর্শিদাবাদেও। AIFUCTO-রও আজীবন সদস্য।

পাঠ্যগ্রন্থ : ভাষাসঙ্গী (ব্যাকরণ ও নির্মিতি ষষ্ঠ শ্রেণির)

ভাষাসঙ্গী (ব্যাকরণ ও নির্মিতি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির)

মাধ্যমিক ভাষা-সন্ধান (ভাষাবিদ পবিত্র সরকারের সঙ্গে)

ভাষা-সরিৎসাগর (উচ্চ মাধ্যমিকের। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের সঙ্গে)।

পুরস্কার : জার্মানি থেকে VDJ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি।

মঙ্গলাচরণ স্মৃতি পুরস্কার লাভ। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থ : মাধ্যমিক বাংলা। একাদশ বাংলা। দ্বাদশ বাংলা।

অনূদিত উপন্যাস: মাদমোয়াজেল দ্য মপ্যাঁ (তেওফিল গোতিয়ে)।

জয়গোপাল মণ্ডল

গণেশ বসুর গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ'— প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০। 'কবিপত্র' প্রকাশ ভবনের পক্ষে বইটি প্রকাশ করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা। দাম : দু'টাকা।

২। 'নিজের মুখোমুখি'— প্রথম সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪ (১৯৬৭)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০। মৃণাল দেবের সৌজন্যে 'বীক্ষণ প্রকাশ ভবনের পক্ষে প্রকাশ করেন নিতাই ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। দাম : তিন টাকা। 'সমুদ্র মহিষ' কাব্যগ্রন্থ শিরোনামে একটি ছোট গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৬৯)

৩। 'রক্তের ভিতর রৌদ্র'— প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮। অনুভব প্রকাশনীর পক্ষে বইটি প্রকাশ করেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা। দাম : দু'টাকা।

৪। 'অধিকার রক্তের কবিতার'— প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৯৭০। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে প্রকাশ করেন দীপেন রায়। প্রচ্ছদ নিতাই ঘোষের। অলংকরণ ধ্রুব রায়ের। দাম : দু'টাকা।

৫। 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ'— প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৭১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে প্রকাশ করেন দীপেন রায়। প্রচ্ছদ শিল্পী— নিতাই ঘোষ। দাম : তিন টাকা।

৬। 'বাঘের থাবার নিচে'— প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৯৮২। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। মডেল পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশ করেন জয়দেব ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। দাম : চার টাকা।

৭। 'নীরব সন্ত্রাস'— প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮০। শঙ্খ পুস্তক প্রকাশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন শঙ্খনীল দাস। প্রচ্ছদ শিল্পী : নিতাই ঘোষ। দাম : তিরিশ টাকা।

৮। গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১'— প্রথম সংস্করণ, ২০০২। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮৮। বসুধারা প্রকাশনার পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন কৌস্তুভ বসু। প্রচ্ছদ শিল্পী কৌস্তুভ বসু। দাম : সত্তর টাকা।

৯। 'অনু অশ্রু ভায়োলিন'- প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬। বসুধারা প্রকাশনার পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন কৌস্তুভ বসু। প্রচ্ছদ শিল্পী মানিক পাত্র। দাম : পঞ্চাশ টাকা।

১০। 'ভাসান দরিয়া' প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। বসুধারা-র পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন কৌস্তুভ বসু। প্রচ্ছদ শিল্পী কৌস্তুভ বসু। দাম : সত্তর টাকা।

১১। 'ভাঙা বইঠার গান'— প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। মনন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। দাম : আশি টাকা।

১২। 'নরকরোটিতে প্রজাপতি'— প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১১। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৪। মনন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : কৌস্তুভ বসু। দাম : দুশো টাকা।

১৩। 'বর্ণময় পৃথিবী'- প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৩। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬, মনন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : বাসু গণেশন। দাম : একশো পঞ্চাশ টাকা।

১৪। 'বলগা হরিণের শিং''- এবম সংকমণ, মার্চ ২০১৫ পৃষ্ঠা) ১৬০। কবিতা সীমান্ত থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী : বাসু গণেশন। দাম : দুশো টাকা।

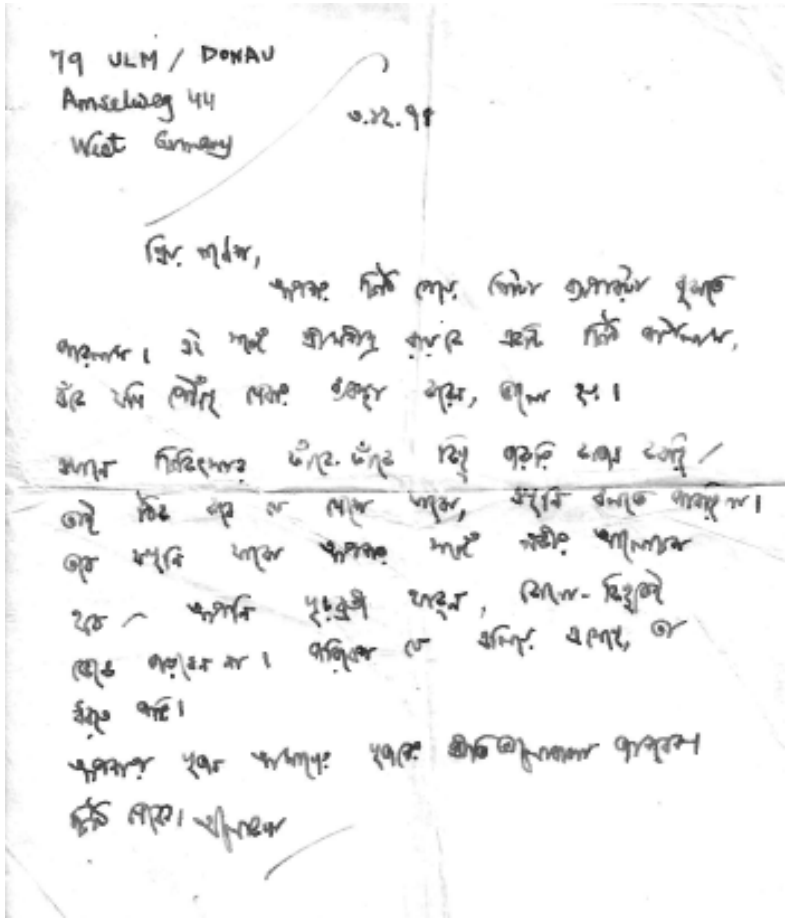

79 ULM / DONAU
Amselweg 44
West Germany

৩.১২.৭৮

প্রিয় গণেশ,

[illegible]

চিঠি দিও। দীপঙ্কর

পরিচয়
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

সুজন,

১ ও ২ মে : স্টুডেন্টস হল-এ পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সম্মেলন। আমরা যে বিশেষ সাড়া চেয়েছি সম্মেলনের উদ্বোধন।

তোমাকে প্রস্তুতি কমিটির আমন্ত্রণপত্র ও খসড়া সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি।

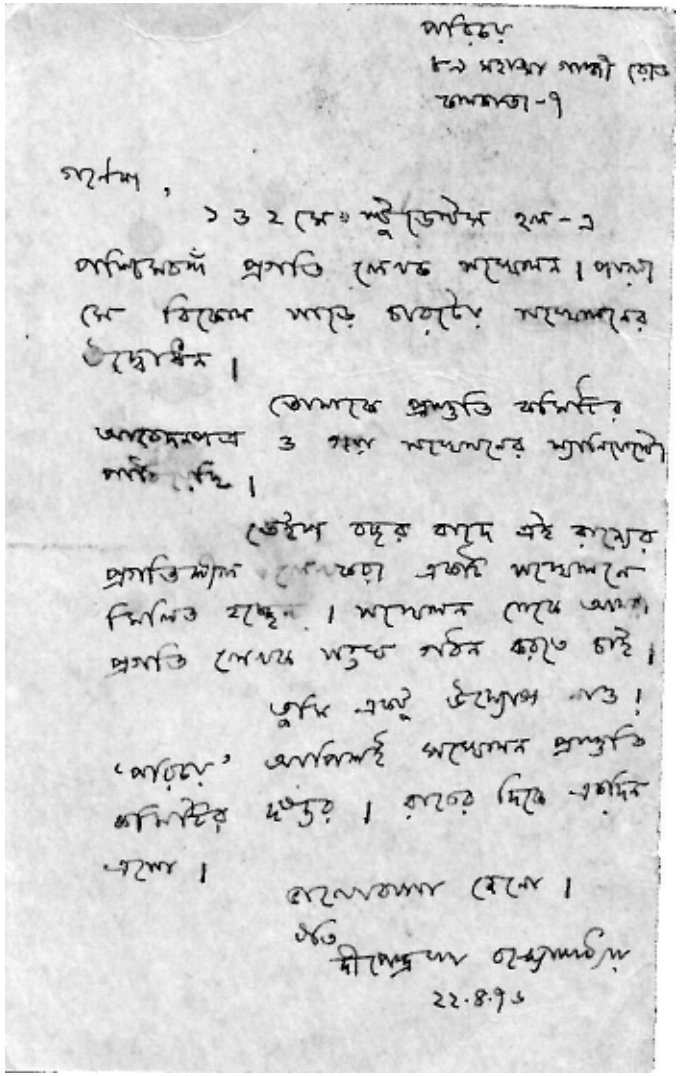

ত্রিশ বছর বাদে এই রাজ্যের প্রগতিশীল লেখকরা একটি সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন। সম্মেলন শেষে আমরা প্রগতি লেখক সংঘ গঠন করতে চাই।

তুমি একটু উদ্যোগ নাও।

'পরিচয়' অফিসেই সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির দপ্তর। রাতের দিকে একদিন এসো।

ভালোবাসা নিও।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২২.৪.৭৩

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

21 Rakabganj Road
New Delhi 1

Dr. Ahmed Sharif
Qazi Nazrul Islam Professor
Chittagong University
Formerly, Professor of Bengali
Dhaka University

126, New Eskaton Road
Dhaka - 2

Date 30 · 7 · 85

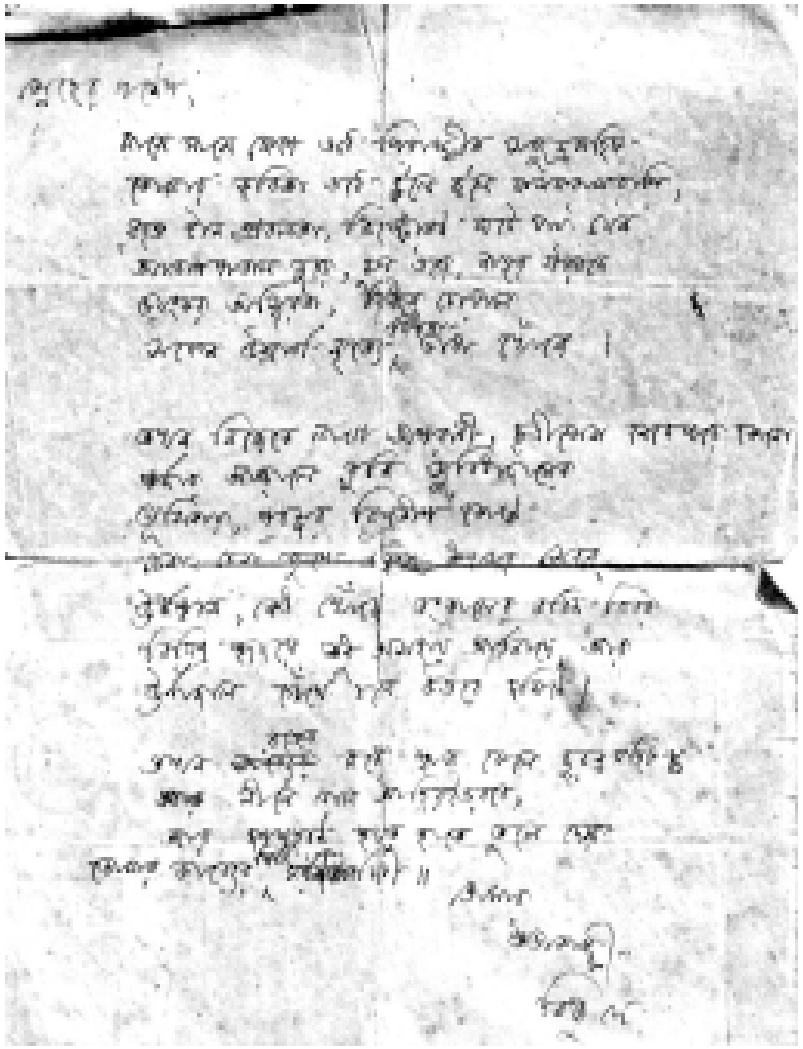

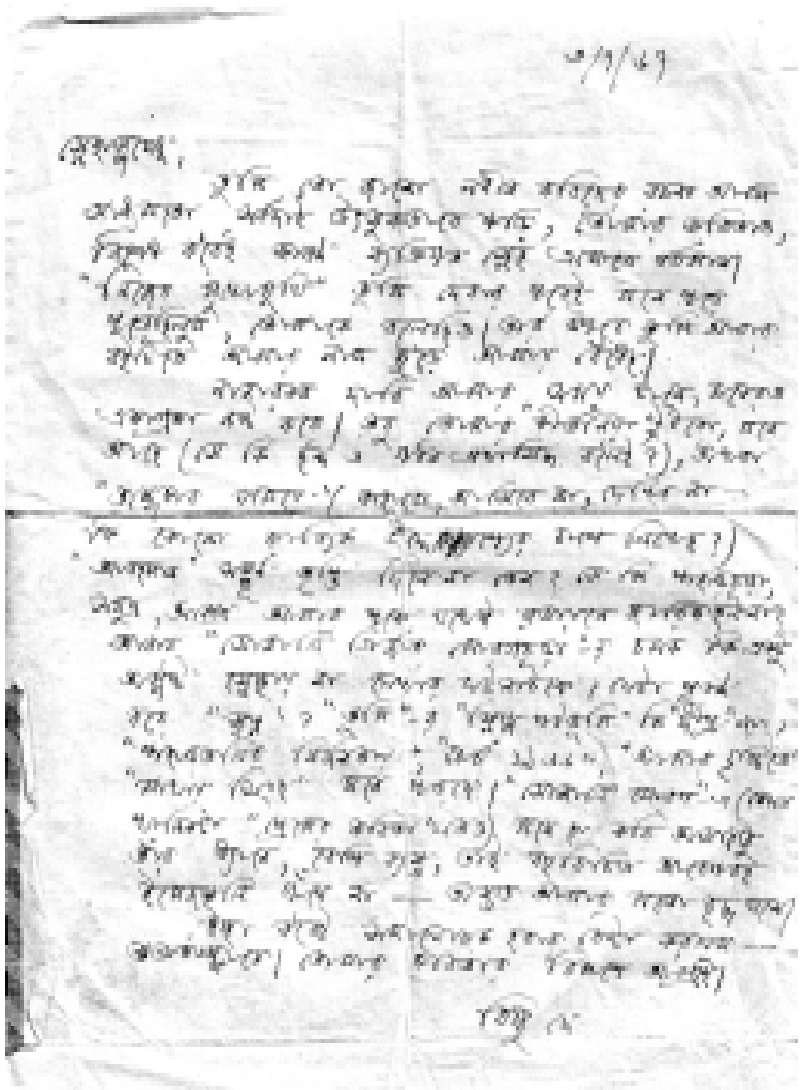

C/o. Dr. J. K. ...
38A/12/B Circular Road
Botanical Garden, P.O.
Howrah.

DINES DAS

AFTAB MOSQUE LANE,
CALCUTTA-

[illegible]

[illegible]

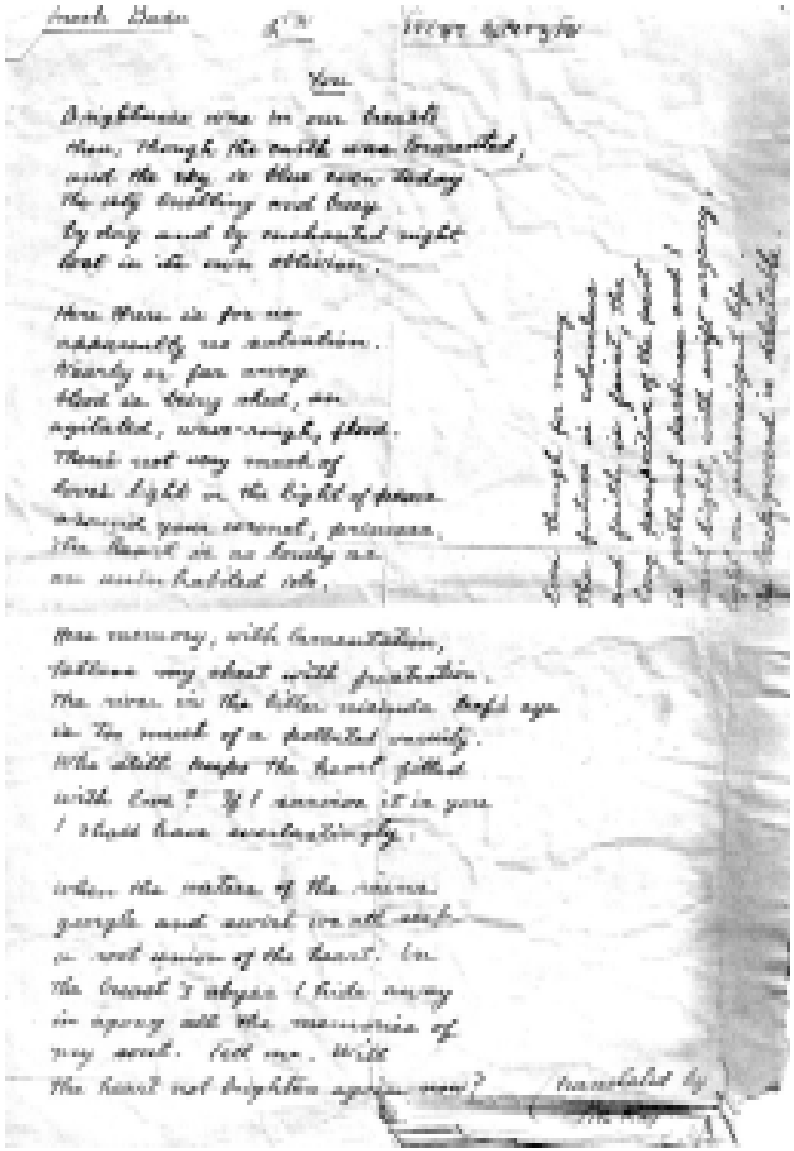

লেখক পরিচিতি

১। পবিত্র সরকার—প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কবি-ভাষাবিদ-নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক

২। বিমল মুখোপাধ্যায়—প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৩। সুমিতা চক্রবর্তী—প্রাক্তন অধ্যাপক ও ডীন, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

৪। পবিত্র মুখোপাধ্যায়—কবি ও অধ্যাপক, বিদ্যানগর কলেজ

৫। অনন্ত দাশ— কবি ও প্রাবন্ধিক

৬। গোপা দত্ত ভৌমিক— অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন উপাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

৭। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়— অধ্যাপক, নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ

৮। গৈরিকা ঘোষ— অধ্যাপক, হাওড়া গার্লস কলেজ

৯। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়— অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

১০। তরুণ মুখোপাধ্যায়— অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১১। অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়— কবি ও প্রাবন্ধিক, কলকাতা

১২। অজন্তা মিত্র(বিশ্বাস)— অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ, কলকাতা

১৩। তাপস রায়— কবি ও কথাসাহিত্যিক

১৪। মৃদুল দত্ত রায়— অধ্যাপক, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

১৫। ঋতম্ মুখোপাধ্যায়— অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্বাবিদ্যালয়, কলকাতা

১৬। জয়গোপাল মণ্ডল— কবি প্রাবন্ধিক অধ্যাপক, বি.বি.এম.কে.ইউ, ধানবাদ

১৭। মৌসুমী সাহা— অধ্যাপক, রানাঘাট কলেজ

১৮। নবনীতা বসু— অধ্যাপক, সরকারি মহাবিদ্যালয়, সিঙ্গুর

১৯। সোমা ভদ্র রায়— অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২০। নিখিল কুমার মাহত— গবেষক, বিনোদ বিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ